# ENVIRONMENTAL STUDIES

**BA**

**Third Semester**

**[Bengali Edition]**

**Directorate of Distance Education**

**TRIPURA UNIVERSITY**

## Reviewer

**Sudipta Samanta**

Assistant Professor, Dum Dum Motijheel College, Kolkata

**Author:** Gobinda Naskar, Assistant Professor, Dum Dum Motijheel College, Kolkata

Copyright © Reserved, 2017

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

# সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

| সিলেবাস | বই - ম্যাপিং |
|---|---|
| **প্রথম একক**<br>পরিবেশ বিদ্যার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ | **(পৃষ্ঠা 1-29)** |
| **দ্বিতীয় একক**<br>বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ | **(পৃষ্ঠা 31 - 83)** |
| **তৃতীয় একক**<br>পরিবেশগত ক্ষয় এবং ব্যবস্থাপনা | **(পৃষ্ঠা 85 - 145)** |
| **চতুর্থ একক**<br>জনসংখ্যা এবং সামাজিক সমস্যাসমূহ | **(পৃষ্ঠা 147 - 209)** |

# সূচীপত্র


**প্রথম একক** **(পৃষ্ঠা 1 - 29)**

**পরিবেশ বিদ্যার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ**

১.০. - ভূমিকা

১.১. - এককের উদ্দেশ্যসমূহ

১.২. - পরিবেশ বিদ্যাঃ সংজ্ঞা, পরিধি ও গুরুত্ব

১.২.১. - পরিবেশ বিদ্যার পরিধি

১.২.২. - পরিবেশ বিদ্যার গুরুত্ব

১.২.৩. - সচেতনতার প্রয়োজন

১.৩. - প্রাকৃতিক সম্পদ

১.৩.১. - পুণনর্বীকরণযোগ্য ও পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ

১.৩.২. - প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ জনিত সমস্যা সমূহ

১.৩.৩. - প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে একক বা ব্যাক্তিগত ভূমিকা

১.৪. - সংক্ষিপ্তসার

১.৫. - মুখ্য পরিভাষা

১.৬. - "অগ্রগতি পরীক্ষণ" প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

১.৭. - প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

১.৮. - গ্রন্থাবলী

**দ্বিতীয় একক** **(পৃষ্ঠা 31- 83)**

**বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ**

২.০. ভূমিকা

২.১. এককের উদ্দেশ্য সমূহ

২.২. বাস্তুতন্ত্রের ধারণা

২.২.১. বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ

২.২.২. মানুষ ও বাস্তুতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক

২.২.৩. বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য

২.৩. বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলী
২.৩.১. বাস্তুতন্ত্রের উপাদান
২.৩.২. বাস্তুতন্ত্রের গঠন
২.৩.৩. বাস্তুতন্ত্রের কার্যাবলী
২.৩.৪. বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ
২.৩.৫. বাস্তুতন্ত্রের সংস্থাগত পরম্পরা বা অনুক্রম
২.৪. খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য প্রবাহ এবং বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড
২.৪.১. বণভূমি বা অরণ্য ভূমির বাস্তুতন্ত্রঃ গঠন ও কার্যাবলী
২.৪.২. জীববৈচিত্র্য : সংজ্ঞা, জাতি, প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য।
২.৫. জীববৈচিত্র্যের মূল্য
২.৫.১. আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য
২.৬. জীববৈচিত্র্যের সংকট ও সংরক্ষণ
২.৬.১. জীববৈচিত্র্যের আশংকা বা সংকট
২.৬.২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
২.৭. সারমর্ম
২.৮. মূলকথা বা মূখ্য আলোচনা
২.৯. ক্রমিক উন্নতির আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ
২.১০. প্রশ্নাবলী এবং অনুশীলনী

**তৃতীয় একক** **(পৃষ্ঠা 85 - 145)**

**পরিবেশগত ক্ষয় এবং ব্যবস্থাপনা**

৩.০. ভূমিকা
৩.১. এককের উদ্দেশ্য
৩.২. পরিবেশগত দূষণ
৩.২.১. দূষণ নিবারণে ব্যাক্তির ভূমিকা
৩.৩. পরিবেশ সম্পর্কিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যাবলী
৩.৩.১. পরিবেশ রক্ষা আইন
৩.৩.২. বায়ু (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রন) আইন

৩.৩.৩. জল (প্রতিরোধ এবং দূষন নিয়ন্ত্রণ) আইন
৩.৪. জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন
৩.৪.১. বৃষ্টি এবং পতিত জমি শোধন
৩.৫. জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জল বিভাজিকার ব্যবস্থাপনা
৩.৬. জৈবসার : সংজ্ঞা, জৈবসারের প্রজাতি এবং গুরুত্ব
৩.৭. ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমিকা
৩.৭.১. বিপর্যয় মোকাবিলা : বন্যা এবং ভূমিকম্প
৩.৭.২. ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভূমিকা (TSPCB)
৩.৮. সারসংক্ষেপ
৩.৯. প্রধান শব্দসমূহ
৩.১০. অনুশীলনের উত্তর সমূহ
৩.১১. প্রশ্নাবলী এবং অনুশীলন
৩.১২. অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম

## চতুর্থ একক (পৃষ্ঠা 147 - 209)

## জনসংখ্যা এবং সামাজিক সমস্যাসমূহ

৪.০. ভূমিকা
৪.১. উদ্দেশ্য
৪.২. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ণ / স্থিতিশীল উন্নয়ন
৪.২.১. পরিবেশের মৌল বিষয়সমূহ এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন
৪.৩. পরিবেশগত নীতিবোধ : সমস্যাসমূহ ও সম্ভাব্য সমাধান
৪.৩.১. পরিবেশগত সচেতনতা
৪.৪. সামাজিক ফলাফলের মূল্যায়ন
৪.৫. সামগ্রিক প্রভাবের মূল্যায়ন
৪.৫.১. সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়নের নয়া ধারণা
৪.৫.২.সামগ্রিক প্রভাব এবং পরিবেশবাদ মূল্যায়নের প্রক্রিয়া
৪.৬. জনসংখ্যাগত কাঠামো
৪.৬.১. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ
৪.৭. মানুষ, পরিবেশ এবং সামাজিক সমস্যা
৪.৭.১. পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্য

৪.৭.২. মানবাধিকার, পরিবেশ এবং HIV / AIDS
৪.৭.৩. মহিলা ও শিশুকল্যাণ
৪.৮. সারসংক্ষেপ
৪.৯. মূখ্য ব্যবহিত শব্দসমূহ
৪.১০. পাঠকের অগ্রগতি সংক্রান্ত উত্তর
৪.১১. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলন
৪.১২. অতিরিক্ত পাঠক্রম

# ভূমিকা

সামপ্রতিকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'পরিবেশ' সম্পর্কিত আলোচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আধুনিক সময়ের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে 'পরিবেশ' সম্পর্কিত সচেতনতা ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরিবেশের সঙ্কট বৃদ্ধির পাশাপাশি সঙ্কট মোকাবিলা করার তথা পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারণে সমগ্র বিশ্বের বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে 'পরিবেশ বিদ্যা'র অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ব্যাতিক্রম নয়।

বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ত্রিপুরার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পরিবেশ বিদ্যা' পঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কারণেই এই 'পরিবেশ বিদ্যা' পাঠ্যপুস্তকটির অবতারণা। অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, আশা করা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থটির দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে এবং তা হলেই গ্রন্থটি সার্থকতা লাভ করবে। তবে আশা করছি ছাত্র-ছাত্রী ব্যাতীত অন্যান্য পাঠকরাও গ্রন্থটির দ্বারা উপকৃত হবেন।

# প্রথম একক

# পরিবেশ বিদ্যার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ

টিপ্পনী


১.০. - ভূমিকা

১.১. - এককের উদ্দেশ্যসমূহ

১.২. - পরিবেশ বিদ্যাঃ সংজ্ঞা, পরিধি ও গুরুত্ব

১.২.১. - পরিবেশ বিদ্যার পরিধি

১.২.২. - পরিবেশ বিদ্যার গুরুত্ব

১.২.৩. - সচেতনতার প্রয়োজন

১.৩. - প্রাকৃতিক সম্পদ

১.৩.১. - পুণর্নবীকরণযোগ্য ও পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ

১.৩.২. - প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ জনিত সমস্যা সমূহ

১.৩.৩. - প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে একক বা ব্যাক্তিগত ভূমিকা

১.৪. - সংক্ষিপ্তসার

১.৫. - মুখ্য পরিভাষা

১.৬. - "অগ্রগতি পরীক্ষণ" প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

১.৭. - প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী

১.৮. - গ্রন্থাবলী


## ১.০. - ভুমিকা :

পৃথিবীর পরিমন্ডলে আমাদের ঘিরে আছে নানা জড় এবং সজীব পদার্থ। ঐ জড় পদার্থের মধ্যে যেমন জল, বায়ু, মাটি রয়েছে, তেমনি আছে সজীব প্রাণী। অর্থাৎ আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র এবং পৃথিবী ও তার বায়ুস্তরে অবস্থিত সমস্তরকমের জড় ও সজীব পদার্থের আন্তঃসম্পর্ককেই পরিবেশ বলে থাকি। তবে পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণের জন্য অন্যান্য বিভিন্ন শাস্ত্রকে ও জানা প্রয়োজন।

বর্তমানে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি চিত্রের সম্মুখে রয়েছি। একদিকে উন্নত সম্ভাবনাময় জীবন, মহাকাশযান, তথ্যপ্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আরো

টিপ্পনী

অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত সম্ভাবনা । আর অন্যদিক আছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সম্পদের অপর্যাপ্ততা আর তার কারণে খাদ্য সংকট । তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবেশকে জীবনদায়ী হিসেবে ব্যবহার করা অর্থাৎ জল, বায়ু এবং ভূমিকে চিরস্থায়ী উন্নয়নে যুক্তি সহকারে ব্যবহার করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্যই পাঠ্যবিষয় হিসেবে পরিবেশবিদ্যা শাস্ত্রটির উদ্ভব। তবে প্রকৃতিকে বোঝার জন্য একাধিক শাস্ত্রের প্রয়োজন হলেও পরিবেশবিদ্যা শাস্ত্রটি নানা শাস্ত্রে বিভক্ত নয়, স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবেই পরিবেশ বিদ্যা শাস্ত্রটি গড়ে উঠেছে। এককথায়, "পরিবেশ বিদ্যা" শাস্ত্রটি শুধুমাত্র পরিবেশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। বিভিন্ন শাস্ত্রে পরিবেশকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে তা ওপরিবেশ বিদ্যা শাস্ত্রটির আলোচ্য বিষয় নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কারণ ও ফলাফল না বুঝেই আমাদের মত সাধারণ মানুষ পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকি সেই কারণে পরিবেশ বিদ্যা বর্তমানে আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

## ১.১. - এককের উদ্দেশ্যসমূহ :

এই এককটি অনুধাবন করার পর পরিবেশ বিদ্যার উদ্দেশ্য সমূহ বোঝা সম্ভব হবে। উদ্দেশ্যগুলি হল -

- পরিবেশ বিদ্যা শাস্ত্রের প্রকৃতি।
- পরিবেশ বিদ্যার প্রয়োজন ও পরিধি অনুধাবন করা।
- কীভাবে পরিবেশ বিদ্যা শাস্ত্রটি আন্তঃবিষয়ক বিষয় হয়ে উঠেছে।
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা।
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত ধারণার আলোচনা।
- পুনর্নবীকরণ যোগ্য এবং পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদের মধ্যে পার্থক্য।
- অরণ্য, জল, খনিজ, খাদ্য, শক্তি, ভূমি সম্পদের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা।

## ১.২. - পরিবেশবিদ্যা : সংজ্ঞা, পরিধি ও গুরুত্ব :

বৃহত্তর অর্থে পরিবেশ বিজ্ঞান হল পার্থিব, বায়ুমন্ডলীয়, জীবজগত এবং নৃতাত্ত্বিক পরিবেশের জটিল মিথস্ক্রিয়া জনিত বিজ্ঞান । রসায়ন বিদ্যা, জীববিদ্যা,

সমাজবিদ্যা এবং সরকার এই পরিবেশ বিজ্ঞানেদর অন্তর্গত যা আন্তঃ বিষয়ক মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

বৃহত্তর অর্থে, ভূমি, বায়ু, জল ও জীবজগত এবং এর ওপর প্রযুক্তির প্রভাব প্রকৃতিকে একত্রে পরিবেশ বিজ্ঞান বলা হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে জীবের জীবন পর্বের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানের সামগ্রীক বা অভিব্যাক্তির প্রকাশ ঘটে। পরিবেশ বিদ্যা প্রাকৃতিক ইতিহাসের এমন এক শাখা যা বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের ওপর সজীব উপাদানের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় ও প্রভাবিত করে। এককথায় পরিবেশ বিদ্যা বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল, ভূ-পৃষ্ঠ এবং জীবমন্ডলের মত উপাদানের সামগ্রিক রূপ।

বর্তমানে পরিবেশ বিজ্ঞান অনেক পরিণত ও শক্তিশালী জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিগত তিন দশক ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের অপব্যবহাচরের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোওলার পাশাপাশি পরিবেশ বিদ্যা ও বহুমাত্রিক শাখা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

**রসায়ন বিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান :**

পরিবেশ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের সম্পর্ক পরিবেশ রসায়ন (Environmental Chemistry) নামে পরিচিতি। জল, ভূমি ও বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানের উৎস, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের আলোচনাই এই সম্পর্কের মূল উপজীব্য। পরিবেশের কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ দূষণকারী উপাদানের প্রকৃতি আলোচনাই এই সম্পর্কের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

**জীববিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান :**

জীবজগত সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই পরিবেশের প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনে পরিবেশের জীবরসায়ন কী প্রভাব বিস্তার করে তার আলোচনা করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। জীববৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শুধুমাত্র পরিবেশের রাসায়নিক প্রজাতিকেই প্রভাবিত করে না, বিভিন্ন প্রজাতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়। বিশেষত জল ও ভূমি দূষণের মত পরিবেশের অকথায়ের বিষয়ের আলোচনাই পরিবেশগত জীব-রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি।

**অর্থনীতি ও পরিবেশ :**

অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে আমরা সেই সব উপাদান বা শক্তিকে বুঝে থাকি যা মানুষের ওপর অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে। সামগ্রীকভাবে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে সম্পদ শিল্প উৎপাদন, জনসংখ্যা, কৃষিকাজ ও

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

4

পরিকাঠামোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক নীতিসমূহ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মত আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক নির্ধারক সমূহকে বোঝানো হয়।

সম্পদের পর্যাপ্ততা এবং প্রযুক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভৌগলিক কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ সব জায়গায় সমানভাবে বন্টিত নয়, কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলেই প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই সব অঞ্চল উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে , যেমন - আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মত দেশসমূহ, যারা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। আর যেসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুল লক্ষ্য করা যায়, তারা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত। এভাবেই অর্থনৈতিক পরিবেশ কোন দেশকে উন্নত বা উন্নয়নশীলের পর্যায়ভুক্ত করে থাকে।

একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ কোন অঞ্চলের জনসংখ্যার খাদ্যর জোগানের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের প্রয়োজন হয়, যা অর্থনৈতিকি পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর অত্যাধিক নির্ভর করতে হয়, যা পরিবেশের শোষণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং একইসাথে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকেও নষ্ঠ করে। যদিও একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ থাকলেই তা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে, এমন নাও হতে পারে। তবে রাজনীতি ও আর্থনিতি পরস্পর নির্ভরশীল। পূর্ব জার্মানী এবং পশ্চিম জার্মানী রাজনীতি ও অর্থনীতির পারস্পারিক নির্ভরশীলতার অন্যতম উদাহরণ। পূর্ব জার্মানির দুর্বল আর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশের দেশ পশ্চিম জার্মানীর সাথে যুক্ত হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানুষের প্রতিটি কার্যকলাপ কোনো না কোনো ভাবেই স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বের পরিবেশকে প্রভাবিত করে থাকে। এই প্রভাব স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। বর্তমানে অরণ্য ধ্বংস, 'ক্যাটরিনা'র মত মহামারী, 'রীতা'র মত সাইক্লোন (আমেরিকা), জম্মু এবং কাশ্মীরে ভয়াবহ ভূমিকম্প, প্রবল বর্ষা ও বন্যায় মত প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় আমরা প্রতিনিয়ত দেখে চলেছি। ব্যাপকহারে শিল্পায়ন কৃষির অগ্রগতি, বিভিন্ন শক্তির ব্যাপক হারে ব্যবহার যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হলেও সার্বিক পরিবেশের ক্ষতি সাধনই করে থাকে। স্থিতিশীল অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা চিরায়ত উন্নয়নে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশ সংক্রান্ত করের

আরোপ করা হয়েছে শুধুমাত্র দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষার স্বার্থে । যারা পরিবেশকে দূষিত করে , তাদেরকেই কর বা জরিমানা দিতে হয় কৃতকর্মের জন্য। যানবাহন ও শিল্পের কারণে জল ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বা জরিমানা করার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত কতৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

**সাংস্কৃতিক পরিবেশ :**

টিপ্পনী

সাংস্কৃতিক পরিবেশ ধারণাটি প্রাকৃতিক নয় মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। সাংস্কৃতিক পরিবেশ মানুষের কার্যকলাপের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মানুষ বা ব্যাক্তি তার নিজের সুবিধার্থে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বয়ে নিয়ে চলে। বিভিন্ন বাড়িঘর নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, গাছ লাগানো এসবই সাংস্কৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য । সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আমরা সামজিক পরিবেশ, সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমনকি সামাজিক ঐতিহ্য ও বলতে পারি। সময়ের সাথে সাথে মানুষ প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করেছে। এইসব দক্ষতার ব্যবহার করে মানুষ নানা গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদানকে বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রেও কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন - আমাদের অনেক গ্রামে প্রযুক্তির কারণে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আর এই সময় থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের গুনগত মানের ব্যাপক অবক্ষয়ের পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় হতে শুরু করেছে। তবে মানুষের সব কার্যকলাপ পরিবেশের পক্ষে ভালো নয় , অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের কার্যকলাপ পরিবেশের ক্ষতি-সাধন করে। মানুষের দ্রুত অগ্রগতি, অপরিকল্পিত ও অবহেলার কারণে পরিবেশের ব্যাপক অবক্ষয় করে থাকে। বর্তমানে সমাজ যত উন্নত হয়েছে পরিবেশের ও বিনষ্টের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।

**জনসংখ্যা ও পরিবেশ :**

কোনো দেশের জনসংখ্যা বিশেষ করে জনসংখ্যায় আকৃতি ও জনঘনত্ব আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ও জনসংখ্যার এক ব্যাপক ভূমিকা আছে। জনসংখ্যার অধিকাংশই দরিদ্র হওয়ায় পরিবেশের ওপর ক্ষতির প্রকোপ ও ব্যাপক বৃদ্ধি পায়, কারণ দরিদ্রতাই পরিবেশের বিনষ্টের জন্য দায়ী। দরিদ্র জনপথই পরিবেশের বৈশি ক্ষতি করে আবার দরিদ্র জনগণই এর দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা বার্ষিক 1.7 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা যথেষ্ট চিন্তার কারণ, আর যদি বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত থাকে আগামী তিন - চার দশকে

টিপ্পনী

370 কোটি বা তার বেশী জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে যা সারা মানব জাতি তথা বিশ্বের কাছে যথেষ্ঠ ভীতিকর। এই ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ও শারিরীক পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করবে। বর্তমানে জমি ও সম্পদের অত্যাধিক ব্যবহারও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। এমনকি এরকম অবস্থার বর্তমান সরকার ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা সেটাতে এবং পরিবেশের সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে উপযুক্ত পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির অভাবে।

**পরিবেশ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা :**

রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে বুঝে থাকি। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাই দূষণ বিরোধী আইনের মত পরিবেশ সংক্রান্ত নানা বিষয়কে উদ্ভাবণ করে, তৈরি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রশাসনিক বিভাগ আইন বিভাগের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। আর প্রশাসন বিভাগ সংবিধানের আওতায় থেকে জনস্বার্থে বিভিন্ন নীতির বাস্তববায়ন করে থাকে। মানবজাতির উন্নয়নের স্বার্থে একটি স্থিতিশীল ওপ্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ থাকা একান্তই প্রয়োজন।

প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই একটি নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে - গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট, কর্তৃত্ববাদী বা রাজতান্ত্রিক। রাজনৈতিকি ব্যবস্থার এইসব ধরন অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজি - সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ের সঠিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। তাই উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সার্বিক পরিবেশের উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্য করে থাকে।

## ১.২.১. পরিবেশ বিদ্যার পরিধি :

পরিবেশ বিদ্যার আলোচনা শুধুমাত্র দূষণ নিয়ন্ত্রণের থেকেই গুরুত্ব পাচ্ছে এমন নয়, এমনকি জীবন ও প্রকৃতির ওপর ও প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। পরিবেশ বিদ্যা প্রকৃতিকে বোঝার পাশাপাশি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান এবং পরিবেশের গোলমেলে অর্থাৎ ক্ষতিকারক কার্যকলাপকে চিহ্নিত করে চিরায়ত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক জীবন যাপনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক উপায়ে পরিবেশ সংরক্ষণর পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। বর্তমানে দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপকরণ, ময়লা নির্গমন, ড্রেনের ময়লা নিস্কাশন এবং চিকিৎসার ব্যবহৃত বর্জ্য ও কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই -এর ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে পরিবেশ বিদ্যার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

প্রকৃতিগতভাবে পরিবেশ বিদ্যা শাস্ত্রটি বহুমাত্রিক শাস্ত্রের সমন্বিত রূপ। পরিবেশের সাধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদেদর পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় উদঘাটনের পাশাপাশি প্রকৃতির প্রভাবকেও পরিবেশবিদ্যার আওতায় ধরা হয়। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরিবেশের সংরক্ষণ এবং সম্পদের সংরক্ষণকে ব্যবসা পরিচালনার মতো সাধারণ বিষয় হিসেবে মেনে নিয়েছে। তেমন ভাবেই বিভিন্ন সরকারী সংস্থাগুলোর নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ও স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে জননীতি নির্ধারণে ও শিক্ষাক্ষেত্রে "Right to clean Enviroment" ব্যাপকভবে অনুসৃত হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা পশ্চাদপদ বা পিছিয়ে তারাই বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই পরিবেশের সংরক্ষণই বর্তমানে সমস্ত সংগঠনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বিগত কয়েক শতকে ভারতেও পরিবেশের ব্যাপক অবনয়ন হয়েছে। শিল্পের ক্রমবর্ধমানতা, কৃষিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার,বন-জঙ্গলের ধ্বংস, মাটি ক্ষয়, নগরায়ন এবং জনসংখ্যার অত্যাধিক বৃদ্ধিই পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার বৃদ্ধির কারণ। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাকে আমরা যদি সুষ্ঠভাবে সামলাতে না পারি, তবে তা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছ এ বিভীষিকা হয়ে দাড়াবে। কিছু কিছু পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার কোনো সমাধানসূত্র এখনও পাওয়া যায়নি। এই সমস্যা শুধুমাত্র আঞ্চলিক বা জাতীয় ক্ষেত্রেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। মানবজাতির আলাদা করে কোনো অস্তিত্ব নেই , জল, বাতাস সহ বাস্তুতন্ত্রের অংশ। তাই টিকে থাকায় স্বার্থেই পরিবেশকে সংরক্ষণ কররা প্রয়োজন না হলে অক্সিজেনের মতো পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত অত্যাবশ্যক উপাদান পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়বে। পরিবেশ থেকে আমরা যে সব সম্পদ পাই তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সেই সম্পদ সংরক্ষণের ও উদ্যোগ বর্তমানে দেখা গেছে। আমরা প্রধানত পুনর্ব্যবহার যোগ্য ও পুনব্যববহার অযোগ্যসম্পদ ব্যবহার করে থাকি। সম্পদ সংক্রান্ত সমস্যা, জীবনযাত্রার শৈলী, বর্জ্য পদার্থের নির্গমন , বায়ুস্তর ও জলস্তরের সমস্যা ছাড়াও আরো বহুবিধ পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা দ্বারা আমরা জর্জরিত। এককথায় এইসব সমস্যার ধেকে মুক্তির জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেমন -

- প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও যৌক্তিক ব্যবহার।

টিপ্পনী

- বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র।
- পরিবেশ দূষন ও তার নিয়ন্ত্রণ।
- পরিবেশ সংক্রান্ত সামাজিক বিষয়সমূহ।
- মানব জাতির দূষণ ও পরিবেশ।

টিপ্পনী

## ১.২.২. পরিবেশ বিদ্যায় গুরুত্ব :

পৃথিবীতে জীবনের পাশাপাশি জীবন ধারণের উপাদান যেমন - জল, বাতাস, মাটি ইত্যাদি। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সীমাহীন বিশ্বে আর কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব খুজে পাননি। লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আধুনিক জীবজগতের উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতির এই রাজত্বে সর্বশেষ আগন্তুক মানুষ হল পৃথিবীতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মানুষের জীবনেদ এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও আনন্দ। আর সেই কারণেই প্রকৃতির সাথে আমাদের যোগসূত্র ও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। জনবিস্ফোরণের চাহিদা পূরণে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বাড়াতে আমরা অতিক্রম করেছি প্রকৃতির নিয়ম। সেই কারণে প্রকৃতির আঘাত বুমেরাং হয়ে আমাদের ওপর আছড়ে পড়ছে। সংকটজনক এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ সচেতন হয়ে না উঠলে যেকোন মূহূর্তে ঘটে যেতে পারে বিরাট বিপর্যয়। অচিরেই পৃথীবী থেকে প্রানের অস্তিত্ব ধধ্বংস হতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষিত হলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশ সংরক্ষিত হয় পরিবেশ সচেতনতার মাধ্যমে। পরিবেশের সচেতনতা বাড়াতে গেলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, পরবেশে অবিরাম ঘটে চলা বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা দরকার। পরিবেশ বিদ্যা শাস্ত্রের পাঠের দ্বারা আমরা পরিবেশের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারি ; পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারি। পরিবেশবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা নীচে আলোচনা করা হল -

(১) প্রতিনিয়ত ঘটে চলা পরিবেশের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি ও সেই পদ্ধতিগুলির সাথে মানুষের সূক্ষ্ম যোগসূত্র সম্বন্ধে পাঠ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মানুষের তৈরি বিপর্যয়কে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সেই বিপর্যয়ের ঘটনা গুলিকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। প্রকৃতি ও পরিবেশের কোনো ভারসাম্য বিঘ্ন হওয়ার ফলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তার অনুধাবন ও বিচার বিশ্লেষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(২) পরিবেশ বিদ্যা পাঠের দ্বারা বিভিন্ন পরিবেশগত রোগের কারণ, রোগের

প্রতিকার বা রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। পরিবেশ বিদ্যা পাঠের দ্বারা রোগযুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর জন্য পরিবেশ বিদ্যা পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) এই পরিবেশে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ থেকে শুরু করে বৃহদাকার প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউই অবাঞ্ছিত বা মূল্যহীন নয়। প্রকৃতির রাজ্যে সমস্ত জীব ও জড় পদার্থ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একে অপরের সঙ্গে এক অদৃশ্য বন্ধনে যুক্ত। লক্ষ লক্ষ প্রজাতির গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে জীব বৈচিত্র্য, যার ওপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে মানুষের প্রগতি ও অস্তিত্ব, বন ও বণ্যপ্রানীর সংরক্ষণ, সমুদ্র সংরক্ষন, জলাভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতি সংরক্ষণ করার পদ্ধতি ও গুরুত্ব পরিবেশ বিদ্যা শাস্ত্রের পাঠের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। এছাড়াও জানতে পারি বনজঙ্গল ও জীবজন্তুর ধ্বংসের মূল কারণ সমূহ ও তার থেকে উদ্ধারের সাম্ভাব্য উপায়গুলি।

(৪) মানুষের উৎপত্তির সময় থেকে জল, বাতাস, মাটি, গাছপালা, প্রানী, মানুষ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিকই বজায় থাকত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ বেড়েছে প্রচন্ডভাবে। এতে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে তেমনি সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষতিকর বর্জ পদার্থ। এই সকল বর্জ্য পদার্থের সঠিকভাবে অপসারণ ও বর্জ্যপদার্থ জনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে আমরা কীভাবে রেহাই পেতে পারি তা পরিবেশবিদ্যা পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

(৫) কোনো অঞ্চলের জল-মাটি-বায়ুদূষনের চিত্র ও তার বিশ্লেষণ পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমেই জানা সম্ভবপর হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে এই সমস্ত দূষণ জনিত ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায় বা ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করা যায়।

(৬) পরিবেশ বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে জনসাধারণের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির দ্বারা ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হয়। ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক দারিদ্রতা দূর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে।

(৭) পরিবেশ বিদ্যা পাঠের ফলে পরিবেশের ওপর জন বিস্ফোরণের কুপ্রভাব সম্পর্কে জানা যায়।

মানুষের নিজের ও তার আগামী প্রজন্মের স্বার্থে পরিবেশকে অবশ্যই জানতে হবে। দূষণমুক্ত পরিবশ ও সমাজ গড়ে তোলার জন্য পরিবেশের পাঠ

টিপ্পনী

অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

## ১.২.৩. সচেতনতার প্রয়োজন :

আমদের চারপাশে প্রতিনিয়ত যা ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে প্রত্যেকের অবহিত থাকা উচিত। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তবে ইতিমধ্যেই বিশ্বে নানারকম পরিবেশগত সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত এবং যার প্রভাব পৃথিবীর বাসিন্দারা অনুভব করে চলেছেন। বর্তমানে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সব দেশের মানুষই কম বেশী সচেতন এবং অধিকাংশ মানুষই পরিবেশের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং তার সমাধানে ব্যাপকভাবে তৎপর। গণমাধ্যম সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছে। সাধারণ মানুষ গণমাধ্যম ছাড়াও অন্যান্য নানাভাবে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে নানা বিজ্ঞাপন, প্রতিবেদন, ডকুমেন্টরি এবং বিভিন্ন চলচিত্র বা সিনেমার মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তোলার নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সংবাদপত্র ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও তাদের প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে একই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে পরিবেশ সম্পর্কে সরকার পৃথক দপ্তর পরিবেশ ও বন দপ্তরের সৃষ্টি করেছে এবং সারা বছর ধরে এই দপ্তর গুলি হোর্ডিং প্রদর্শনী ও বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা চালিয়ে যাচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধিতে রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রীরা নানাভাবে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপন, বিশেষত বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ই জুনে নানারকম ভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মহারাষ্ট্রের কোঙ্কান অঞ্চলের রত্নাগিরি শক্তি প্রকল্পকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। তাই সর্বদা পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি নানা উদ্যোগ ও নেওয়া হয়।

## অনুশীলনী :

(১) 'পরিবেশ' বলতে কী বোঝেন ?

(২) 'পরিবেশ বিদ্যা' কাকে বলে ?

(৩) প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি কী ?

(৪) পরিবেশ বিদ্যা শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে কোন কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে ?

(৫) জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম কীভাবে ভূমিকা পালন করবে ?

টিপ্পনী

## ১.৩. প্রাকৃতিক সম্পদ :

প্রকৃতিতে অবস্থিত যে সকল বস্তুর পরিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষ তার ব্যবহারযোগ্য আরোও মূল্যবান বস্তুতে পরিণত করে, সে সকল বস্তুকে সম্পদ বলা হয়। যেমন - কাঠ, তুলা, ধাতু, খনিজ তেল, মাটি, জল, বায়ু, ইত্যাদি। মানুষ নিজেও প্রকৃতির সম্পদ। কাঠ তুলা ও ধাতু থেকে যথাক্রমে আসবাবপত্র, বস্ত্র ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। মাটি, জল, বায়ু, বন, বন্যপ্রানী, খনিজ তেল ইত্যাদিও আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য্য।

টিপ্পনী

মানুষের জ্ঞানের বিস্তৃতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে সম্পদের সংজ্ঞার ও পরিবর্তন ঘটছে। আগে ধারণা ছিল প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত যে কোনো বস্তু যা মানুষের কাজে লাগে তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। আর যে বস্তু মানুষের প্রয়োজন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যবহৃত হয় তাদের সম্পদ বলে।

## ১.৩.১. পুনর্নবীকরণ যোগ্য এবং পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ :

এইচ. টি. ওডাম তাঁর গ্রন্থে ১৯৭১ প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণী বিভাজন করেন - পুনর্নবীকরণ যোগ্য ও পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ।

**(১) পুনর্নবীকরণ যোগ্য সম্পদ :**

উদ্ভিদ, প্রানী এমনকি মানুষ নিজেও এবং কিছু জড় পদার্থ যেমন - মাটি ও তার উর্বরতা যদি সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হয় তবে এগুলি কখন ও নিঃশেষিত হবে না বা ধ্বংস হবে না , এই প্রকার সম্পদকে পুনর্নবীকরণ যোগ্য সম্পদ বলে। তবে জলকে বেশিদিন পুনর্নবীকরণ যোগ্য সম্পদ বলা যাবে না, কারন বিশ্বায়নের প্রভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অরণ্য নিধন, জলকে ধ্বংস করছে। জলস্তর বা জলের বর্তমান অবস্থান যথেষ্ট চিন্তাজনক। সৌরশক্তির ক্ষেত্রে আবার এই কথা প্রযোজ্য নয়।

**(২) পুনর্নবিকরণ অযোগ্য সম্পদ :**

কোন বণ্যপ্রানী বা উদ্ভিদ যখন যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন আর তাদেদর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে এই সকল জীব পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ। এই সম্পদ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কয়লা, খনিজতেল, লোহা, তামা, রুপো, দস্তা, লবণ এবং বিভিন্ন খনিজ এবং আরো প্রভূত

টিপ্পনী

সম্পদ । পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় - পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও পুনর্ব্যবহার অযোগ্য সম্পদ।

**(ক) পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ :**

যে সকল প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ একবার ব্যবহারের পর ও আবার ব্যবহার করা যায়, তাদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ বলে । যেমন - হীরা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ।

**(খ) পুনর্ব্যবহার অযোগ্য সম্পদ :**

যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ একবার ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, তার অস্তিত্ব থাকে না, তাদের পুনর্ব্যবহার অযোগ্য সম্পদ বলে। যেমন - প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা ইত্যাদি।

**জৈব ও অজৈব সম্পদ :**

কোনো কোনো পরিবেশ বিজ্ঞানী সম্পদকে জৈব ও অজৈব এই দুভাগে ভাগ করেছেন।

**(ক) জৈবসম্পদ -**

জঙ্গল, কৃষি, মাছ বন্যপ্রাণী সমূহ প্রভৃতিরা হল জৈব সম্পদের উদাহরণ কারণ এগুলির পুনরায় উৎপাদন ও পরিবর্তন করা যায়।

**(খ) অজৈব সম্পদ -**

পেট্রোল, খনিজ বা জমির মত প্রাণহীন সম্পদকে পরিবর্তন করা যায় না, আর পরিবর্তন করা গেলেও তার হার এতই ধীর যে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়।

**অক্ষয় ও ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ -**

প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহকে ক্ষয়িষ্ণু ও অক্ষয় এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

**(ক) অক্ষয় সম্পদ-**

পৃথিবীর যতদিন অস্তিত্ব আছে ততদিন যে সকল সম্পদ নিঃশেষ হবে না, তাদের অক্ষয় সম্পদ বলা হয়। যেমন - সূর্যালোক, বায়ু, জল ইত্যাদি।

**(খ) ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ -**

যে সকল সম্পদ ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়, পুনরায় সৃষ্টি করা যায় না তাদেরকে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলে। যেমন - কয়লা, খনিজ

সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাস, উদ্ভিদ, প্রাণী, মাটির উর্বরতা ইত্যাদি।

তবে পুনরায় ব্যবহার যোগ্য সম্পদ ও অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে পুনরায় ব্যবহারের অযোগ্য সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। তাই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এরকম কিছু সম্পদ -

(১) বনজ সম্পদ

(২) জল সম্পদ

(৩) খনিজ সম্পদ

(৪) খাদ্য সম্পদ

(৫) শক্তি সম্পদ

(৬) ভূমি সম্পদ

টিপ্পনী

## ১.৩.২. প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের সংরক্ষণে সমস্যা সমূহ :

### ১. বন সম্পদ :

কোনো জমির ওপর ক্রমবর্ধমান গছপালাকেই বন সম্পদ বলা হয়। পৃথিবীর সবথেকে প্রাকৃতিক সম্পদই হল অরণ্য। পৃথবীকে সবুজ আচ্ছাদনে ঢেকে রাখার পাশাপাশি অজস্র বস্তুগত এবং অবস্তুগত উপাদান প্রদান করে থাকে যা সমগ্র জীবজগতের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ জমি বন দ্বারা আবৃত। তদানীন্তন সোভীয়েত রাশিয়া মোট বনভূমির এক-পঞ্চমাংশ, ব্রাজিলল এক সপপ্তমাংশ এবং আমেরিকা ও কানাডা পৃথিবীর মোট বনভূমির ৬-৭ই শতাংশ বনভূমি অধিকার করে আছে। তবে বর্তমানে এটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে যে প্রত্যেক বনভূমি থেকেই বনের পরিমান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। উষ্ণপ্রধান এশিয়া যেখানে বনভূমির এক-তৃতীয়াংশই ধ্বংস হয়েছে গত কয়েক বছরে।

**ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অরণ্যের ব্যবহার -**

জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্রের কাঠ, খাদ্য সমাগ্রী, আঠা, রজন, ভোজ্য - অভোজ্য তেল, রাবার, লাক্ষা, বাঁশ, বেত, ওষুধপত্রের মত নানা সমগ্রীর জন্য আমাদের বনভূমির ওপর নির্ভর করতে হয়। বনভূমি থেকে প্রতিবছর যত কাঠ কাটা হয়, তার অর্ধেকেই জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক তৃতীয়াংশ কাঠ

টিপ্পনী

বাড়ি নির্মানের কাজে ব্যবহৃত হয়, এক ষষ্ঠাংশ কাঠ কাগজ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বনভূমির অনেক অংশ খনন, কৃষি, গোচারণের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

**বাস্তু সংস্থান সংক্রান্ত ব্যবহার :**

বাণিকজ্যিকভাবে গাছকে ব্যবহার করা হলে ও মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে ও গাছের উপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল। যেমন -

**(১) অক্সিজেনের উৎপাদন :**

গাছ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপাদন করে থাকে, যা বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যম্ভাবী। তাই বনভূমিকে 'পৃথিবীর ফুসফুস' বলা হয়।

**(২) গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রভাব হ্রাস :**

গ্রীণ হাউস গ্যাস, কার্বন ডাই অক্সাইড সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সময় শোষণ করে সমগ্র পৃথিবীকে দূষণ মুক্ত করে বিশ্ব উষ্ণায়ন করতে সাহায্য করে বনভূমি।

**(৩) বন্যপ্রাণীর আবাস স্থল :**

লক্ষ লক্ষ বন্যপ্রানীর আবাসস্থল এই বনভূমি । প্রায় ৭০ লক্ষ বণ্যপ্রাণী উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের বনভূমিতে বাস করে।

**(৪) জল চক্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক :**

বনভূমি বৃষ্টির ধারাকে স্পঞ্জের মত শোষন করে রাখে। উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের ৫০ - ৮০% আদ্রতা বনভূমি থেকে পাওয়া যায়।

**(৫) ভূমি সংরক্ষণ :**

গাছের শিকড় মাটি আটকে রাখতে সাহায্য করে ।সেই কারণে বনভূমি ভূমিরক্ষায় রোধ করে।

**(৬) দূষণ নিয়ন্ত্রক :**

বনভূমি বহু ক্ষতিকর গ্যাসকে শোষন করে বায়ুকে নির্মল রাখতে ও পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করে থাকে।

**বনভূমি ব্যবস্থাপন এর উদাহরণ :**

ভারতের মত দেষে বনভূমি ব্যবস্থাপন অনেকাংশেই ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছে । বর্তমানে এক সমীক্ষা দেখা গেছে আগামী দশ বছরের মধ্যে জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন প্রায় তিনগুন হবে । ভারত সরকার বৃহত্তর ক্ষেত্রে

গাছলাগানোর কর্মসূচী নিয়েছে। ওড়িশ্যার নানা গোষ্ঠী বনভূমির সংরক্ষণে ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছে। ওড়িশ্যার কেশপুর অঞ্চলের এক কৃষক বণভূমি সংরক্ষণে অর্থাৎ গাছ লাগানোর জন্য এক আন্দোলন শুরু করেন যার ফলশ্রুতি হিসেবে "বৃক্ষ ও জীবের বন্ধু পরিষদ" গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল যত বেশী সম্ভব সম্প্রদায়কে বনভূমি সংরক্ষণে যুক্ত করা।

এই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নির্ভর অরন্য সংরক্ষণ ব্যাপক সামান্য লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ওড়িশ্যার এই মডেল অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসরন করা হয়। সরকার উদ্যোগী হবে গোষ্ঠী নির্ভর অরণ্য সংরক্ষণে স্থানীয় বাসিন্দাদের গুরুত্ব প্রদান করেছে।

**টিপ্পনী**

### অত্যাধিক বনভূমির শোষণ -

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ খাদ্য, আশ্রয় ওষুধের জন্য এবং জ্বালানীর প্রয়োজনে বনভূমির দ্বারস্থ হয়েছে। সভ্যতা অগ্রগতির সাথে সাথে কাঁচামালের যোগান অর্থাৎ কাঠ, খনিজ, জ্বালানী কাঠের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যাধিক পরিমাণে জ্বালানী কাঠ ও কয়লার ব্যবহার, শহরের বিস্তার, কৃষি ও শিল্পের অত্যাধিক সম্প্রসারণের জন্য বনভূমির শোষনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

### অরণ্য নিধন -

অরণ্যনিধন প্রধানত অতিরিক্ত পশুচারণ, নির্দয়ভাবে গাছ কাটা এবং অতিরিক্ত কৃষিভূমি পাওয়ার লোভে বৃক্ষাদি ধ্বংসের কারণে হয়। এর ফলে মরুভূমির সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কৃষি উৎপাদনে অরণ্যের ব্যাপক ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়। কৃষিকাজে পরিবেশের ক্ষতি প্রধানত দু'প্রকারে ভূমিক্ষয়, যারফলে ক্রমান্বয়ে খরা ও বন্যা দেখা যায় এবং অরণ্য থেকে পাওয়া জ্বালানী হিসেবে প্রয়োগ হওয়ার ফলে এগুলির অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেরত যেতে পারে না এবং ভূমির ক্ষয় পূরণ হয় না।

অরণ্য নিধনের ফলে ভয়ঙ্কর রূপে ভূমিক্ষয় এবং ভূমি ধস দেখা যায়। এক হিসেবে দেখা গেছে যে প্রতিবছর ভারতবর্ষে প্রায় ৬০০ কোটি টন উর্বর মৃত্তিকার ক্ষতি হয় যা ১৯৭৭ সালের হিসেব অনুযায়ী জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১২০০ কোটি টাকা।

২০০০ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বে বনভূমির পরিমাণ ৪০৭৩৭৫৬২ বর্গ কিলোমিটার থেকে কমে ৪০২০৪১৮০ বর্গ কিলোমিটারে দাড়িয়েছে। যদিও বনভূমি হ্রাসের হার উন্নত দেশগুলিতে কম, তবে উষ্ণপ্রধান

টিপ্পনী

অঞ্চলে বনভূমি হ্রাসের হার ৪০-৫০% এর কাছাকাছি। আর এই সমীক্ষা অনুযায়ী আগামী ৬০ বছরের মধ্যে উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের ৯০% বনভূমি হ্রাস হবে বলে জানা যাচ্ছে।

২০১৫ সালের ভারতের বনভূমি সংক্রান্ত রিপোর্ট (ISER) দেখা গেছে প্রায় ৭৯৪২০০০০ হেক্টর ভূমি বনভূমি দ্বারা আবৃত, যা সমগ্র ভৌগলিক অঞ্চলে ২৪.১৬% । তবে ভারতের বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৫০৮১ বর্গ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্টে দেখা গেছে, বনভূমি বৃদ্ধি ঘটেছে প্রধানত মুক্তাঞ্চলে, বনভূমির এলাকার বাইরে। সমগ্র বনভূমনি বৃদ্ধির সাথে সাথে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ও ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারত এখনও ৩৩% বনভূমির লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছনে, আশা করা যায় ভবিষ্যতে ভারত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমর্থ হবে।

**অরন্য নিধনের মুখ্য কারণ সমূহ :**

**(১) ঝুম চাষ -**

ঝুমচাষ প্রথার ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে উত্তর পূর্ব ভারত এবং উড়িষ্যার বেশীরভাগ বন উৎপাটিত হয়েছে। বর্তমানে ঝুম চাষের বৃদ্ধির ফলে ঝুমচক্র গড়ে ৬ বছর এবং কোথাও কোথাও ২-৩ বছরে পরিণত হয়েছে। এত অল্প সময়ে প্রাকৃতিক ক্ষয়পূরণ সম্ভব নয়।

**(২) জ্বালানী সরবরাহ -**

জনবিষ্ফোরণের ফলে মানুষের কাঠ ও জ্বালানীর চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে গবাদি পশুর বৃদ্ধির ফলে প্রচুর পরিমাণে গোখাদ্যের প্রয়োজন হয় যা অরণ্য ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ।

**(৩) কাঁচামালের যোগান -**

বিভিন্ন শিল্পে কাঠ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারর করা হয়, যেমন - কাগজ দেশলাই, কার্ডবোর্ড, প্যাকিং বাক্স, ফার্নিচার প্রভৃতি। এত কাঠের চাহিদা মেটাতে অরণ্য নিধনের পথ অবলম্বন করতে হয়।

**(৪) উন্নয়নমূলক প্রকল্প -**

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান, বড় বাঁধ নির্মান বা রাস্তা ঘাট নির্মানের মত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ব্যাপক হারে অরণ্য নিধন হয়ে থাকে।

## অরণ্য নিধনের প্রভাব :

অরণ্য নিধনের ফলে যে প্রভাবগুলি লক্ষ্য করা যায়, তা হল -

(১) অরণ্যের ধ্বংসের ফলে বহু বণ্যপ্রানীর জীবন সংশয় দেখা দেয়।

(২) জীব বৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়।

(৩) ঋতুচক্রের ভারসাম্য নষ্ঠ হয়।

(৪) ভূমিক্ষয়ের পাশাপাশি মাটির উর্বরতা কমে যায়।

(৫) পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ধসের মত ঘটনা সংঘটিত হয়।

(৬) গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমার পাশাপাশী কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## চিপকো আন্দোলন - একটি উদাহরণ :

কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের হার খুব কম হলে এককালের উর্বর চাষযোগ্য বহুজমি জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক কারণে ও মনুষ্য সৃষ্ঠ বিভিন্ন কারণে ক্রমশ উর্বরতা বা উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফলে , ফলস্বরূপ বনভূমির পরিমান ক্রমশ কমতে থাকে। ভারতে এই পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা ১৯৯০ এর দশক থেকে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রণেও নানা রকম আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৯৭০ এর দশকে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের তেহরি বাঁধ নির্মানকে কেন্দ্র করে বন ছেদনের কর্মসুচীকে অধিবাসীরা রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রতিবাদীরা ২-৩ জন মিলে এক একটি গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছ কাটা থেকে বিরত রাখেন। গাছকে জড়িয়ে ধরার কারণে আন্দোলনটি চিপকো আন্দোলন নামে পরিচিত। বাণিজ্যিক ভাবে কাঠ কাটার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট বনভূমিকে লিজ দিলে এলাকাবাসী অর্থাৎ যাদের জীবন বনভূমির ওপর নির্ভরশীল, তারা গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছ কাটা প্রতিরোধ করেন। তবে এক্ষেত্রে মহিলারা অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। এই আন্দোলনের কারণে প্রায় ১০ লাখ গাছ কাটা থেকে বনভূমিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য বনভূমির ওপর নির্ভর করতে হয়, তাই খাদ্য ও জ্বালানী কাঠের জন্য বনভূমিই হল একমাত্র মাধ্যম।

অরণ্য গবেষণা সংস্থার গবেষনায় প্রমাণীত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বণভূমি রেলের পাতের জন্য উপযুক্ত গুড়ি তৈরিতে ব্যাপকভাবে সক্ষম। তাই সেই কাজ এবং

টিপ্পনী

টিপ্পনী

খেলার সামগ্রী নির্মানের জন্য বনদপ্তর সংশ্লিষ্ট বনভূমিকে ব্যবহারের জন্য ইজারা দেয়, যার ফলশ্রুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা গাছ কাটতে গেলে 'দাসহোলী গ্রাম স্বরাজ্য সংঘ' ব্যাপক বিরোধীতা করে। ১৯৭৩ সালে অলকানন্দ উপত্যাকার মন্ডল গ্রামে চিপকো আন্দোলন শুরু হয়। দাসহোলী গ্রাম স্বরাজ্য সংঘের অন্যতম নেতা চন্ডিকা প্রসাদ ভাট মহিলা এবং শিশুদের দ্বারা গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছ কাটা থেকে বিরত রাখার পন্থাকে অবলম্বন করার কথা বলেন। এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে সাফল্য লাভ করেছিল, যার ফলে প্রায় ১০ লক্ষ গছকে কাটা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। তবে চিপকো আন্দোলনের এই সাফল্য মূলত এসেছিল প্রান্তিক মহিলাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কারণে। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে আদালত উত্তরপ্রদেশ সরকারকে ১৫ বছরের জন্য ব্যবসার ক্ষেত্রে বনভূমিকে নিষিদ্ধ করে।

### বিবিধ কার্যাবলীতে অরণ্যের ব্যবহার : কাঠ নিস্কাশন -

অরণের প্রধান উৎপন্ন বস্তু হল কাঠ। কাঠের বহুমুখী ব্যবহার, যেমন - আসবাব তৈরিতে, বহু শিল্পের কাঁচামাল রূপে এবং জ্বালানী রূপে কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমনকি রাস্তাঘাট নির্মানে ও কাঠের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

### খনন :

খয়লা, খনিজ তেলের মত খনিজের খননে অধিকাংশ সময়ই অরণ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা বিনষ্ট হয়, খননের ফলে ভূগর্ভস্থ পাথরের স্তর তথা মৃত্তিকার স্তর যা সামগ্রীকভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে থাকে। মুসৌরী ও দেরাদুন উপত্যাকার ৩৩ শতাংশ বনভূমি বিবিধ খনিজ উৎপাদনের জন্য খননের কাণে বিনষ্ঠ হয়েছে। রানিগঞ্জ, ঝড়িয়া, ঝাড়খন্ডের বিস্তীর্ণ বনভূমি ধ্বংসের কারণ হল খনন।

### বাঁধ নির্মান এবং অরণ্য ও জনজাতির ওপর প্রভাব :

বড় বাঁধ এবং নদী উপত্যাকা প্রকল্পগুলি বহুমুখি কার্যকলাপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেই কারনে জওহর লাল নেহেরু এই রকম বাঁধ ও নদী উপত্যাকাগুলিকে 'আধুনিক ভারতের রূপকার' মনে করতেন। যদিও বাঁধ অরন্যের ধ্বংসের জন্য দায়ী। ভারতে প্রায় ১৫৫০ টি বাঁধ বর্তমান, যার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৬০০ টি গুজরাটে ২৫০ টি এবং মধ্যপ্রদেশেই ১৩০ টি বাঁধ আছে। উচ্চতম বাঁধটি উত্তরাখন্ডের ভাগীরথী নদীর ওপর তেহরি বাঁধ আর বৃহত্তম বাঁধটি হিমাচল প্রদেশের শতদ্রু নদীর ওপর ভাবরা বাঁধ।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বড় বাঁধকে কেন্দ্র করে পরিবেশগত এবং আর্থ সামাজিক নানা সমস্যা দেখা দেয়। যেমন - সাইলেন্ট ভ্যালি- জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে বনভূমি ও পরিবেশগত ভারসাম্যের সমস্যার কারণে প্রকল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা। আবার চিপকো আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুন্দরলাল বহুগুনা তেহরী বাঁধের কারনে পরিবেশের ক্ষতি ও অরণ্য নিধনের ব্যাপক বিরোধীতা করেন। নর্মদা নদীর ওপর সর্দার বাঁধের কারণে জনজাতি ও পরিবেশ যে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন মেধা পাটেকর ও অরুন্ধতি রায়। পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বন্যা, খরা বা ভূমি ধ্বসের প্রকোপ ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

টিপ্পনী

## ২. জলসম্পদ :-

জল অমূল্য প্রাকৃতিক। আমাদের ধারণা জল অফুরন্ত কেননা পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। জল অফুরন্ত ঠিকই কিন্তু তা হল সমুদ্রের জল। স্বাদু জলের পরিমান কিন্তু অফুরন্ত নয়। ভূপৃষ্ঠের নানা জায়গায় জল অবস্থিত, যেমন - সমুদ্র, নদী, হ্রদ, বিল, পুকুর, বাঁধ, পাহাড়ে পর্বতে অবস্থিত বরফ এবং ভূগর্ভস্থ জল - এর মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগ সমুদ্রে, যা ব্যবহারের অযোগ্য। শতকরা ২ ভাগ পাহাড়-পর্বত ও মেরু অঞ্চলের বরফে বন্দী। মাত্র শতকরা একভাগ জল বিভিন্ন জলাশয়ে এবং ভূগর্ভে অবস্থিত।

### জলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার :

অনন্য বৈশিষ্ঠের কারণে জল নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। জীবন ধারনের জন্য জল অত্যাবশ্যক উপাদান। শারীরীক চাহিদার পাশাপাশি মানুষ জলকে প্রধানত দুভাবে ব্যবহার করে থাকে - জলের ব্যবহার এবং জলের উত্তোলন।

### জল : একটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ :

সারা পৃথিবীতে যদিও জলের পরিমাণ প্রচুর, তবু ও জল একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। জলের মাত্র ০.০০৩ শতাংশ আমাদের ব্যবহারের জন্য পেয়ে থাকি যা ভূগর্ভস্থ জল ও জলাশয়ে জমা জল।

ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পানীয় জল হিসেবে, সেচ প্রকল্পে এবং শিল্পে নির্বিচারে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারের ফলে জলের স্তর ভীষণনভাবে নেমে যাচ্ছে। খরার সময় অনেক নলকূপে জল থাকে না। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আর্সিনিক দূষণ মূলত জলের স্তর থেকেই হচ্ছে।কারণ, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায়

টিপ্পনী

স্যালো, সাবমার্শাল পাম্প ব্যবহারের পরই মূলতঃ ৫০ থেকে ১২০ ফুট পর্যন্ত জলস্তর আর্সেনিক এর মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবার বৃষ্টি বা বরফপাতের কারণে জলাশয়ের জমা জলের বেশিরভাগই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। আর বাকিও জল প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য, যেমন - পানীয় জল, শিল্পে ব্যবহৃত জল, কৃষিতে ব্যবহৃত জল ইত্যাদি। এমনকি সমুদ্র আমাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। পেট্রোলিয়াম জাতীয় খনিজ তেলের বেশীর ভাগটাই সমুদ্রপথে একদেশ থেকে আর একদেশে রপ্তানী হয়। এই সব তেলবাহী জাহাজের ফুটো দিয়ে তেল চুইয়ে পড়ে। কিছু কিছু তেলবাহী জাহাজ সমুদ্র দুর্ঘটনায় পড়ে বিশাল পরিমানে তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলির তেলের ভান্ডার ধ্বংস হওয়ার ফলে প্রচুর পরিমান অপরিশোধিত তেল সমুদ্রে এবংন পড়েছিল। এইসব কারণে জলজপ্রাণীর জীবন ব্যাপকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

জলের অসম বন্টনকে কেন্দচর করে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নানারকম বিবাদ দেখা দেয়। যেমন - জলবন্টনকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সুদান, ঈজিপ্ট ও টার্কিয় মত দেশগুলির বিবাদ, আবার ভারত- পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদীর জলবন্টন সংক্রান্ত চুক্তিকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ এবং কাবেরি নদীর জলকে কেন্দ্র করে তামিলনাড়ু - কর্ণাটকের মত রাজ্যের বিরোধ উল্লেখযোগ্য। একইরকম ভাবে শতদ্রু - যমুনার জল বন্টনকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব হরিয়ানার বিরোধ উল্লেখযোগ্য।

**বড়বাঁধ : সুবিধা ও সমস্যা :**

নদী উপত্যাকাগুলির বহুমুখী উপযোগিতার কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতে নদী উপত্যাকা প্রকল্পের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এই নদী উপত্যাকা প্রকল্পগুলিকেই অনেকাংশে জাতীয় উন্নয়নের নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাঁধকে কেন্দ্র করে এই সব নদী উপত্যাকা প্রকল্পগুলি একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের যোগান দেয় অন্যদিকে তেমনি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্যাপক সাহায্য করে। একদিকে যেমন অর্থনীতির বৃদ্ধি ঘটায় অন্যদিকে তেমনি বিদ্যুতের উৎপাদন করে, জলের অপর্যাপ্ততা কমায়, সেচের জন্য জল সরবরাহ করে থাকে। এককথায় এলাকায় সর্বিক সাহায্য করে থাকে।

**পরিবেশগত সমস্যা :**

বড় বাঁধের কারণে বহুক্ষেত্রে নানা সমস্যায় সম্মুখীন ও হতে হয়। এর প্রভাব স্রোতের অনুকূল ও প্রতিকূলে ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন - আদিবাসী জনজাতির উৎখাত, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, মাছ চাষের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, জলাধারে পলি জমা, জল জমা, জল বাহিত রোগের প্রকোপ, জলবায়ুর পরিবর্তন বন্যার প্রকোপ, লবনাক্ত জলের প্রবেশ যা চাষের ক্ষতি সাধন করে থাকে, জমির উর্বরতা হ্রাস ইত্যাদি।

এইভাবে বাঁধ নির্মানের ফলে সমাজের যেমন বহুক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়ে থাকে এমনি পরিবেশ তথা সমাজের ওপর ও ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই কারনে বর্তমানে বড় বাঁধ নির্মাণের পরিবর্তে ছোট বাধ নির্মাণের ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

## ৩. খনিজ সম্পদ :

খনিজ পদার্থেদর প্রধানতঃ দুটি শ্রেনীতে ভাগ করা যাব - ধাতব খনিজ সম্পদ ও অধাতব খনিজ সম্পদ। ধাতব খনিজ সম্পদ বলতে আমরা লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, রুপা প্রভৃতিকে বুঝে থাকি। প্রকৃতিতে এই সকল ধাতু আকরিকের মধ্যে থাকে। আকরিকের মধ্যে অন্যান্য বিভিন্ন পদার্থ থেকে, আকরিক নিষ্কাশন করে বিশুদ্ধ ধাতু পাওয়া যায়। কোনো কোনো আকরিককে একটির বেশি ধাতু থাকে। যেমন, দস্তার আকরিকের মধ্যে রূপাও পাওয়া যায়। অধাতব খনিজ পদার্থ আছে। যেমন - কয়লা, পেট্রোলিয়াম, সালফার নাইট্রেট, পটাশ ইত্যাদি এর মধ্যে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে এদের খনিজ জ্বালানী বলা হয়।

সাধারণত খনিজ সম্পদ শিল্পের জন্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, নির্মানকাজে, প্রতিরক্ষার উপাদান অর্থাৎ অস্ত্র উৎপাদনে, পরিবহনে, চিকিৎসা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সোনা রূপের অলঙ্কার নির্মানে ব্যবহৃত হয়।

### খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারের কারণে পরিবেশের ওপর প্রভাব :

খনিজ সম্পোদের উত্তোলনের জন্য অত্যাধিক পরিমাণে খনন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খননের কারণে যে ধুলোর উৎপত্তি হয় যা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ক্ষতি করে, মানবজাতি নানা শারীরীক সমস্যার সম্মুখীন হয়। গ্রামীন এলাকায় খননের কারণে ব্যাপকহারে কৃষি জমি নষ্ট

টিপ্পনী

হয়। পাইপ লাইনের মাধ্যমে অ্যাসিড জাত বর্জ্য পদার্থ পাশ্ববর্তী নদী বা জলাশয়ে ফেলা হয়, যার ফলে এলকায় তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবহারের পর খননভূমি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে - পুনরায় ব্যবহার করা যায় না।

তবে নানা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে বর্তমানে খননভূমি বা খনি অঞ্চলকে পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে - ব্যাপক হারে গাছ লাগানো, স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রভৃতি।

## ৪. খাদ্য সম্পদ :

সমগ্র বিশ্বে হাজার হাজার গাছ ও প্রানী আছে যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে আমরা ধান, গম, ভুট্টা, আলু, যব এবং ওটকে চিহ্নিত করে থাকি, এছাড়া নানারকম ফল, শাক-সব্জি, দুধ, মাংস, মাছ এবং সামুদ্রিক নানা খাবার ইত্যাদি।

### বিশ্বের খাদ্য সমস্যা :

প্রতি বছর সারা বিশ্বে খাদ্য সংকটে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোসীমা শহরে পরমানু বিস্ফোরণে যে পরিমান মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, তার সমতুল সংখ্যক মানুষ সারাবছর শুধুমাত্র খাদ্যের অভাবেই মারা যায়। তাই সামগ্রিকভাবে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বাড়ানোর পাশাপাশি খাদ্যের সমান বন্টন ও অত্যন্ত জরুরি। এর পাশাপাশি জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজন। ভারতের মতো দেশের খাদ্য সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হল অত্যাধিক জনসংখ্যা।

পশুচারনের ফলে কৃষিজমি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভূমিক্ষয়, জমির উর্বরতা হ্রাস ও নানা উপকারী জীব প্রজাতির ধ্বংস। আবার কৃষিকাজের ফলে অরণ্য নিধন ভূমিক্ষয় ও হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ের আধুনিক কৃষির ফলে নানা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন - বহু ফসলী শস্যের চাষ, উর্বরতা জনিত সমস্যা, কীটনাশকের মাত্রারিক্ত ব্যবহার জল জমা ও জমির লবণাক্ত হয়ে যাওয়ার সমস্যা ইত্যাদি।

### খাদ্য সম্পদ : জল জমা এবং লবণাক্ত :-

যে সব অঞ্চলে মাটির ঠিক নীচেই জলের অবস্থিতি, সেইসব অঞ্চলে

সাধারনত শস্য চাষের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং ক্রমেই সেই সব জলাভূমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে । আবার ক্রমাগত সারের ব্যবহার প্লাবনের মাধ্যমে নোনা জলের প্রবেশের ফলে জমি লবণাক্ত চরিত্রের হয়ে পড়ে এবং চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

## ৫. শক্তি সম্পদ :-

টিপ্পনী

কাজ করার ক্ষমমতাকে শক্তি বলা হয়। মানুষের লক্ষ্য হল অল্প পরিশ্রমে , অল্প ব্যায়ে সর্বাধিক সামান্য লাভ করা । শক্তির সঠিক ব্যবহারকেই মানুষের এই লক্ষ্যপূরণ করা হয় । যান্ত্রিক শক্তি, তাপশক্তি, আলোক শক্তি, চৌম্বক শক্তি,বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি মানুষের দখলে। শক্তির ব্যবহারে কৃষি, শিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জীবন যাত্রার সবস্তরে আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

যে সব জড় পদার্থ থেকে শক্তি আহরণ করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানী। যেমন, - কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ, এগুলির ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এই সব নির্দিষ্ঠ জড় পদার্থগুলির সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে আসছে। পুনরায় ব্যবহার অযোগ্য শক্তির বিভিন্ন উৎসগুলি যত সংকুচিত হয়ে আসছে ততই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির উৎস নিয়ে রেষারেষি বাড়ছে। কারণ শক্তির ওপরই মানব সভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

শক্তি ও পরিবেশ সংকটের সন্ধিক্ষণে ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিষয়ে সমাজ সচেতন হয়ে পড়ায় শক্তির নতুন উৎস সন্ধানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে । পুনর্নবীকরণযোগ্য ও অপ্রচলিত শক্তির উৎস যেমন সূর্যরশ্মি, ভাটা, বায়ুপ্রবাহ, আবর্জনা, ভূ-তাপ ইত্যাদি থেকে শক্তি আহরণের প্রযুক্তি নিয়ে সর্বত্র গবেষণা চলছে।

## ৬. ভূ সম্পদ :

ভূমি সীমাবদ্ধ এবং মূল্যবান সম্পদ, কারণ আমাদের খাদ্য ও জ্বালানীর প্রয়োজন আমরা ভূমি থেকেই পাই। জনসংখ্যার মাত্রারিক্ত বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব প্রভৃতির কারণে দিন দিন এই ভূ-সম্পদের অবক্ষয় হচ্ছে। ভূমি ক্ষয়, জল জমে থাকা, লবণাক্ত হয়ে যাওয়া এবং কারখানার দূষিত বর্জ্য পদার্থ মাটিতে মেশার ফলে দূষিত হবে যাওয়া জমির অবক্ষয় করছে।

ভূমি ক্ষয়ের কারণে মটি তার উর্বরতা হারায় । ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের

কয়েকটি উপায় হল - সংরক্ষণ মূলক চাষ, বেড়া বা আঁল নির্মানের মাধ্যম চাষ, জল জমতে না দেওয়া ইত্যাদি। ভূমি ধসের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে ভূসম্পদ বিনষ্ট হয়ে থাকে।

অনেক সময় আবার মরুভূমির ক্রমাগত বিস্তারের কারণে ভূসম্পদ নষ্ঠ হয়। তাই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ভূ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে চলেছে। এই প্রবণতা বন্ধ করা প্রয়োজন।

টিপ্পনী

## ১.৩.৩. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষনে ব্যাক্তিগত ভূমিকা :

অরণ্য, জল, মাটি, খাদ্য, খনিজ এবং শক্তি সম্পদগুলি কোনো দেশের উন্নয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালণ করে থাকে। আমরা ব্যাক্তিগত উদ্যোগে এই সব সম্পদ গুলিকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে পারি। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সম্পদগুলির সংরক্ষণ করা যায়।

### জলসংরক্ষণ :

(১) দাঁড়ি কাটা, ব্রাশ করা, জামাকাপড় ধোয়া এবং স্নানের সময় জলের কল বন্ধ রাখা।

(২) ওয়াশিং মেশিনে নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্তই জল ভর্তি করা।

(৩) কম জল ব্যবহার অর্থাৎ প্রতিটি ফ্লাশে কম জলের ব্যবহারের ব্যবস্থা স্থাপন করা।

(৪) বাথরুমের পাইপের ফুটোর দ্রুত মেরামত করা।

(৫) জামাকাপড় ধোয়া বা সাবান জলকে বাগান বা রাস্তা পরিস্কারে ব্যবহার করা।

(৬) সন্ধ্যার সময় গাছে জল দেওয়া যাতে করে জলের বাষ্পীভবনের পরিমাণ কম হয়।

(৭) বৃষ্টির জল ধরার ব্যবস্থা করা।

### শক্তি সংরক্ষণ :

(১) পাখা, আলো এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন যন্ত্রের বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা প্রয়োজন না হলে।

(২) প্রাকৃতিক সম্পনদকে বেশী ব্যবহার, যেমন - জামা-কাপডকে রোদে শোকানো ইত্যাদি।

(৩) রান্নার জন্য সৌর চালিত কুকার ব্যবহার করলে গ্যাসের ব্যবহার কম হয়।

(৪) কম ড্রাইভ করে, সাধারণ পরিবহন বেশি ব্যবহার বা অংশীদারীভিত্তিক ট্যাক্সিতে যাতায়াত করে জ্বালানী সংরক্ষণ করা।

(৫) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

(৬) কাঁচ, ধাতু ও কাগজের পুনর্ব্যবহার।

(৭) কাছাকাছি দূরত্বে যাতাযাতের জন্য সাইকেল বা হাঁটাকে অবলম্বন করা।

টিপ্পনী

### মৃত্তিকা সংরক্ষণ :

(১) প্রাকৃতিক উপায়ে হার্বাল গাছ ও ঘাসের চাষ করলে মাটি ক্ষয় কম হয়।

(২) রান্নাঘরের বর্জ্য পদার্থ বাগানে ব্যবহার।

(৩) তীব্র স্রোতবাহী অঞ্চলে গাছ না লাগানো।

(৪) সেচের উপযুক্ত ব্যবহার মৃত্তিকা সংরক্ষণে সাহায্য করে।

### চিরায়ত কৃষিতে উৎসাহ :

(১) অতিরিক্ত খাদ্য অপচয় না করা, যতটা প্রয়োজন ততটাই নেওয়া।

(২) কীটনাশকের ব্যবহার কমানো।

(৩) স্থানীয় ও মরসুমী সবজী খাওয়া।

(৪) পোকামাকড়কে নিয়ন্ত্রণ করা।

(৫) জৈব সারের প্রয়োগ করা।

(৬) সেচে ফোঁটা ফোঁটা জলের ব্যবহার করা।

## ১.৪. সংক্ষিপ্তসার :

- বৃহত্তর অর্থে পরিবেশ বিজ্ঞান হল, স্থলজ, বায়ুমন্ডলীয়, জীবিত এবং নৃতাত্ত্বিক পরিবেশের জটিল বিজ্ঞান।
- অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে আমরা সেইসব উপাদান বা শক্তিকে বুঝে থাকি, যা মানুষ, তার কার্যকলাপ এবং পারিপার্শ্বিক অঞ্চলকে প্রভাবিত করে।
- সাংস্কৃতিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা ভাবনার বহিঃপ্রকাশকে চিহ্নিত করে, নির্মাণ, রাস্তাঘাট ও বাগান তৈরীতে এর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করে থাকি।
- রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে আমরা বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন

টিপ্পনী

বিভাগের প্রভাবকে বুঝে থাকি। এই প্রভাব কোনো দেশের নির্মাণ, পরিচালনা ও উন্নয়নকে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

- দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নিষ্কাশন, জৈব বর্জ্য পদার্থ এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধোঁয়া ও ধুলো নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ বিজ্ঞান ব্যাপক ভূমিকা নিয়ে থাকে।
- পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সীমিত সম্পদের পুনরায় ব্যবহার এবং উপযুক্ত ব্যবহার করা।
- বাস্তুতন্ত্রের অত্যাবশক উপাদান - শক্তি, স্থান, সময়, এবং বৈচিত্রকে একসঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে এই সব উপাদানের যথাযথ ব্যবহার ।
- পুনর্নবীকরণ যোগ্য সম্পদের ব্যবহারে বেশী গুরুত্ব দেওয়া।
- মানুষের ব্যবহারে নিঃশেষিত সম্পদকে চিহ্নিত করা। সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়া।
- সীমিত সম্পদের অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবহার।
- বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জমি অরণ্যে দ্বারা আবৃত।
- খননের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার খনি অঞ্চলকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারে।
- জল যদিও বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, তবুও এই মূল্যবান সম্পদের যথাযথ ব্যবহারই ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে জলকে বাঁচিয়ে রাখবে, না হলে ব্যবহারযোগ্য জল নিঃশেষিত হয়ে পড়বে।
- পৃথিবীতে অজস্র খনিজ সম্পদ বর্তমান শুধুমাত্র উপযুক্ত ব্যবহারই এই সব খনিজের কার্যকারিতা বাড়াতে ও টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।
- অজস্র গাছ ও প্রানী প্রজাতি বর্তমান যা মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। যেমন - ধান, গম, যব, ভুট্টা আর প্রাণীজ - গাছ, মাংস ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শক্তির ব্যবহার কোন দেশের উন্নয়নকে নির্দেশ করে।
- প্রাথমিকভাবে শক্তি সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় - পুনর্নবীকরণ যোগ্য ও পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ।
- জমি বা ভূ-সম্পদ সীমিত, এর উপরই আমাদের খাদ্য, বাস ও জীবন ধারনের জন্য নির্ভর করতে হয়।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য, বস্ত্র , বাসস্থানের চাহিদাও দিন দিন ব্যাপক

তীব্র আকার ধারণ করছে।

- ভূমিক্ষয় শুধুমাত্র চাষের বা কৃষির ক্ষতি করে না, সার্বিকভাবে সমগ্র মানুষের ক্ষতি করে থাকে। তাই ভূমিক্ষয় রোধ করা প্রয়োজন।

## ১.৫. মুখ্য পরিভাষা :

টিপ্পনী

**পরিবেশ : -**

জল, বাতাস, ভূমি এবং এদের সাথে মানবজাতির আন্তঃসম্পর্ককে পরিবেশ বলা হয়।

**পরিবেশ বিদ্যা :-**

পরিবেশ সংক্রান্ত শাস্ত্রকেই পরিবেশ বিদ্যা বলা হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখার নয়, পরিবেশ বিদ্যা সমগ্র শাখাকে বোঝার জন্য একটি একত্রীভূত শাস্ত্র।

**পরিবেশ বিজ্ঞান :-**

পরিবেশ বিজ্ঞান হল স্থলজ, বায়ুমন্ডলীয়, জৈব এবং নৃতাত্ত্বিক পরিবেশের জটিল সমষ্টি। রসায়ন বিদ্যা, জীববিদ্যা, সমাজবিদ্যা এবং সরকারী কার্যকলাপের সাথে পরিবেশে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

**আর্থনৈতিক পরিবেশ :**

অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে আমরা সেইসব উপাদান বা শক্তিকে বুঝে থাকি, যা ব্যাক্তি ও তার কার্য কলাপকে প্রভাবিত করে। সম্পদসমূহ, আর্থিক নীতি, আর্থিক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থা - এককথায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেসব উপাদানকে আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করে, প্রতিটি উপাদানই অর্থনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত।

**রাজনৈতিকর পরিবেশ :**

বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগ এবং এইসব বিভাগের দ্বারা প্রভবিত কার্যাবলী রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত। কোনো দেশের পরিচালনা, উন্নয়ন বা বৈদেশিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

## ১.৬. অগ্রগতি পরীক্ষণ -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

(১) জল, বাতাস এবং ভূমির সমষ্টি ও মানবজাতির সাথে এদের সম্পর্ককে একত্রে পরিবেশ বলা হয়।

(২) পৃথিবী, জল, বাতাস, নিয়ে আলোচ্য শাস্ত্রকে পরিবেশ বিজ্ঞান বলা হয়। সময়ের

টিপ্পনী

সাথে সাথে পরিবেশ বিজ্ঞান থেকে বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা গুরুত্ব পেয়ে আসছে।

(৩) প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র শারীরিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহেদর সমষ্ঠি।

(৪) বিশ্ব উষ্ণায়ন, জনসংখ্যা জনিত সমস্যা, ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধন, মেরু অঞ্চলের বরফ স্তরের গলন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের নেমে যাওয়া এবং জল দূষণ।

(৫) গণমাধ্যম নানারকম বিজ্ঞপন, ডকুমেন্টরী, সিনেমার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে চলেছে । এছাড়া সংবাদপত্র ও নানা পত্রিকার প্রকাশের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(৬) অরণ্য সম্পদ, জল সম্পদ, খনিজ সম্পদ, খাদ্য সম্পদ ও শক্তি সম্পদকে একত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়।

(৭) অরণ্যের কাছ থেকে আমরা যা যা সুবিধা পেয়ে থাকি তা হল - অক্সিজেন, গ্রীণহাউস গ্যাসের কার্বন শোষণ প্রভৃতির মাধ্যমে গাছ আমাদের মত জীব জগৎ বাঁচিয়ে রাখতে পারে। গাছ বহু প্রানীর আবাসস্থল এবং গাছের শিকড় মাটি আঁকড়ে রেখে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করে।

(৮) ছোট্ট ছোট্ট ব্যাক্তিগত উদ্যোগ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। যেমন - ব্রাশ করার সময় জামা কাপড় ধোয়ার সময় বা ওয়াশিং মেশিনের ব্যবহারে সময় জলের অপচয় রোধ করা।

(৯) সম্পদের সমান বন্টনের প্রয়োজন, না হলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিভেদ কমার বদলে বৃদ্ধি পাবে, যা কাম্য নয়।

## ১.৬. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১) "যদি তুমি এক বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে ধান চাষ করো, যদি দশ বছরের পরিকল্পণা করো তাহলে গাছ লাগাও আর যদি একশ বছরের পরিকল্পোনা করো তাহলে জণগনকে শিক্ষিত করো: - মন্তব্য কার ?

২) তুমি কী মনে করো অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলি কী পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩) পরিবশগত রসায়ন বিদ্যা প্রধান যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে, তার আলোচনা কর।

৪) পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং পুনর্নবীকরণ অযোগ্য সম্পদ বলতে কী বোঝ ? উদাহরণ দাও।

## রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

১)পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী ?

২) পরিবেশ শিক্ষার পরিধি কী রূপ ?

৩) পরিবেশ সচেতনতা কীভাবে পরিবেশকে সংরক্ষণ করে ?

৪) অরণ্যের বিবিধ ব্যবহার লেখ ? ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অরণ্যের ব্যবহার কী বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলেছে ?

৫) অরণ্য ধ্বংসের বা নিধনের প্রধান কারণগুলি কী ?

৬) জল বন্টন সংক্রান্ত বিবাদ কী ? একটি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জলবন্টন কেন্দ্রীক বিতর্ক আলোচনা কর।

## ১.৮. গ্রন্থপঞ্জী :


১) Jacobson, Mark Z. 2002. Atmosphere Pollution History, Science and Regulation, UK : Cambridge University Press.

২) Khopkar, S.M. 2004. Environmental Pollution Monitoring and Control, New Delhi : New Age International.

৩) Harrison, Roy M 2001. Pollution : Causes, Effects and Control, UK : Royal Society of Chemistry.

8) Easton, Thomas, 2008. Classic Edition Sources : Environmental Studies, Third Edition, Ohio : Megram Hill.


টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

30

# দ্বিতীয় একক

# বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

টিপ্পনী


২.০. ভূমিকা

২.১. এককের উদ্দেশ্য সমূহ

২.২. বাস্তুতন্ত্রের ধারণা

- ২.২.১. বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ
- ২.২.২. মানুষ ও বাস্তুতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক
- ২.২.৩. বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য

২.৩. বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলী

- ২.৩.১. বাস্তুতন্ত্রের উপাদান
- ২.৩.২. বাস্তুতন্ত্রের গঠন
- ২.৩.৩. বাস্তুতন্ত্রের কার্যাবলী
- ২.৩.৪. বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ
- ২.৩.৫. বাস্তুতন্ত্রের সংস্থাগত পরম্পরা বা অনুক্রম

২.৪. খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্য প্রবাহ এবং বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড

- ২.৪.১. বণভূমি বা অরণ্য ভূমির বাস্তুতন্ত্রঃ গঠন ও কার্যাবলী
- ২.৪.২. জীববৈচিত্র্য : সংজ্ঞা, জাতি, প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য।

২.৫. জীববৈচিত্র্যের মূল্য

- ২.৫.১. আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য

২.৬. জীববৈচিত্র্যের সংকট ও সংরক্ষণ

- ২.৬.১. জীববৈচিত্র্যের আশংকা বা সংকট
- ২.৬.২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

২.৭. সারমর্ম

২.৮. মূলকথা বা মূখ্য আলোচনা

২.৯. ক্রমিক উন্নতির আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ

২.১০. প্রশ্নাবলী এবং অনুশীলনী

টিপ্পনী

## ২.০. ভূমিকা :

পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য বাস্তুসংস্থান (Ecology) সম্পর্কে কতকগুলি প্রাথমিক ধারণা থাকা আবশ্যিক। ইকোলজি (Ecology) শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ ঐকস (Oiks) থেকে, যার অর্থ গৃহ (House) অথবা বসবাসের স্থান (Place to live) আক্ষরিক অর্থে 'ইকোলজি' বলতে বোঝায় জীব গোষ্ঠী ও তাদের স্বাভাবিক বাসভূমি সম্পর্কে জ্ঞান বা অধ্যয়ণ। জীবগোষ্ঠীর এইরূপ স্বাভাবিক বাসভূমি গুলি হল সমতল ভূমি, সাগর, মিষ্টি বা সুপেয় জলের প্রাকৃতিক বাসভূমি এবং বায়ুমন্ডল, ইকোলজি বলতে প্রকৃতি তার গঠন প্রণালী এবং কার্যাবলীকেও বোঝানো হয়। এই নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট বাসভূমি একটি জীবগোষ্ঠী তার সংখ্যা অথবা সম্প্রদায় সম্বন্ধে ধারণা গঠনে পরিবেশ বিজ্ঞান সচেষ্ট হন।

যদিও 'ইকোলজি' বলতে বোঝায় জীবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক বাসভূমি সম্পর্কে জ্ঞান বা অধ্যয়ন কিন্তু শুধু তাই , এখানে পরিবেশের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাস্তুসংস্থান বা ইকোলজি শব্দটির দ্বারা জীব গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের পরিবেশের আদান প্রদানের সম্পর্কটিও নির্দেশিত হয়। এটি মূলতঃ কার্য করে তিনটি স্তরে , যেমন -

(১) স্বতন্ত্র জীবগোষ্ঠী

(২) তাদের জনসংখ্যা নির্ণয়। ( একই জাতিগত জীবগোষ্ঠী)

(৩) তাদের শ্রেণীগত সংখ্যার নির্ধারণ। (একই শ্রেনীগত জীবগোষ্ঠী)

প্রথমস্তরে বাস্তুসংস্থান আলোচনা করে একটি নির্দিষ্ট বাসভূমিতে কোন জীবগোষ্ঠীর প্রভাব এবং সেই নির্দিষ্ট জীবগোষ্ঠীর উপর তার বাসভূমির প্রভাব সম্বন্ধে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রীণ হাউস গ্যাসের উৎপত্তির ক্ষেত্রে মানবজাতির ভূমিকা এবং মানবজাতির উপর এই গ্যাসের প্রভাব জনিত বিপদের সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত স্তরে এটি আলোচনা করে কোন নির্দিষ্ট একটি বাস্তুতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট জীবনগোষ্ঠীর অবস্থান, তাদের উপস্থিতি- অনুপস্থিতি তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত প্রভাব ও সংখ্যার তারতম্য নির্ধারণ সম্বন্ধে। তৃতীয় স্তরে এর লক্ষ্য হল পরিবেশে নির্দিষ্ট শ্রেনীর জীব গোষ্ঠীর গঠন, কার্যাবলী এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের প্রভাব নির্ধারণ করা এবং এ বিষয়ে আগেও দেখা সে কিভাবে মানব জাতির ভূমিকা ছাড়াও জলবায়ুগত ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঐ নির্দিষ্ট শ্রেণির জীবগোষ্ঠীর সংখ্যাগত তারতম্যের কারণ হয়।

বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে ; 'ইকোলজি' বা বাস্তুসংস্থান মূলত একটি নির্দিষ্ট

পরিবেশ বা বাসভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদান গুলির পারস্পরিক আদান প্রদানের সম্বন্ধ, তাদের শ্রেনি ও সংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে।

ইকোলজি শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে । যেমন Woodbury (1954) এর মতে 'Ecology is a Science which intestates Organisms in relation to their environment' অর্থাৎ 'ইকোলজি হল এমন একটি বিজ্ঞান, যা কিনা একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠী ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুসন্ধান করে । আবার E.P. Odum (1969) এর মতে, 'Ecology as the study of structure and function of nature' অর্থাৎ 'ইকোলজি' বলতে বোঝায় প্রকৃতির গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান বা অধ্যায়ন । এবিষয়ে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি প্রদান করে Charles Krebs (1985) বলেছেন, 'Ecology is the Scientific Study of the interaction that determines the distribution and abundance of organism' অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার জীবের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পাঠই হল 'ইকোলজি' বা বাস্তুরীতি বা বাস্তুসংস্থান।

ইকোলজি বা বাস্তুসংস্থানে 'বাস্তুতন্ত্র' শব্দটি মূলত কোন একটি নির্দিষ্ট জাতির জীবগোষ্ঠীর বসবাসের স্থান বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন একটি পুকুর হল শ্যাওলা এবং মাছের বাস্তুতন্ত্র । সেখানে নিসে (Nicne) বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর প্রাথমিক একক-কে এটি এদের (জীবগোষ্ঠীর) কার্যকরী দিক । সেখানে প্রাকৃতিক বাসভূমি (Habitat) হল জীব গোষ্ঠীর বসবাসের স্থান । Population শব্দটি ব্যবহৃত হয় মূলতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবগোষ্ঠিকে বোঝাতে এবং 'Community' অথবা 'Biotic community' বা সম্প্রদায় বা জীব সম্প্রদায় বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারি একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবগোষ্ঠী (Population) কে বোঝাতে যাকে বাস্তুতন্ত্র বা Habitat ও বলা হয়।

'ইকোলজি' বা বাস্তুতন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এর অন্তর্গত আলোচ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি হল কৃষি, উদ্যান পালন, মৃত্তিকার সংরক্ষণ অরণ্যের সংরক্ষণ, বণ্যপ্রাণী এবং জল সংরক্ষণ।

এই এককে আলোচিত হবে জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধেও আমরা যদি এই পৃথিবীকে মোট দশ শত কোটি ভাগে বিভক্ত করি তাহলে দেখা যাবে যে এটি হল এমন এক মাত্র ভাগ যেখানে জীবন বা প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় এবং যা প্রায় ৫০ লক্ষ

টিপ্পনী

প্রজাতির  জীব। এরা প্রত্যেকেই বসবাস করতে এমন একটি স্থানে যা খুব স্বল্প পরিমাণ মাটিই, জল এবং বায়ু দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানে দেখা যাবে যে কি অদ্ভুত চমকপ্রদ ভাবে প্রকৃতির দ্বারা অতি ক্ষুদ্র ভৌত পদার্থ থেকে কতরকম জীব বৈচিত্র্যের উৎপত্তি ঘটে।

জীববৈচিত্র্য বলতে সকল প্রকার জীব গোষ্ঠীর যাবতীয় প্রকার ও তাদের বৈশিষ্ট্যকেও নির্দেশ করে যেগুলিকে কিনা নিজ নিজ বাস্তুতন্ত্র অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জীব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত সভায় 'জীব বৈচিত্র্য' বলতে বসবাসযোগ্য স্থলভাগ ও সামুদ্রিক বাসভূমি সহ অন্যান্য যাবতীয় জলভাগের বাসভূমির জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকারকে নির্দেশিত করা হয় যেগুলি কিনা বাস্তুতন্ত্রের ও এক একটি  অংশ।

'জীববৈচিত্র্য' বলতে সকল প্রকার জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকার ও তাদের বিবিধ বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয় এটি জৈব বা জীব সম্পদকেও নির্দেশ করে। এটি মূলত পরিলক্ষিত হয় ত্রিস্তরে ; যেমন - জাতিগত বৈচিত্র্যে বংশগত বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র বা বাসভূমিগত বৈচিত্র্যে।

## ২.১. আলোচ্য অংশের লক্ষ্য (Unit Objectives) :

- বাস্তুতন্ত্রের ধারনা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
- বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।
- বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা।
- বাস্তু সংস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা।
- জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করা।
- জীব বৈচিত্র্যের বিভিন্ন প্রকার বিষয়ে আলোচনা করা।

## ২.২. বাস্তুতন্ত্রের ধারণা :

একটি জীবগোষ্ঠী বলতে বোঝায় জীবন বা প্রাণের এমন এক ক্ষেত্র যার সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে এককোষী জীব অ্যামিবা থেকে শুরু করে বহুকোষী হাঙ্গর যেমন অন্তর্ভুক্ত হয় তেমনি অন্তর্ভুক্ত হয় ছোট ছোট চারাগাছ থেকে সুবিশাল বটবৃক্ষ ও। অর্থাৎ এটি সকল প্রকার প্রানী ও বৃক্ষ সবকিছুকেই নিজ পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করে।

## প্রজাতি (Species) :

প্রজাতি বলতে বোঝানো হয় এমন কতকগুলি জীবগোষ্ঠী যারা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার গত প্রজাতিগত, আচরণগত ও গঠনগত দিক থেকে সদৃশ। ফলতঃ এদের সহাবস্থান স্বাভাবিক অবস্থাতে তাদের সন্তান প্রজনন করে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ মানুষ এরা প্রত্যেকেই গঠনগত দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে সদৃশ তাই এদের প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে দৈহিক নিয়মাবলী থেকে শুরু করে জাতিগত দিক থেকে অভিন্ন। এইভাবে তাদের ঐক্যবদ্ধতা একটি নির্দিষ্ট জাতির বা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

## জনসংখ্যা (Population) :

জনসংখ্যা বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী স্বতন্ত্র্য কতকগুলি জীবগোষ্ঠি। যেমন - গুজরাটের 'গির' জাতীয় অভয়ারণ্যে।

## সম্প্রদায় (Community) :

সম্প্রদায় বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিনিময়ে গড়ে ওঠা এবং এক একটি জীবসমষ্টি ক্ষেত্র। যেমন - 'গির' জাতীয় অভয়রাণ্য হল সিংহ, হরিণ এবং অনান্য প্রাণীর (গবাদি বা মেষ বাদে) বসবাসের স্থান। এছাড়াও এখানে দেখা যায় ছোট ছোট তৃণ থেকে শুরু করে জীবনের সকল প্রকার রূপ গুলিকে।

এইভাবেই খাদ্যাভাস থেকে শুরু করে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সম্প্রদায়গুলি।

## চক্র (Cycle) :

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানগুলি পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে তাকে বলা হয় চক্র।

## খাদ্যশৃঙ্খল (Fooed Chain) :

খাদ্য খাদক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে খাদ্যশক্তি উৎপাদক থেকে ক্রমপর্যায়ে আরও উন্নত জীব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয়, শক্তি প্রবাহের সেই ক্রমিক পর্যায়কে খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

## ধারণ ক্ষমতা (Carrying Capacity) :

একটি নির্দিষ্ট বাসভূমিতে বসবাসকারী একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর যে সর্বাধিক জনসংখ্যা তাকে বলা হয় ধারণ ক্ষমতা বা সেই জমির ধারণ ক্ষমতা।

## বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) :

যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জীবসম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে এবং ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন জড় বা অজৈব উপাদানের মধ্যে জৈব, রাসায়নিক ও ভৌত সম্পর্ক সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সম্পর্কের আদান প্রদান ঘটায়, তাকে বলে বাস্তুতন্ত্র। এইভাবে একটি বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন জীব বা জৈব এবং অজৈব উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেমন - 'গির' অভয়ারণ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন জড় বা অজৈব উপাদান যেমন - মাটি, জল, পাহাড়, এমনকি সৌরশক্তির সম্পর্ক (যা কিনা বৃক্ষের দ্বারা শোষিত হয়) গড়ে উঠেছে।

এইভাবে বলা যায়, পৃথিবীর মাটিতে বিভিন্ন প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর বা জীবসম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক দৃঢ় ক্ষেত্র।

কিংবা এভাবেও বলা যায় যেক, বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি (Ecosystem) হল এমন একটি ক্ষেত্র সেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ভৌত ও রাসয়নিক উপাদানগুলির পারস্পারিক সম্বন্ধ।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী এ.জি. ট্যানসলে (A.G. Tansly) সর্বপ্রথম ইকোসিস্টেম (Ecosystem) শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে বাস্তুতন্ত্র বলতে বোঝায় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা তাদের নিজ বাসভূমি।

Odum (ওডাম) এর মতে বাস্তুতন্ত্র হল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জীব সম্প্রদায় ও ভৌত রাসায়নিক পদার্থের সম্বন্ধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি ক্ষেত্র। যারফলে শক্তিপ্রবাহ এক দেহ থেকে অন্যদেহে স্থানান্তরিত বা প্রবাহিত হয় যার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ও রাসায়নিক চক্রের পরিচালন পরিলক্ষিত হয়।

মাইকেল অ্যালাবি (Michael Allaby) (1983) এর মতে, ইকোসিস্টেম বলতে বোঝায় পরিবেশ বসবাসকারী পরস্পর নির্ভর জীবসম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি একক বা ক্ষেত্র।

ইকোসিস্টেম কথাটি হয়েছে দুটি শব্দ থেকে : 'ইকো; এবং 'সিস্টেম'। ইকো বলতে বোঝায় এমন বাস্তু রীতি বা বাস্তুসংস্থান যেখানে জীবনসম্প্রদায় বসবাস

করে এবং সিস্টেম বলতে বোঝায় ঐ বাসভূমিতে জীব সম্প্রদায়ের পারস্পারিক সম্পর্কের আদান প্রদান। কাজেই 'ইকোসিস্টেম'' বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট বাসভূমিতে জীব সম্প্রদায় ও জড় পদার্থ গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের আদান প্রদান।

যা একটি নির্দিষ্ট বাসভূমিতে এমন এক বৈচিত্র্যের সূচনা করে যার মধ্যে দিয়ে জীব সম্প্রদায় ও জড় পদার্থ গুলির নানা বৈশিষ্ট্যের প্রজাতি হয়। জীব সম্প্রদায় ও জড় পদার্থ গুলির এইরূপ পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কোন একটি বিষয়ের কোন বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন অপর পদর্থের মধ্যে ও পরিবর্তনের সূচনা করে।

নিয়ম বলতে বোঝায় এমন একটি নিরিখ যার ভিত্তিতে কোন একটি বিষয় বা পদার্থ বা জীব অপর কোন বিষয়ে বা পদার্থ বা জীব সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র হয়। 'নিয়ম' মূলত তিন প্রকারের হয়। যেমন -

## প্রথমত : স্বতন্ত্র নিয়ম (Isolated System) :

পরিবেশের এই নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে একটি নির্দিষ্ট বাসভূমিতে অবস্থানকারী ব্যাক্তি কিংবা পদার্থ এদের কোনটির মধ্যেই স্থানান্তর হয় না।

## দ্বিতীয়ত : বন্ধ নিয়ম (Closed System) :

এই নিয়মানুসারে শক্তির স্থানান্তর হলেও পদার্থগুলির মধ্যে কোনও প্রকার স্থানান্তর হয় না।

## তৃতীয়ত : উন্মুক্ত নিয়ম (Open System) :

এই নিয়ম অনুসারে শক্তি এবং পদার্থ উভয়ের স্থানান্তর হয়। জীব সম্প্রদায় এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত।

বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে নিয়মগুলির সীমা অতি কঠোর নয়। জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে যে বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠে তাতে উভয়ের কার্যাবলী বা ক্রিয়াগুলি তাদের উভয়কেই ঐ পরিবেশের জন্য আবশ্যিক রূপে উল্লেখ করে। জীবের জীবন পরিচালনা এবং পদার্থের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঐ নিয়ম এই উভয়ের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয়। একটি বাস্তুতন্ত্রের গঠন এবং কার্যাবলী উভয় দিক। গঠনগত দিক থেকে বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন জাতি ও প্রজাতি গত জীব সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। এবং এর কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে জীব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন জীবের মধ্যে শক্তির স্থানান্তর এর উল্লেখ করে। এই দৃষ্টিকোন অনুসারে সমগ্র পৃথিবীকে একটি বাস্তুতন্ত্র রূপে উল্লেখ করা যায়। যার মধ্যে সমগ্র জীব

টিপ্পনী

(যাদের প্রাণ আছে) সম্প্রদায় জীবমন্ডল রূপে পরিচিত হয়। যা সমুদ্রের তলদেশ প্রায় এগারো হাজার (১১০০০) কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পনের হাজার (১৫০০০) কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

## বাস্তুতন্ত্রের প্রকার (Types of Ecosystem) :

টিপ্পনী

বাস্তুতন্ত্র মূলত দুই প্রকারের হয়। যেমন - প্রথমত - স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র এবং দ্বিতীয়ত - কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র।

**স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র (Natural Ecosystem) :**

যে সকল বাস্তুতন্ত্র স্বনিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন- পুকুর বা ডোবা, উদ্যান, সাগর, অরণ্য, তৃণভূমি এবং মরুভূমি এই গুলির সবই স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র, এই স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র আবার দুই প্রকারের হয়। যেমন, প্রথমত - স্থলভাগের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র (Terrestrial Ecosystem) দ্বিতীয়ত - জলভাগের বাস্তুতন্ত্র (Aquatic ecosystem)।

**কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র (Artificial Ecosystem) :**

মানুষ নির্মিত যে সকল বাস্তুতন্ত্র যেমন শহর, নগর, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি সকল বাস্তুতন্ত্রকে বলা হয় কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র।

## ২.২.১. বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ (Ecosystem Resources) :

বহুবছর পরেই ভারতের গ্রামবাসীগণ অরণ্যের কাঠ এবং জ্বালানী তেলের উপর নির্ভরশীল ছিলেন নিজের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য। যদিও প্রাথমিক ভাবে একশবছর মানব সভ্যতার প্রথমদিকে জ্বালানী সমস্যা ছিল না তথাপি পরবর্তীকালে জনসংখ্যার আধিক্য (Population) হওয়ায় জ্বালানীর চাহিদা হওয়ায় অরণ্যের ধ্বংস করা শুরু হল। যা বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসের ও কারণ হয়ে দাঁড়াল। এইভাবেই বিভিন্ন ব্যাক্তির ক্রিয়াকলাপে বাস্তুতন্ত্র প্রভাবিত হয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

38

অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক উন্নতি এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। যার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়েছিল। পরিবর্তন এসেছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর প্রাথমিকভাবে এহেন আর্থ - সামাজিক উন্নয়ন সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নের সূচক হলেও এর অবৈতনিক ব্যবহার পরবর্তী কালে সমাজব্যস্থাকে প্রভাবিত করে। এবং বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তুতান্ত্রিক উন্নয়নে তাতে বসবাসকারী সকল জীব সম্প্রদায়ের খাদ্য, জল, বাসস্থান

ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

বলা বাহুল্য যে বাস্তুতন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও তার প্রতি যত্ন সচেতনতাই আমাদের গ্রহের অস্তিত্বের কারন হয়। যার উপর নির্ভর করে মানব জাতি সহ সমগ্র জীব সম্প্রদয়ের অস্তিত্ব। যদিও এর মধ্যেও কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন - জলবায়ুর পরিবর্তন, জীব বৈচিত্র্যের অবলুপ্তিকরণ উপকূলীয় এলাকার সমস্যা সহ সুনামীর মতো নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তথাপি স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র মিথজীবি সহ সকল জীব সম্প্রদায়ের খাদ্য। প্রয়োজনীয় পানীয় ও অনুকূল বাসস্থানের পরিবেশ প্রদানের মধ্যে দিয়ে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে।

**টিপ্পনী**

**ভূমি (Land) :**

পৃথিবীর যে অংশটি জল দ্বারা বেষ্টিত নয়, তা ভূমি নামে পরিচিত হয়। যা জীব সম্প্রদায়কে তাদের বেঁচে থাকার জন্য অনুকূল পরিবেশ দান করে। ভূ-প্রকৃতি যেভাবে তার অমূল্য সম্পদ যোগান দিয়ে মানব জীবনকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে তা অনন্য। কিন্তু মানব জাতি প্রকৃতির এই নিঃস্বার্থ দান কে সম্মান না জানিয়ে আরও অধিক ভাবে লাভবান হওয়ার জন্য যেভাবে অরণ্যের ধ্বংস, পুকুর বা জলাশয় ভরাট, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় তৈরী শিল্প কিংবা কৃষিক্ষেত্র গড়ে তুলে প্রত্যক্ষভাবে নিজ পরিবেশ এবং ভূমি ধ্বংস করছে। সেই ক্ষতি পূরণ করা এক কথায় অসম্ভব। কারণ ভূপ্রকৃতির পুর্ণনবীকরণ বা পুণঃনির্মাণ অতি ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়। যা কিনা এই ব্যাপক পরিমাণ ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। এর ফলে পরবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এবিষয়ের সাম্প্রতিক কিছু গবেষনায় এটি দেখা যাচ্ছে যা ভূপ্রকৃতির চিরাচরিত সম্পদগুলি কে কিভাবে মানুষ যথেষ্ট হারে এবং অবৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহার করছে। যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আগামী দিনগুলিতে বিপদের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। নিম্নাঙ্কিত চিত্রটির মধ্যে যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

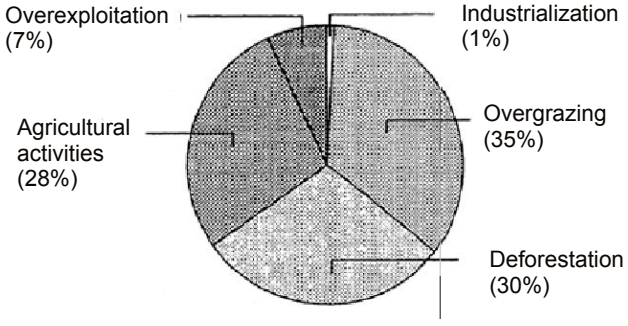


***Fig. 2.1** Causes of Land Resource Degradation*

টিপ্পনী

এইরূপে দেখা যায় যে, ভূসম্পদের অবৈজ্ঞানিক ও যথেচ্ছ ব্যবহার বাস্তুতন্ত্রের ব্যাক্তি প্রবাহের ধারাবাহিকতা ও ভারসাম্য ব্যবহারমূলে পরিবর্তন সূচিত করছে। যার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। প্রভাবিত হচ্ছে জীব সম্প্রদায়ের খাদ্যের যোগান ব্যবস্থা। কৃষিক্ষেত্রে ইত্যাদি। তাই আমাদেরই ব্যাক্তিগত স্বার্থে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে নিজেদের পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রের প্রতি সচেতন হবে। গুরুত্ব দিতে হবে পরিবেশের মানোন্নয়নের প্রতি। সচেতন হতে হবে নিজেদের প্রয়োজনে ভূসম্পদের প্রয়োজনীয় ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। যাতে আমাদের পরিবেশ। বাস্তুতন্ত্র এবং ভূসম্পদ সমৃদ্ধ থাকে।

**জল (Water) :**

বাস্তুতন্ত্রের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল জল বা জলমন্ডল। বায়ুমন্ডলের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ এটি। জীবসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও জনসংখ্যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের জীবন, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে জল হল একটি মৌলোক সম্পদ। যা প্রকৃতিই যোগান দেয়। জীব জগতের চাহিদানুসারে প্রায় ৯৭.৫ শতাংশ জল পাওয়া যায় সাগর এবং মহাসাগর থেকে বাকি ২.৫ শতাংশ পাওয়া যায় ভূ-অভ্যন্তরস্থ জল এবং পরিবেশের জলচক্রের থেকে। নিম্নাঙ্কিত চিত্রটির দ্বারা এর একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

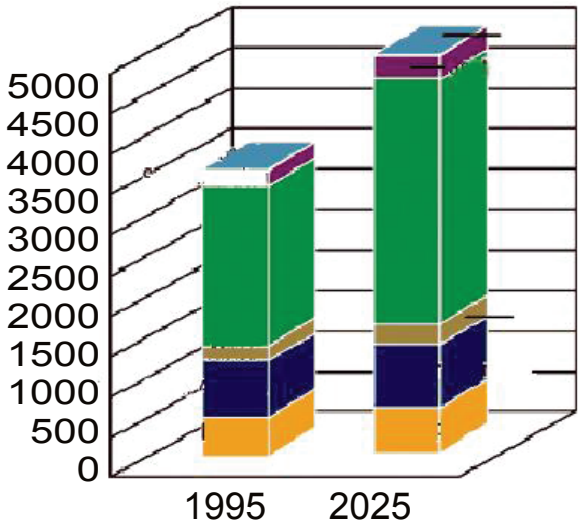


সমগ্র বিশ্বজুড়ে পরিশ্রুত জলের অভাব দেখা দিয়েছে। এবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় অতিমাত্রায় জলের অপচয়। গৃহস্থালীর দৈন্দদিন জীবনযাত্রায়

জলের অপচয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রগুলিই আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ সহ চিন, আফ্রিকা এবং ইউরোপ ইত্যাদি দেশে জল সংকট দেখা দেবে। ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতে দেখা দেবে পরিশ্রুত জলের অতিমাত্রায় সঙ্কট।

তাই বর্তমান ভারতবর্ষে জলসঙ্কট মোচন করে প্রয়োজনীয় জলের যোগান যাতে অক্ষুন্ন রাখা যায় সে বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান ও সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে । প্রত্যেকেই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে যাতে কেবল প্রয়োজনমতো জলই ব্যবহার করা হয় এবং জলের অপচয় না হয় এবিষয়ে নানা প্রকার সরকারী ও আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, জন সচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে জীব অনুকূল ও প্রয়োজনীয় পরিবেশ রক্ষার্থে কৃষি, শিল্প ও গৃহপালিত সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় জলের যোগান অক্ষুন্ন রাখা যায়।

**টিপ্পনী**

**বায়ু (Air) :**

পৃথিবীকে ঘিরে রাখা বায়বীয় মন্ডল বা বায়ু মন্ডলের সমগ্র জীবকূলের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। জীব প্রজাতির বিশেষ করে মানব জাতির শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার পরিচালনার কার্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

যা ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্থ হতে যথেষ্ট বায়ুদূষণের ফলে। যেমন বায়ুদূষণের জন্য দায়ী এমন কতকগুলি উপাদান নাইট্রোজেন অক্সাইড ($NO_2$), অ্যামোনিয়া ($NH_3$) এবং সালফার-ডাই-অক্সাইড ($SO_2$) এইগুলি বাস্তুতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। এই গ্যাসীয় উপাদানগুলি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। ফলে স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রে জীব সম্প্রদায়ের প্রয়োজণীয় খাদ্য যোগানে অভাব দেখা দিয়েছে।

**শক্তি (Energy) :**

পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে জীব সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং বাস্তুতান্ত্রিক পরিস্থিতি এইভাবে পরস্পর সংলগ্ন। তাই সার্বিক স্বার্থে আমাদের শক্তির যোগান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কারণ বাস্তুতন্ত্রে বর্তমানে যে পরিমাণ শক্তি রয়েছে, তা শুধু সে প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট নয় এমন নয়। বরং তা অতিমাত্রায় কমও। তই জীবসম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিয়ে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমাদের পরিবেশের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

**পরিবেশের অন্যান্য সম্পদ (Other Resources) :**

বাস্তুতন্ত্রের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল জীববৈচিত্র্য। পরিবেশে যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। এটি জীব সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজণীয় খাদ্যের যোগান

টিপ্পনী

সরবরাহ করা থেকে শুরু করে জ্বালানী, শক্তির স্থানান্তকরণ, পুষ্টি সরবরাহ, জলবায়ুগত নিয়ম, বন্যা, খরা সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নিয়ন্ত্রণ সহ নানা প্রকার সামাজিক সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ হয়।

তবে বর্তমানে অতিমাত্রায় নগরায়ন ও শিল্পায়ন জগতের জীব বৈচিত্র্যের বিনাশ ঘটাচ্ছে। তাই সেই সকল জীব সম্প্রদায়, বিভিন্ন প্রানী, গাছ ইত্যাদির সংরক্ষণ প্রয়োজন জীব বৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য । এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Union for Conservation of Nature (IUCN) বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

## ২.২.২. মানুষ ও বাস্তুতন্ত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ (Human -Ecosystem Interactions) :

যে বাস্তুতন্ত্র তার নিজ প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রদান করে সেই বাস্তুতন্ত্রই কখনও কখনও মানুষের বিভিন্ন কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয় । সে বিষয়ে মানুষকে সচেতন হতে হবে । কারণ সমগ্র মানব জাতীর অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তি, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এবং সহ সকল সুবিধা প্রদান করে বাস্তুতন্ত্র । তাই নিজেদের স্বার্থ বা প্রয়োজনের তাগিদেই মানব জাতিকে তাদের নিজ পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্র ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে।

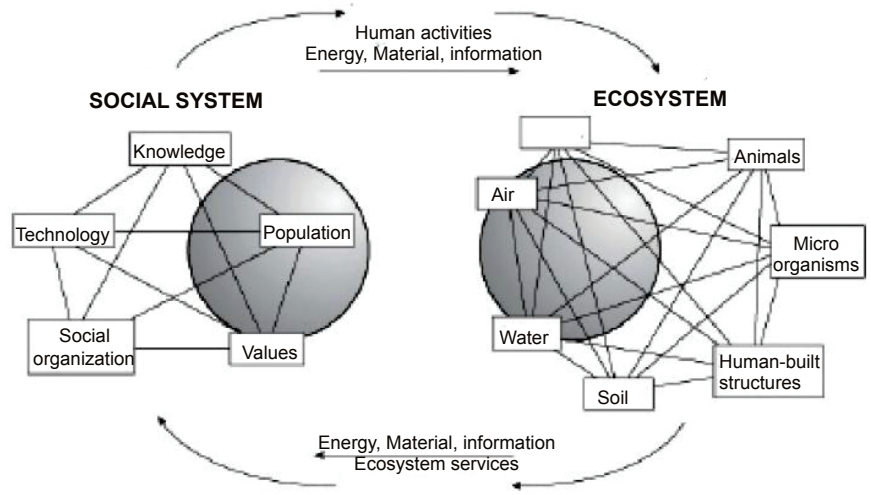


***Fig. 2.3** Human–Ecosystem Interaction*

## সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ (Common Property Resources) :

CPR বা Common Pcroperty Resources বা সাধারণ সম্পদ কিংবা আরও স্পষ্ট করে প্রাকৃতিক সাধারণ সম্পদ বলতে বোঝায় এমন যা সকলেই ব্যবহার করতে পারে নিজ প্রয়োজন অনুসারে। এগুলি কারো একান্ত ব্যাক্তিগত সম্পত্তি নয়। এগুলি যে কোন ক্ষেত্রে যেমন গ্রাম্য বা শহুরে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এর ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত : এটি সহজ লভ্য, দ্বিতীয়ত। এর সার্বিক বা সাধারণ ব্যবহার এবং তৃতীয়ত : কেবল ব্যাক্তি প্রয়োজনেই বরং সমষ্টির প্রয়োজনে এর সার্বিক প্রয়োগ।

ভারতবর্ষের জন জীবনের অগ্রগতিতে এর সভ্যতার বাহক রূপে এই CPRS বা Common Property Resourus এর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ এটি ভারতের গ্রাম্য এবং শহুরে সভ্যতার জনজীবনে উন্নয়নের নির্ণায়ক। শুধু তাই এর অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল চাহিদানুসারে যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রেও। যার ফলে দেখা যায় আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় সকলের জন্য এক সম বন্টন নীতি ও তদনুসারে সামাজিক প্রতিনিয়ম অবস্থান।

## সহ অবস্থন (Coexistence) :

বাস্তুতন্ত্রে সহ অবস্থান এর বিষয়টি হল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে স্বভোজী জীব বা উৎপাদক এবং খাদক বা পরভোজী পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরতা পূর্বক অবস্থান করে। এদের এই রূপ আবশ্যিক এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাস্তুতন্ত্রে মৌল রাসায়নিক পদার্থ ও শক্তি প্রবাহকে ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখে। যা কিনা ভৌত প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

একটি বাস্তুতন্ত্রে সহঅবস্থানের ক্ষেত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মানব জাতির সঙ্গে অন্যান্য প্রণীর সম্বন্ধটিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেখানে এরা পরস্পর অতি সুন্দর ভাবে এবং সম মনোভাব অবস্থান করে। এক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোনকওরূপ হিংসার মনোভাব দেখা যায় না। দক্ষীন ক্যালিফোর্ণিয়ার নগর সভ্যতার বাস্তুতন্ত্র এই সম অবস্থান এদর প্রকৃত উদাহরণরূপে গৃহীত হতে পারে।

## উপযোগী ও উন্নয়ন (Adaptive Development) :

উপযোগী উন্নয়ন বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থাকে যা কিনা পরিবেশে উথিত যে কোন সমস্যার সমাধান করে বসবাসের অনুকূল করতে পারে। যেকোন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন - খরা, বণ্যা ঝড়, দাবানল ও তদজনিত দূষন এইসবগুলিকেই প্রকৃতিতে চিরকালীন অবস্থান করে। ফলত এগুলির জন্য পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু পরিবেশ এইরূপ বিরূপ পরিস্থিতিকে জীবের বসবাসের উপযোগী ও অনুকূল করে তোলে ঐরূপ উপযোগী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা পরিবেশে এবং প্রকৃতিতে স্থিতিস্থাপক। যার ব্যাতিরেকে যেকোন রকম দুর্যোগ বা দূষণ কিংবা যেকোন রূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই প্রকৃতি কোনওরকম ভাবেই নিজ ভারসাম্যাবস্থা কায়েম রাখতে অক্ষুন্ন।

## ২.২.৩. বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ব্যবস্থা (Ecological Balance) :

পরিবেশের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যদি সুসম্পর্ক স্থাপন করা যায় অর্থাৎ চাহিদা হিসাবে উৎপাদন করে পরিবেশের জীবের বসবাসের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী করা যায় তবে তাকে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ব্যবস্থা বা অবস্থান বলা যায়।

টি. ডি. ব্লকের মতে, 'Stay State condition in nature ecosystem is a time independent condition in which production and consumption of each constituent in the system is exactly balanced, the conuntration of all constituents within the system remains constant even though there occurs a continual change.' অর্থাৎ পরিবেশের চাহিদা অনুসারে যোগান বা উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমান হতে হবে এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক কিংবা পরিবেশগত পরিবর্তন সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত হতে হবে। তবেই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হবে। এবিষয়ে বহু পদ্ধতি বা তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হল।

### (১) বৈচিত্র্য তত্ত্ব ও ভারসাম্য অবস্থান :

যদি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য জালিকা বা খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে, তবে সেখানে অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে পরিবেশগত জীব বৈচিত্র্য অবস্থান করে।

### (২) আভ্যন্তরীন যান্ত্রিকতা :

নির্দিষ্ট কোন পরিবেশে তার নিজস্ব সকল নিয়ম বা বিধিকে আভ্যন্তরীন যান্ত্রিকতা বা Homostatic Mechanism বলা হয়। বিষয়টি এইরূপ যে, যদি কোন পরিবেশে নির্দিষ্ট কোন প্রজাতির জীবের সংখ্যা অত্যাধিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের

চাহিদানুসারে যদি খাদ্যের যোগান না দেওয়া যায় তবে সেই বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ তার গ্রহণ এবং সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে বিবিধ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ফলে বহু প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে। এবং বাস্তুতন্ত্রে কাম্য প্রাণীর সংখ্যাই বসবাস করবে। পুনরায় বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্যাবস্থা বিনষ্ঠ হবে।

## (৩) পদ্ধতি :

টিপ্পনী

ভারসাম্যের অবস্থান এবং অনবস্থান উভয়ের দ্বারাই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যবস্থা বর্ণিত হতে পারে। পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র যদি কোন বাহ্যিক কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে কোন কোন আবহে পরিবেশ সেই সকল প্রভাবকে কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে নিজগুনে অনুকূল করে তোলে। আর যদি কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ এই পদ্ধতিতে সক্ষম না হয় তো ঐ সকল ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি পরিবেশে উপস্থিত তার তুলনায় বেশী অনুকূল অবস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে দুর্বল হয়ে যায়। ফলে এই ভাবেও বাস্তুতন্ত্রে সমতা বজায় থাকে।

### বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের অনবস্থান :

কোন নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী জৈব-অজৈব সহ প্রতিটি উপাদান যেমন - মানুষ, পশু, পক্ষী এদের মধ্যে আবার নিরামিষ পক্ষী, আমিষ প্রাণী কিংবা অজৈব উপাদান যেমন বায়ু এবং এর বিভিন্ন মৌল বায়বীয় উপাদান কঠিন, অক্সিজেন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ইত্যাদি সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। এদেদর মধ্যে যদি কোনভাবে সেই মাত্রার তারতম্য বা ভেদের সূচনা হয় তবে তাতে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়।

### বাস্তুতন্ত্রের বা বাস্তুসংস্থানের গুরুত্ব (Importance of Ecology) :

বিগত দশ বছরে জনসংখ্যার ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে মানুষ নিজেই তাদের বাস্তুতন্ত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যেমন : -

- পটাশিয়াম যুগে ট্রায়াসিক উপযুগ ছিলো প্রায় ২৫ লক্ষ বছর।
- বিশ্ব উষ্ণায়ন দেখা দিয়েছে।
- ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
- অরণ্যের ধ্বংস ও মরুকরণ হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির প্রানী ও উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
- ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে চেরনোবিল দুর্ঘটনায় বহু মানুষ মারা গিয়েছেন। মারণরোগ ক্যান্সারের প্রভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রানীকূল প্রভাবিত হয়েছে।

টিপ্পনী

এইভাবে বস্তুসংস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ আমাদেরকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। আমাদের এটি অনুধাবন করায় যে কিভাবে এটি আমাদেরই অর্থাৎ সমগ্র জীবকূলের অস্তিত্ব রক্ষার প্রতি সহায়ক। তাই এর পাঠ আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক। এটি বিজ্ঞানেরই একটি শাখা, কারণ এখানে যেমন জীব বিজ্ঞানের কথা হয়। তেমনি পদার্থ বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রানীবিজ্ঞান সকল বিষয় সম্পর্কেই অবগত করা হয়। কাজেই নিজেদের প্রয়োজনে ও স্বার্থেই এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই আমাদের সকলেরই নিজ নিজ পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক ও প্রয়োজনীয়।

## প্রাকৃতিক সম্পদের অবলুপ্তি করণ সম্পর্কিত তথ্য :

জাগতিক পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধান কেন্দ্র (World Warth Instutite) এই বিষয় সম্পর্কে নানারকম পরীক্ষা -নিরীক্ষা পূর্বক মোট চুয়াল্লিশটি কারন অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন, যার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের অবলুপ্তি হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে -

## বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming) :

- জলবায়ুর পরিবর্তন, যা কিনা ঋতু বৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করছে ; প্রভাবিত হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ।
- গ্রিণ হাউস গ্যাসের প্রভাব।
- ওজোন স্তরের ক্ষতি।
- অরণ্যের ধ্বংস।
- জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে উপকূলীয় এলাকার পরিবর্তন। উপকূলের ভাঙন ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কিত হতে হবে জীবকূলের নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই। তবেই কোন নির্দিষ্ট পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রে জীব বা জৈব ও অজৈব উপাদানের পাস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে জীবকূলের বসবাসযোগ্য অনুকূল বাস্তুসংস্থান।

## অনুশীলনী :

১. 'ইকোলজি' শব্দটির উৎপত্তি ব্যাখ্যা কর।

২. বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুসংস্থান বলতে কি বোঝ ?

৩. দুই প্রকার বাস্তুতন্ত্রের উল্লেখ কর।

৪. বাস্তুতন্ত্রে সহ অবস্থান বলতে কি বোঝ ?

৫. CPR বা Common Property Resource বা সাধারণ সম্পদ বলতে কি বোঝ ?

৬. আভ্যন্তরীন যান্ত্রিকতা বলতে কি বোঝ ? পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রে এর গুরুত্ব কোথায় ?

টিপ্পনী

## ২.৩. বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলী (Structure and Function of an Ecosystem) :

বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট স্থানের পরিবেশ এবং ঐ পরিবেশে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠী ও অজৈব উপদানের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি পরিবেশগত অবস্থান। ১৯৩৫ খ্রীঃ বিজ্ঞানী A.G. Tansley সর্বপ্রথম ইকোসিস্টেম (Ecosystem) শব্দটি ব্যবহার করেন। একটি বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠী এবং অজৈব উপদান এরা উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই সম্পর্কের উপর নির্ভর করেই জীবকূলের প্রানের অস্তিত্ব এবং জীবনের পরিচালন সম্ভব হয়। এইভাবেই গড়ে ওঠে জলভূমি ও সমতলভূমির বাস্তুতন্ত্র। এই পৃথিবীতে সর্বাধিক বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্রটি হলো জীবমন্ডল (Biosphere) যার ভারসাম্যবস্থা ও অবস্থান স্বয়ং পর্যাপ্ত (Self Sufficient)। একটি বাস্তুতন্ত্রের মূল দুটি উপাদান। যেমন - সজীব (Biotic) উপাদান এবং অজীব বা জড় (Abiotic) উপাদান। বাস্তুতন্ত্রকে জীবনদায়ী বা জীবনের সহায়ক একটি সূত্র (Life Support System) বলা যায়।

## ২.৩.১. বাস্তুতন্ত্রের উপাদান (Components of Ecosystem) :

বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে এর সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাপর কিছু বিষয় সম্পর্কে ধারণা গঠন করে প্রয়োজন। যেমন -

### জীবমন্ডল :

জীবমন্ডল গঠিত হয় সজীবজাত উপদানের সমন্বয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ সহ তাদের মৃতদেহের বিয়োজক এরা সকলেই জীয়নমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ এডুওয়ার্ড সিউন (Edward Sun) জীবমন্ডলের ধারণাটি সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ করেন। তাঁর মতে জীবমন্ডল বলতে বোঝায়, পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসকারী

টিপ্পনী

জীবনের বা জীবজগতের অবস্থান (The Place on Earth surface where life dwells)।

**বায়োম (Biome) :**

বায়োম হল পরিবেশ প্রণালীর মধ্যে একটি বৃহত্তম একক যা কিনা একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে জীববৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক। এটি বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীকূল। উদ্ভিজ এবং অনুজীবীদের বসবাসের স্থান। ভৌগলিক বহন ও জলবায়ু এবং উদ্ভিদের ভিত্তিতে বায়োমকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জল তাপমাত্রা এবং মৃত্তিকার গুনগত এবং অবস্থানগত তারতম্য দেখা যায়। তবে ভূতত্ত্ববিদগন প্রধান পাঁচটি প্রকারের বায়োমের উল্লেখ করেছেন। যেমন - জলীয় (Aquatic), মরুভূমি (Desedrt), অরণ্য (Forest), তৃণভূমি (Qransland) এবং তুন্দ্রা (Tundra)। প্রতিটি বায়োম অন্যোন্য হয় তার অন্তর্গত অজৈব উপাদান দ্বারা, বিশেষত জলবায়ু এবং পরিবেশ ও বাস্তুরীতিগত বিভিন্ন উপদানের ভিত্তিতে।

ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বায়োমের তুলনায় পরিধি বা বিস্তৃতিতে ছোট যা অবশ্যই বিবিধ হতে পারে। ইকোসিস্টেম (Ecosystem) শব্দটি এসেছে 'Eco' এবং 'System' থেকে এদের 'ইকো' শব্দটির অর্থ হল বসতি বা বাসভূমি বা জীবের বসবাসের স্থান বা Habitat এবং 'System' বলতে বোঝায় পরস্পর শৃঙ্খলাবাদ এমন সব কার্যাবলী যা একটি নির্দিষ্ট নিয়মতন্ত্রকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে বা গড়ে তোলে। প্রতিটি ইকোসিস্টেম (Ecosystem) বা বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুসংস্থান গঠিত হব বিভিন্ন সজীব (Biotic) উপাদান দ্বারা, যেগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষেত্রেই বা বাসভূমিতে পরিলক্ষিত হয়, অণ্যদিকে এরই পারপার্শিক প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রে থাকে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান বা অজৈব উপাদান যা জীবজগতের অনুকূল অস্তিত্বের পক্ষে সহায়ক হয়। যার জন্য একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী ও বিবিধ অজৈব উপাদান বা ভৌত রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্তরে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুসংস্থান গুলি নির্দেশিত হয় 'বায়োম' নামে, আবার সকল বৃহৎ বাস্তুতন্ত্র পরিচিত হয় জীবমন্ডল বা Biospwre' নামেও। নিম্নে চিত্রে বাস্তুসংস্থান বা বাস্তুরীতির (Ecology) বিভিন্ন স্তর অঙ্কিত করে চিহ্নিত করণ করা হল।

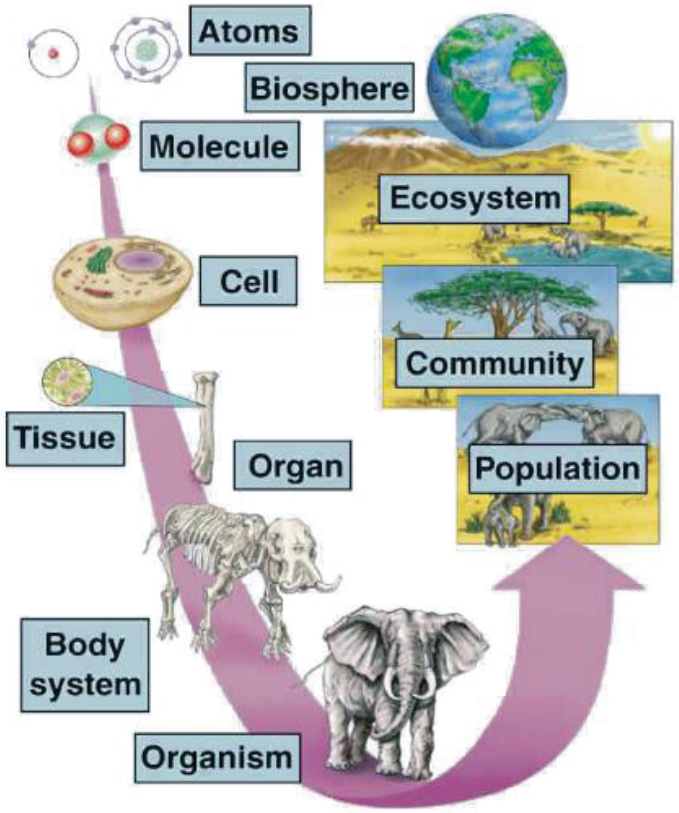


***Fig. 2.4*** *Levels of Organization in Ecology*

## ২.৩.২. বাস্তুতন্ত্রের গঠন (Sturture of on Ecosystem)

বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান গুলিকে মূলতঃ দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - সজীব উপাদান ( Biotic components) এবং নির্জীব বা জড় উপাদান (Abiotic Components) । জৈব বা সজীব উপাদানের অন্তর্গত হল সকল প্রানীকূল এবং নির্জীব বা জড় উপাদানের অন্তর্গত হল বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক উপাদান সমূহ যা বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী সকল প্রাণীকূলের জীবনের অনুকূল অস্তিত্বের পক্ষে সহায়ক হয়। এছাড়াও থাকে বিভিন্ন শক্তি বা শক্তি সমূহ সেগুলি বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে অবস্থান করে। নিম্নে চিত্রে বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান গুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

টিপ্পনী

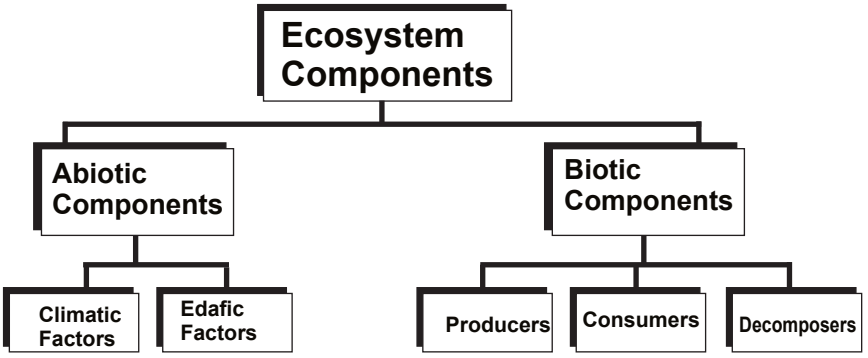


***Fig.*** *Components of an Ecosystem*

**১. নির্জীব বা জড় উপাদান (Abiotic Component) :**

নির্জীব বা জড় উপাদান গঠিত হয় শক্তি, অজৈব পদার্থ, বিবিধ মিথজীবী উপাদনা, মাটি এবং জলবায়ু ইত্যাদি দ্বারা যেগুলি একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের ভৌত পরিবেশ গঠন করে।

**২. সজীব উপাদান (Biotic Components)**

বাস্তুতন্ত্রে সজীব উপাদান বলতে বোঝায় সমগ্র প্রানী বা জীবকূলকে। যা মূলতঃ গঠিত হয় বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রানী ও অনুঘটক দ্বারা। এই সজীব উপাদান কে আবার মূল তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

(১) স্বভোজী বা উৎপাদক (Autotraphs)

(২) পরভোজী বা খাদক (Heterptraphs)

(৩) বিয়োজক (Saptotraphs)

এই বিবিধ ভাগের মধ্যে যারা খাদক (hetrotraph) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বভোজী উপাদান গুলিকে খাদ্য রুপে গ্রহণ করে নিজেদের দেহে পুষ্টি ও শক্তির যোগান দেয়। প্রাণী জগৎ মূলতঃ খাদক স্তরের অন্তর্গত। অর্থাৎ পরভোজী। উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের মৃত্যুর পর নিজেদের দেহ এবং ত্বক এর বিয়োজন ঘটিয়ে মাটিতে রাসায়নিক যৌগের সরবরাহ করে। বাস্তুতন্ত্র বা পরিবেশের যে সকল উপাদান এইরূপে মৃত উদ্ভিদ ও খাদকের মৃত দেহ বিয়োজন করে সরল রাসায়নিক যৌগে পরিণত করে তাদের বিয়োজক বলা হয়। বিয়োজকরা মৃত উদ্ভিদ ও প্রানীর রাসায়নিক যৌগগুলিকে ভেঙে কিছুটা নিজেরা নিজেদের পুষ্টির জন্য ব্যবহার করে এবং বাকিটা অজৈব লবণ হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদেরা এই লবণগুলিকে নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে।

**স্বভোজী জীব বা উৎপাদক (Autotrophs)**

সবুজ উদ্ভিদের মূলতঃ এই স্বভোজী বা উৎপাদক স্তরের অন্তর্গত। Auto শব্দটির অর্থ 'Self' বা 'স্ব' এবং 'Trophic' এর অর্থ হল 'পুষ্টি' (Nourishing)। বাস্তুতন্ত্রে সবুজ উদ্ভিদ, শৈবাল সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি সব স্বভোজী উপদানের অন্তর্গত। এদের উৎপাদনও বলা হয়। এদের প্রধান কাজ হল সকল বড় উপাদান বা অজীব উপাদান থেকে শক্তি শেষণ করে পরিবেশের সকল সজীব উপাদানের মধ্যে সঞ্চারিত করা। উৎপাদক বলতে মূলতঃ সবুজ উদ্ভিদদেরই বোঝানো হয়। এরা ক্লোরোফিল, জল, কার্বনডাই অক্সাইড ইত্যাদির সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, যা পরিবেশে অক্সিজেনের যোগান দেয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে, সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এর সম অনু অক্সিজেন ত্যাগ করে। সবুজ উদ্ভিদের এই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বলা হয়। এই প্রক্রিয়া একদিকে যেমন তাদের নিজেদের অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদের খাদ্য এবং পুষ্টির যোগান দেয়, তেমনি পরিবেশের অনান্য জীবকূলের শ্বাসকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অতিপ্রয়োজনীয় গ্যাসীয় উপাদান অর্থাৎ অক্সিজেন সরবরাহ করে। ইংরেজীতে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে ফটোসিন্থেসিস (Photosysthysis) বলা হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, Photo' শব্দটির অর্থ হল আলো এবং 'সিন্থেসিস্' শব্দটির অর্থ হল সংশ্লেষ।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হল -

$$6CO_2 + 6H_2O + \text{সূর্যালোক} \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

এই সমীকরণের ফলে পরিবেশের অক্সিজেন নিঃসৃত হয়। যা জীবজগতের শ্বাসকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

**খাদক বা পরভোজী (Heterotrops)**

বাস্তুতন্ত্রে যে সকল প্রানী নিজেদের খাদ্য বা পুষ্টি বিভিন্ন স্তর থেকে সংগ্রহ করে তাদের বলা হয় পরভোজী বা খাদক। এরা নিজেরা নিজেদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। বরং এই সকল খাদক বা পরভোজী উপাদান গুলি বাস্তুতন্ত্রে অপরাপর স্বভোজী বা উৎপাদকদের উপর নিজেদের খাদ্য এবং পুষ্টির জন্য নির্ভরশীল। এই স্তরের জীব উৎপাদকদের তৈরী করা খাদ্য গ্রহণ করে নিজেদের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দেহে পুষ্টি যোগান দেয়। খাদ্যাভাস বা খাদ্যের অভ্যাস অনুসারে খাদক প্রানীদের মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

**প্রথমত : তৃণভোজী খাদক বা হার্বিভোর (Herbivores) :**

যে সকল খাদক প্রানী নিজেদের খাদ্যের জন্য গাছ, লতা-পাতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এবং এগুলিকেই নিজেদের খাদ্য রূপে গ্রহণ করে নিজেদের পুষ্টি সংগ্রহ করে তাদের বলা হয় তৃণভোজী খাদক।

**দ্বিতীয়ত : মাংসাশী - স্তনপায়ী খাদক বা কার্ণিভোর (Carnivore) :**

বাস্তুতন্ত্রের যে সকল প্রানী অপরাপর প্রানীদের নিজেদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং স্তন্যপায়ী তাদের মাংসাশী স্তনপায়ী প্রানী বলা হয়।

**তৃতীয়ত : সর্বভুক খাদক বা ওমানিভোর (Omanivore) :**

বাস্তুতন্ত্রের যে সকল প্রানী উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীবজন্তু বা প্রানীদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে নিজেদের জীবন ধারণ করে তাদের বলা হয় সর্বভুক খাদক।

বাস্তুতন্ত্রের যে সকল প্রানী খাদক, যারা নিজেদের খাদ্যের জন্য স্বভোজী বা উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল, তাদের খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্য খাদক সম্পর্কের স্তরের ভিত্তিতে মোট চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (১) প্রাথমিক খাদক (Primary Consumers) (২) দ্বিতীয় স্তরের বা গৌণ খাদক (Secondary Consumers) (৩) তৃতীয় স্তরের খাদক বা প্রগৌণ খাদক (Tretiary Connsumus) এবং (৪) বিয়োজক (Decompose)

**(১) প্রাথমিক খাদক (Primary Consumers) :**

বাস্তুতন্তের যে সকল খাদক প্রানী নিজেদের খাদ্যের এবং পুষ্টির জন্য সরাসরি উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে তাদের বলা হয় প্রাথমিক খাদক। এরা সবাই তৃণভোজী প্রানী। যেমন - গরু, ছাগল, ভেড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি।

**(২) দ্বিতীয় স্তরের খাদক বা গৌণ খাদক (Secondary Consumers) :**

যে সকল খাদক প্রানী খাদ্য হিসেবে তৃণভোজী প্রানীদের বা প্রাথমিক খাদকদের খায়, তাদের দ্বিতীয় স্তরের খাদক বা গৌণ খাদক বলা হয়। যেমন - কুকুর, বিড়াল, জলজ পতঙ্গ, ছোট মাছ ইত্যাদি।

**(৩) তৃতীয় স্তরের খাদক বা প্রগৌণ খাদক (Tertiary Consumers) :**

যে সকল খাদক প্রানী নিজেদের খাদ্যরূপে প্রাথমিক এবং গৌণ উভয়প্রকার খাদক প্রানীদের গ্রহণ করে তাদের বলা হয় তৃতীয় স্তরের খাদক বা প্রগৌণ খাদক। যেমন - সিংহ, বাঘ, শকুন, সাপ, মাছ, বক ইত্যাদি।

**(৪) বিয়োজক (Decomposer)**

বিয়োজক স্তরের প্রানীরা ও খাদক, তবে এরা এদের খাদ্য জন্য জীব বা উদ্ভিদের মৃতদেহের উপর নির্ভর করে। বিয়োজকরা অনুবীক্ষনিক জীব। মৃত উদ্ভিদ ও প্রানীদের শরীরে জটিল যৌগগুলিকে ভেঙে সরল রাসায়নিক যৌগে পরিণত করাই এদের কাজ। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের যে সকল উপাদান মৃতজীবী অর্থাৎ সারা মৃত উদ্ভিদ ও খাদকদের মৃতদেহ বিয়োজিত করে তাদের বলা হয় বিয়োজক। যেমন - কিছু কিছু প্রানী যাদের প্রটোজোয়া বলা হয়, ব্যাকটিরিয়া ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি।

বিয়োজক প্রানী বাস্তুতন্ত্রে মৃত উদ্ভিদ ও প্রানীদেহের প্রটোপ্লাজমের জটিল রাসায়নিক যৌগগুলিকে ভেঙে কিছুটা নিজেরা নিজেদের পুষ্টির জন্য ব্যবহার করে এবং বাকিটা অজৈব লবন প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক বা স্বভোজী জীবকূল বা সবুজ উদ্ভিদেরা এই লবণগুলিকে নিজেদের জন্য উৎপাদকের কাজে বা সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।

## ২.৩.৩. বাস্তুতন্ত্রের কার্যাবলী (Functions of an Ecosystem) :

বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন কার্যাবলী গুলিকে মূল দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - উৎপাদন (Productive) এবং বন্টন (Distributive) । উৎপাদনেদর ভাগে বাস্তুতন্ত্র শক্তির উৎপাদন করে এবং সেই শক্তি এর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বন্টন করে, তাদের মধ্যে শক্তির যোগান সরবরাহ করে। স্বভোজী উৎপাদক উপাদান সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ শক্তির যোগান দেয়। পরভোজী বা খাদক উপাদান এই সকল স্বভোজী উপাদান গুলিকে খাদ্য রূপে গ্রহণ করে, এবং এর ফলে শক্তি উৎপাদক স্তর থেকে খাদক স্তরে সঞ্চারিত হয়।

## ভারতবর্ষে ভৌমজল সম্পদ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ একটি তথ্য :

ভারতবর্ষে ভৌমজল সম্পদ ক্রমশঃ অবলুপ্তি করণ ঘটে চলেছে ।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অপরিমিত ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে ক্রমশঃ এই জলের অপচয় এর অণ্যতম কারণ। বলাবাহুল্য ভৌম জলের এই রুপ অপব্যবহার আমাদের একদিন জল সংকটের বা জলাভাবের সম্মুখীন করবে। তাই অদূর ভবিষ্যতের সেই সংকটের সমাধান কল্পে আমাদের প্রত্যেকেই সচেতন হতে হবে। বিশ্বব্যাঙ্ক এবিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেমন - জলাধার গঠন করে জল সংরক্ষন করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার কারিদের জন্য শুল্ক নির্ধারণ করা, (যাতে জলের অপব্যবহার না হয়) এবং দরিদ্র ও প্রয়োজণীয় সকল মানুষদের জন্য তাদের ব্যবহার কল্পে প্রয়োজণীয় জলের যোগান সরবরাহ করা। এ বিষয়ে বানসাল কমিটি নিজেদের Report বা অনুসন্ধান লব্ধ তথ্যে এন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জলবায়ুগত পরিবর্তন এবষং বিশ্ব উষ্ণয়নের ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভৌম জল সম্পদ রূপে প্রভাবিত পদ্ধতিগুলির যাত্রাই করণ বা প্রয়োজনে মানোন্নয়ন অবশ্যস্বীকার্য্য।

এবিষয়ে গবেষনালব্ধ তথ্যে জানা যায়, প্রতিদিন প্রতিমুহুর্তে ভৌম জল অতি দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে প্রায় ২৯ শতাংশ প্রভাবিত হয়েছে আর প্রতিদিন প্রতিমুহুর্তে এর পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উত্তর প্রদেশ সরকার এ বিষয়ে তাদের রাজ্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে বিবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। জনগণকে এ বিষয়ে অর্থাৎ জলের ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিল্পে, গৃহ নির্মাণ কার্যে কিংবা অন্যান্য যেকোন উন্নয়ন কার্যে জলেদর উপযুক্ত যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

## ২.৩.৪. বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ (Energy Flow in the Ecosystem):

বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শক্তির স্থানান্তর করণকে বলা হয় ‘ শক্তি প্রবাহ’। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রে জীববৈচিত্র্য তাদের উন্নয়ন এবং কার্যাবলী জন্যে এই শক্তি প্রবাহের প্রয়োজন অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ সর্বদাই একমুখী গতি স্বরূপ।

নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও রাসায়নিক শক্তিরূপে সংরক্ষণ কল্পে সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিল, সূর্যালোক, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মাটি থেকে ভৌম জল শোষণ করে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সাহায্যে যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে তাকে প্রাথমিক উৎপাদন বা Primary

Production ও বলা হয়। এর ভিত্তিতে যে পরিমাণ সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাকে বলা হয় Gross Primary production (GPP) এর কিছুটা অবশ্য সবুজ উদ্ভিদ নিজেদের শ্বসন (Respiration) প্রক্রিয়ার জন্য রেখে বাকীটুকু পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। এই অংশের রাসায়নিক শক্তিকে বলা হয় Net Primary Production (NPP)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ যে জীবকূলের ভিন্নতায় তাদের ব্যাক্তির মাত্রাগত তারতম্য আছে। শুধু তাই নয়, এদের ব্যবহারগত তারতম্য আছে। খাদ্যশক্তির বাকী অংশটুকু সঞ্চিত থাকে এদের পরবর্তী বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রয়োজনে।

বাস্তুতন্ত্রে পরভোজীদের দ্বারা উৎপাদিত জৈব পদার্থ বা 'Organic Matter' কে বলা হয় দ্বিতিয় স্তরের উৎপাদন বা গৌণ উৎপাদন। এইভাবে খাদ্য খাদক স্পর্কের ভিত্তিতে ক্রমশ : খাদ্যশক্তি বা শক্তিপ্রবাহ একদেহ থেকে অন্যদেহে সঞ্চারিত হয়। যেমন - প্রাথমিক খাদকরা যখন উৎপাদকদের নিজেদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তখন উৎপাদকদের দেহের রাসায়নিক শক্তি প্রাথমিক খাদকদের দেহে সঞ্চিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে গিয়ে গৌণ খাদকরা আবার প্রাথমিক খাদকদের নিজেদের খাদ্য রূপে গ্রহণ করে, ফলে প্রাথমিক খাদকদের শক্তি গৌণ খাদকদের দেহে সঞ্চারিত হয়। একইভাবে গৌণ খাদকদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করায় প্রগৌন খাদকদের দেহে গৌণ খাদকদের শক্তি স্থানান্তরিত হয়। এইভাবে যেমন একটি খাদ্যশৃঙ্খলল তৈরী হয় নির্দিষ্ট কোন বাস্তুতন্ত্রে। তেমনি যথাযথভাবে পরিচালিত হয় শক্তিপ্রবাহ। কিংবা বলা যেতে পারে যে, এইভাবেই কোনও একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ কার্যকরী হয়। যেখানে বিয়োজকদের স্থান পুষ্টি স্তরের একেবারে অন্তিম স্তরে হলেও শক্তিপ্রবাহে তাদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। নীচে পরবর্তী ক্রীয়াগুলিতে বাস্তুতন্ত্রে এই শক্তিপ্রবাহের কার্যাবলী অঙ্কিত করা হল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

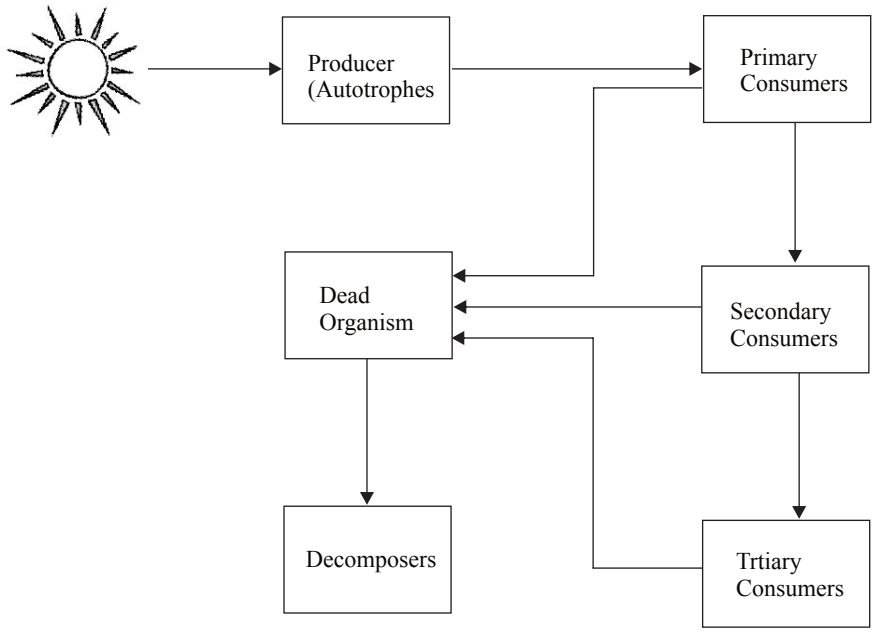


*Energy Flow Chart*

## ২.৩.৫. বাস্তুসংস্থানগত পরম্পরা বা অনুক্রম (Ecological Succession) :

বাস্তুসংস্থানগত পরম্পরা হল এমন এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার ভিত্তিতে বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক বাসভূমি অর্থাৎ যথাক্রমে Ecosystem এবং Habitat এগুলিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় । পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় কোন নির্দিষ্ট বাস্তুতন্নত্রে বসবাসকারী জীবকূলও । অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ অনুসারে যে প্রজাতি নিজ অস্তিত্বের পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতি পায় তারাই সেই বাস্তুতন্ত্রে অণ্য প্রজাতির জীবকূলের পরিবর্তে নিজেদের স্থান করে নেয়।

এর ফলে প্রতিকূল পরিবেশে অপরাপর প্রজাতির জীবকূল হয় বিলুপ্ত হয় অথবা তারা নিজেদের ঐ পরিস্থিতির অনুকূলে অভিযোজিত করে পুনরায় নিজেদের স্থান করে নেয়। বহু নতুন প্রজাতির জীবের ও সৃষ্টি হয়। এর ফলে জীব বৈচিত্র্যের ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে । কারণ নির্দিষ্ট কোন বস্তুতন্ত্রে অনুকূল পরিস্থিতি বা

শর্তানুসারে নির্দিষ্ট কতকগুলি উদ্ভিদ বা প্রানী নিজেদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের সুযোগ পায়। তবে সময়োপযোগী বাস্তুসংস্থানগত পরম্পরার ধারাবাহিকতা এই সুযোগ ও সুবিধার পরিস্থিতির ক্ষেত্রকে বৃহৎ করে। নতুন নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। পূর্ব পরিস্থিতির সংশোধন করে। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির অনুকূল অবস্থানের ভিত্তিতে সমগ্র জীবকূলের বৈচিত্র্য নিজ ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষমতা লাভ করে।

টিপ্পনী

বাস্তু সংস্থানগত ধারাবাহিকতা ঋতু বৈচিত্র্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে এটি একটি স্বল্পকালীন পরিস্থিতিও। যেমন - গ্রীষ্মকালের শুষ্কভূমি ছোট ছোট পোকামাকড় ও পিঁপড়ের বাসভূমি হয়। আবার সেই ভূমিই বর্ষাকালে জলে ডুবে গিয়ে সবুজ শৈবাল, ছোট ছোট গাছ, বিভিন্ন জলজ পোকা মাকড়, ছোট মাছ, মশা ইত্যাদির বাসস্থান হয়ে ওঠে আবার বর্ষা শেষে জল শুকিয়ে গিয়ে সেই ভূমিই পুনরায় পূর্ব জীবকূলের (ছোট ছোট পোকামাকড়, পিঁপড়ে প্রভৃতির) বাসভূমি হয়ে ওঠে। একইভাবে বন্যা খরা, ঝড়, বৃষ্টি এইরূপ যেকোন প্রাকৃতিক দূর্যোগেই একইভাবে বাস্তুসংস্থানগত পরম্পরা পরিচালিত হয়। তবে বৃহৎ আকারেদর যেকোন দূর্যোগজনিত পরিবর্তন পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করতে পারে। এবং তার ফলে জীব বৈচিত্র্য প্রভাবিত হয়। তারপর পুনরায় শুরু হয় অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী করার জন্য জীবকূলের অভিযোজন প্রক্রিয়া।

## অনুশীলনী :

(১) বাস্তুতন্ত্র বলতে কী বোঝ ?

(২) বাস্তুতন্ত্রের সজীব বা জীবগত (Biotic) উপাদান বলতে কী বোঝ ?

(৩) বাস্তুতন্ত্রের জড় বা অজীবজাত (Abiotic) উপাদান বলতে কী বোঝ ?

(৪) 'শক্তি প্রবাহ' বলতে কী বোঝ ?

(৫) GPP বলতে কী বোঝ ?

(৬) NPP বলতে কী বোঝ ?

## ২.৪. খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যশক্তি ও প্রবাহ এবং বাস্তু-সংস্থানের পিরামিড় :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

### খাদ্যশৃঙ্খল :

কোন নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্যশক্তির ধারাবাহিক প্রবাহকে বজায় রাখে। একটি খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্গত জীবগোষ্ঠী উৎপাদক থেকে শুরু করে খাদক

টিপ্পনী

স্তরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ থেকে শুরু করে সর্বভুক খাদক স্তরের অন্তর্গত হতে পারে। অর্থাৎ এই শৃঙ্খল ব্যবস্থা গঠিত হয় খাদ্য-খাদক সম্পর্কেদর উপর ভিত্তি করে তাই খাদ্য খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদক স্তর থেকে ক্রমানুসারে অপরাপর বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য শক্তির ধারাবাহিক প্রবাহকে বলা হয় খাদ্যশৃঙ্খল।

বিজ্ঞানী ওডাম ১৯৬৬ সালে খাদ্য-শৃঙ্খলেদর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল : খাদ্য-খাদক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সে নির্দিষ্ট প্রণালীতে খাদ্যশক্তি উৎপাদক স্তর থেকে ক্রমপর্যায়ে আরও উন্নত জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয়, শক্তিপ্রবাহের সেই ক্রমিক পর্যায়কে খাদ্যশৃঙ্খল বলা হয় পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বাস্তুরীতিতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়। যেমন -

নদী, পুকুর, হ্রদ বা জলাশয় এলাকার মিষ্টি জলের বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খল -

উদাহরণ : উদ্ভিদ - পতঙ্গ - মাছ - মানুষ (পরিবেশ, অসীম চট্টোপাধ্যায় )

প্রাকৃতিক পরিবেশে মোট দুইপ্রকার খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়। যেমন -

(১) গ্রেজার বা গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল (Grazer Food Chain)

(২) ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্কল (Detrtus Food Chain)

**গ্রেজার বা গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল (Grazing Food Chain)**

গ্রেজার বা গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল হলন একটি ক্রমানুসারী খাদ্যশৃঙ্খল ব্যবস্থা। যে খাদ্য শৃঙ্খলে খাদ্যশক্তি উৎপাদক স্তর থেকে শুরু করে ক্রমানুসারে তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রানীদের মধ্যে সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় গ্রেজার বা গ্রেজিং খাদ্য শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খল ব্যবস্থায় সবুজ উদ্ভিদ (Autotrophs) বা উৎপাদক কে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে প্রাথমিক খাদক বা তৃণভোজী প্রাণী। পর্যায়ক্রমে তৃণভোজী প্রাণিদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে মাংসাশী প্রাণী (Carnivores) নীচের চিত্রে গ্রেজার বা গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খলের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হল।

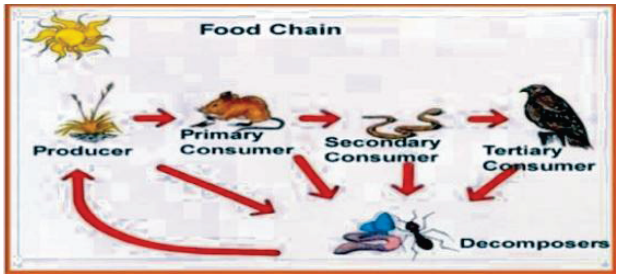


*A Grazing Food Chain*

**ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খলল (Detritus Food Chain) :**

বাস্তুতন্ত্রের যে খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্যশক্তি বিয়োজক স্তর থেকে শুরু করে ক্রমানুসারে কাদক স্তরে সঞ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় ডেটিটাস খাদ্যশৃঙ্খল। অর্থাৎ ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল অর্থাৎ ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল শুরু হয় বিয়োজক স্তর থেকে। যেমন - একটি জলজ বাস্তুতন্ত্রে ডেট্রিটাস খাদ্য শৃঙ্খলের দৃষ্টান্ত হল -

বিয়োজকদের মাধ্যমে উৎপাদিত পচা পাতা - ক্ষুদ্র জলজ প্রানী বা লাভা - ছোটমাছ - বড় মাছ (দৃঃ পরিবেশ, অনীল চট্টোপাধ্যায়)

দুই প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল ব্যবস্থার যে ক্রমে খাদ্যশক্তি তার পরবর্তী পর্যায়গুলিতে সঞ্চারিত হয় তা হল -

সবুজ উদ্ভিদ - তৃণভোজী প্রাণী - মাংসাশী স্তণ্যপায়ী খাদক প্রানী - সর্বভূক খাদক।

অর্থাৎ,

Plant - Herbivore - Carnivore (1) - Top Carnivore (2)

বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শৃঙ্খল দেখা যায়। যেমন -

তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খল (Grassland Ecosystem) :

(১) ঘাস - ঘাসফড়িং - ব্যাঙ - সাপ।

(২) ঘাস - ঘাসফড়িং - পাখি - মানুষ - বাঘ।

(৩) ঘাস - ছাগল - মানুষ - সিংহ।

অরন্য বাস্তুতন্ত্র (Forest Ecosystems) :

(১) ঘাস - হরিণ - সিংহ

(২) ঘাস - ছাগল - বাঘ

পুকুর বা জলাশয় বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খল (Pond Ecosystem) :

(১) শৈবাল - জলজকীট - ছোট মাছ - বড় মাছ - কুমীর।

এইভাবে খাদ্যশক্তি উৎপাদক স্তর থেকে শুরু করে ক্রমানুসারে পরবর্তী স্তরগুলিতে সঞ্চারিত হয়ে পুষ্টি স্তরকে নির্ধারিত করে এবং খাদ্যশক্তির ধারাবাহিক প্রবাহকে বজায় রাখে।

**খাদ্যশৃঙ্খলের প্রকার (Types of Food Chain) :**

খাদ্যশৃঙ্খলের উল্লিখিত প্রকারগুলি সহ মোট চারপ্রকারের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যায়। যেমন -

(১) শিকারী খাদ্যশৃঙ্খল (Predator Food Chain).

(২) পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Parasitic Food Chain).

(৩) মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Saprophytic Food Chain).

(৪) ডেট্রিটাস খাদ্য শৃঙ্খল (Detritus Food Chain).

(১) শিকারী খাদ্যশৃঙ্খল (Predator Food Chain) :

বাস্তুতন্ত্রে যে খাদ্যশৃঙ্খল ব্যবস্থায় উৎপাদক স্তর থেকে শুরু করে খাদ্যশক্তি ক্রমানুসারে সর্বভুক খাদক স্তরে সঞ্চারিত হয় তাকে বলা হয় শিকারী খাদ্য শৃঙ্খল। যেমন -

(১) ঘাস - ঘাসফড়িং - ব্যাঙ - সাপ।

(২) ঘাস - ঘাসফড়িং - ছোটমাছ - বড় মাছ - কুমীর।

**(২) পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Parasitic Food Chain) :**

যে খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্যশক্তি খাদ্য খাদক স্পর্কের ভিত্তিতে বৃহৎ প্রানী থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে পরজীবী ক্ষুদ্র প্রানীতে শেষ হয়, তাকে পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল বলে। যেমন -

গরু - কীট - বিয়োজক

**(৩) মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল (Saprophytic Food Chain) :**

যে খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্যশক্তি মৃতজীবী উপাদান থেকে শুরু করে বিয়োজক স্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাকে বলা হয় মৃতজীবী খাদ্যশৃঙ্খল। যেমন -

সবুজ উদ্ভিদ বা প্রানীর মৃতদেহ - ছত্রাক - ব্যাকটিরিয়া।

**(৪) ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল (Detritur Food Chain) :**

যে খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্যশক্তি বিয়োজক স্তর থেকে শুরু করে ক্রমশ খাদক স্তরে সঞ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় ভেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল।

## খাদ্যশক্তি প্রবাহ বা খাদ্যজালিকা :

পরিবেশ ও প্রকৃতিতে অতি সরল খাদ্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা। খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। কারণ এইরূপ খাদ্যশক্তির ধারাবাহিক প্রবাহের মাধ্যমে যে খাদ্য খাদক সম্পর্ক তৈরী হয় অর্থাৎ খাদ্যশৃঙ্খল গুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ক্রমাণুসারে জটীল একটি খাদ্য তালিকা গঠন করে। এইভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য-খাদক

সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা খাদ্য-শৃঙ্খল গুলি নানাভাবে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হলে সেই নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে খাদ্যের আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে যে জটিল গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় খাদ্য জাল বা খাদ্য - জালিকা বা Food Web.

এই খাদ্যজালিকাগুলি পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এগুলি কখনই চরিত্রগতভাবে একাকী কার্যকরী হয় না। সেহেতু একাধিক খাদ্যশৃঙ্খলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এই খাদ্যজালিকা (Food Web) গুলি তাই এগুলি চরিত্রগত ভাবে বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খলে জটীল সমন্বয় বলেও পরিগণিত হয়।

খাদ্য জালিকাগুলি একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বজায়রাখে। উদাহরণ স্বরূপ উৎপাদক স্তরের সবুজ উদ্ভিদ গুলিকে ছোট ছোট প্রাণি যেমন খরগোশ, ছোট ছোট পতঙ্গ ইত্যাদি নিজেদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে আবার ঐ সকল ছোট ছোট কীটদের খায় ব্যাঙ, ব্যঙকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সাপ, আবার এই সাপগুলিকে নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে চিল বা শকুন। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তালিকা দেখা যায়। যেমন -

(১) ঘাস - ঘাসফড়িং - ব্যাঙ - সাপ - শকুন

(২) ঘাস - ইঁদুর - সাপ - চিল বা শকুন

(৩) ঘাস - ইঁদুর - চিল বা শকুন।

## বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খল এবং খাদ্যজালিকার গুরুত্ব (Significance of Food Chain and Food Webs) :

খাদ্যশৃঙ্খল সম্বন্ধে পাঠ করার মধ্যে দিয়ে জানা যায় যে, কিভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী বা অবস্থানকারী বিভিন্ন জীবকূলের মধ্যে খাদ্যশক্তি ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়। যার মধ্যে দিয়ে সমগ্র জীবকূলের পুষ্টি স্তর সুরক্ষিত থাকে। এই পুষ্টি স্তর জীবকূলের দেহে তাদের প্রয়োজন মতো সঞ্চারিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় জৈব বর্ধিত করণের (Biological Magnification)।

একইভাবে খাদ্যজালিকার সম্বন্ধে পাঠ অনুশীলন করার মধ্যে দিয়ে জানা যায় যে, খাদ্যশৃঙ্কল গুলির পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি জটীল খাদ্যজালিকা গঠন করে কোন একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী সকল জীবকূলের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্পর্কে স্থাপনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে একটি খাদ্য পিরামিড় গড়ে উঠতে পারে।

খাদ্য পিরামিড বা বাস্তুসংস্থানের পিরামিড় (Ecological Pyramids) :

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পুষ্টির গঠন বা খাদ্যের যোগান ব্যবস্থাকে পর পর ক্রম অনুসারে সাজালে সে পিরামিড় বা শিখর তৈরি হয়, তাকে বলা হয় খাদ্য পিরামিড় (Food Pyramid) বা বাস্তুসংস্থানের পিরামিড় (Ecological Pyramid)।

খাদ্য পিরামিড়ের সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে উৎপাদক (যেমন, সবুজ উদ্ভিদ)। এরা সংখ্যায় ও পরিমানে সবচেয়ে বেশি।

খাদ্য পিরামিড়ের মধ্যে ক্রমশ: উপরের স্তরে খাদ্যের যোগান যেমন কমতে থাকে খাদকের সংখ্যাও হ্রাস পায়। এইভাবে বাস্তু রীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

(পরিবেশ, অসীম চট্টোপাধ্যায়)

খাদ্য পিরামিড় বা বাস্তুসংস্থানের পিরমিড় প্রধানত তিনপ্রকারের হয়। যেমন -

(১) সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Number)

(২) শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy)

(৩) জীবভর বা বায়োমাসের পিরামিড (Pyramid of Biomass)

### (১) সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Number) :

বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের খাদকদের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে যে পিরামিড গড়ে ওঠে তাকে সংখ্যার পিরামিড় বলা হয়। এখানে মূলতঃ বিভিন্ন প্রজাতির জীবের সংখ্যার পিরামিড গঠিত হয়। এই সংখ্যার পিরামিড বাস্তুতন্ত্র অনুসারে পরিবর্তিত হয়। সংখ্যার পিরামিড মূলত দুই প্রকারের হয়। যেমন - উর্দ্ধমুখী এবং নিম্নমুখী।

জলজ এবং তৃনভূমি বস্তুতন্ত্রে সংখ্যার পিরামিড় সর্বাদাই উর্দ্ধমুখী (V Pright) হয় এবং পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খলে পিরামিড সর্বদাই নিম্নমুখী বা Inverted হয়। চিত্রগুলি নিম্নরূপ -

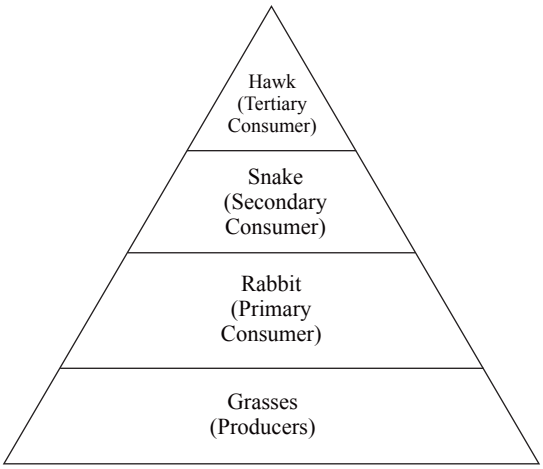

*Upright Pyramid*

**২. শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy) :**

কোন বাস্তুরীতি বা বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যস্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের মধ্যে অর্জিত শক্তির পরিমাণ ক্রমপর্যায়ে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয় তাকে”বাস্তুতন্ত্রের শক্তির পিরামিড’ বলা হয় । (পরিবেশ, অসীম চট্টোপাধ্যায়) এখানে মূলতঃ ১০ শতাংশ করে খাদ্যশক্তি এক দেহ থেকে অণ্য দেহে সঞ্চারিত হয় এবং বাকী অংশতুকু বিনষ্ট হয়। চিত্রটি নিম্নরূপ -




*Inverted Pyramid*

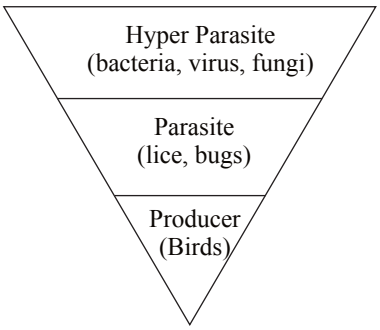

শক্তি পিরামীড প্রসঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যগুলি উল্লেখ্য, তা হল -

প্রথমত : শক্তি পিরামিড সর্বদাই উর্দ্ধমুখী।

দ্বিতিয়ত : শক্তি পিরামিডের প্রতিটি স্তরেই শক্তি মাত্রার ক্ষয় হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

### (৩) জীবভর বা বায়োমাসের পিরামিড (Pyramid of Biomass) :

কোন বাস্তুরীতি বা বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যস্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের শুষ্ক ওজন বা জীবভরের পরিমাণ ক্রমপর্যায়ে সাজালে যে পিরামিড বা শিখর গঠিত হয়, তাকে বাস্তুতন্ত্রের জীবভর এর পিরামিড বলে। (পরিবেশ, অসীম চট্টোপাধ্যায়), আলোচ্য পিরামিড অনুসারে সর্বনিম্ন খাদ্যস্তরে জীবের মোট ভরের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয় এবং পরবর্তী উচ্চস্তরগুলিতে জীবভরের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। চিত্রটি নিম্নরূপ -

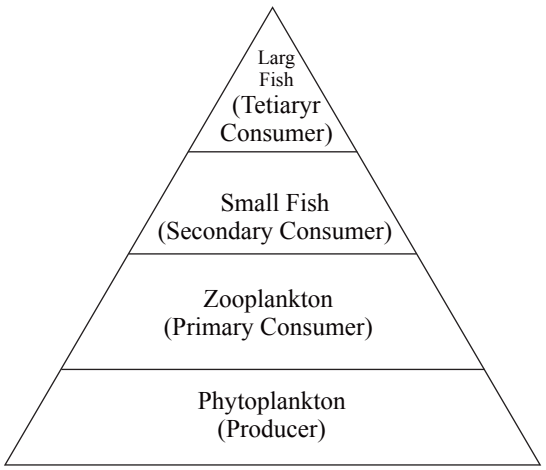


*Pyramid of Biomass*

## ২.৪.১. অরণ্য বাস্তুতন্ত্র : এর গঠন ও কার্যাবলী (Forest Ecosystems : Struture and Function) :

অরন্য বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এখানে যেমন ছোট গুল্ম দেখা যায় তেমনি সুবিশাল বৃক্ষ্ম ও দেখা যায়। ভারতবর্ষের সমগ্র সমতল ভূমির প্রায় ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ এই অরণ্য বা বনভূমি অধ্যুষিত। অরণ্যভূমি বা বণভূমি মোট দুই প্রকার উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন -

(১) জড় বা অজীবজাত উপাদান (Abioctic Compound)

(২) সজীব বা জীবজাত উপাদান (Biotic Compount)

### (১) জড় বা অজীব জাত উপাদান :

একটি অরণ্য ভূমির প্রকৃতি নির্ভর করে এর জড় বা অজীবজাত উপাদনগুলির উপর এর জলবায়ু, মাটির প্রকৃতি ইত্যাদিও এসেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অজীবজনাত বা জড় উপাদানগুলি জৈব ও অজৈব উভয় প্রকারের হয় এগুলি কে বিশেষ মাত্রায় বা পরিমানে অরণ্যের জলবায়ু এবং মৃত্তিকায় থাকে তার ভিত্তিতে এখানকার বৃক্ষাদি হয় । অজৈব পদার্থ গুলির মধ্যে জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং অজৈব লবণ সহ ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট,সালফেট ও নাইট্রেট ইত্যাদি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও জৈব পদার্থের মধ্যে রয়েছে মৃত্তিকাতে অবস্থিত মৃত বিয়োজিত পদার্থের দেহের কার্বোহাইড্রেটস, প্রোটিন ইত্যাদি।

**টিপ্পনী**

### (২) সজীব বা জীবজাত উপাদান :

সজীব বা জীবজাত উপাদান বলতে উৎপাদক, খাদক এবং বিয়োজকদের চিহ্নিতকরণ করা হয়।

**(ক) উৎপাদক (Producers) :**

উৎপাদক বলতে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষকে বোঝানো হয় । যেগুলির প্রকৃতিগত তারতম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে - তুন্দ্রা, তৈগা অরণ্য, নাতিশীশোতষ্ণ পর্ণযোগী অরন্যের বায়োম, নাতীশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োম, ভূমধ্যসাগীয় বায়োম, উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ বায়োম, সাভামা বায়োম এবং উষ্ণ মরুভূমি। এই সকল ওঅরণ্য ভূমি বা বায়োমগুলি জলবায়ু ও উদ্ভিদের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম দেখা যায় পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ সহ প্রমুখ রাজ্যে । এখানে ছোট প্রজাতির ও গুল্ম থেকে শুরু করে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রকারের বৃক্ষ দেখা যায়। তেমনি ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ঝোপঝাড়, চিরহরিৎ উদ্ভিদ, উষ্ণমরু বায়োমে জোরোফাইট জাতীয় ক্যাকটাস, বাবলা, একসিয়া প্রভৃতি বৃক্ষ । তৈগা বায়োমে উইলো, অ্যাসপেন বৃক্ষ সহ লাইকেন মস জাতীয় শৈবাল। তৈগা বা সরল বর্গীয় বণভূমিতে পাইন, ফার, উইলো ইত্যাদি বৃক্ষ এবং তুন্দ্রা বায়োমে উইলো, জুনিপার, বার্চ, অলডার প্রভৃতি বৃক্ষসহ শৈবাল, মস, ছোট ছোট ঘাস লাইকেন বা 'তৃণতুন্দ্রা' দেখা যায়।

(পরিবেশ, অসীম চট্টোপাধ্যায়)

**(খ) খাদক (Consumer) :**

খাদক শ্রণী তিন প্রকারে হয়। যেমন -

(১) প্রাথমিক খাদক

টিপ্পনী

(২) গৌণ খাদক

(৩) প্রগৌন খাদক

**(১) প্রাথমিক খাদক (Primary Consumers) :**

অরণ্যভূমিতে বসবাসকারী যে সকল প্রানী উৎপাদক শ্রেণীর খাদ্য বা সবুজ উদ্ভিদকে নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের বলা হয় প্রাথমিক খাদক। যেমন - ছোট ছোট পিঁপড়ে, প্রজাপতি, হরিণ, হাতি ইত্যাদি।

**(২) গৌণ খাদক (Secondary Consumers) :**

অরণ্যভূমিতে যে সকল মাংসাশী প্রানী তৃনভোজী বা প্রাথমিক খাদকদের নিজেদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে জীবনধারণ করে তাদের বলা হয় গৌণ খাদক। যেমন - সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি ইত্যাদি।

**(৩) প্রগৌণ খাদক (Tertiary Cosumers) :**

অরণ্যভূমিতে বসবাসকারী যে সকল মাংসাশী ও স্তন্যপায়ি প্রানী উৎপাদক, প্রাথমিক ও গৌণ খাদক শ্রেণীর অন্তর্গত সকল প্রানীকেই নিজেদের রূপে গ্রহণ করে তাদেরকে সর্বভুক খাদক বলা হয়। যেমন - সিংহ, বাঘ, হায়েনা ইত্যাদি।

## অরণ্যভূমি কার্যাবলী (Function of Forest Ecosystem) :

পৃথিবীতে অরণ্যের ভূমির কার্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অরন্য উল্লেখ। যা জীবনের সৃষ্টি থেকে শুরু করে এর বৃদ্ধি ও বিকাশের কাজে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ্য। পৃথিবীর সৃষ্টির আদিমকালে যখন শুধুই ধূধূ বিস্তৃত প্রান্তর ভূমি ছিল সেখানে ধীরে ধীরে তৃণভূমি, ছোট গাছ থেকে শুরু করে মৃত্তিকা যা কিনা পাহাড় চূর্ণ ও জৈব পদার্থের উদ্ভিদের মৃত ও বিয়োজিত দেহাংশের সংযোগ গঠিত, চাষাবাদ জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি সবকিছুর প্রতিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাষাবাদ দিয়ে প্রানের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর অন্তর্নিহিত খনন বৃক্ষরোপন দ্বারা জলধারণ ক্ষমতায় নিপুন, যা মৃত্তিকা ক্ষয় নিবারণ করে। উপকূলের ভাঙন রোধ করে। এর অন্তর্গত বিভিন্ন গাছ এর গুড়ি থেকে আলাদা কাঠ পাই। যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন - আসবাব নির্মাণ শিল্পে, বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে যানবাহন নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থনৈতিক মূল্য আছে। আরও উল্লেখ্য যে এই অরণ্যভূমির সংরক্ষিত ক্ষত্রগুলি বর্তমানে বৃহৎ পর্যটন ক্ষেত্ররূপে নিজের তাৎপর্য দাবী রাখে। যার ফলে আর্থ সমাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়। তাই বলা যায় যে, এই অরণ্য ভূমির যেমন একটি সার্বজনীন মূল্য আছে তেমনি আছে এর স্থানীয় মূল্যও। তাই আমাদের

প্রত্যেকেই এই অরণ্যভূমির প্রতি যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

## ২.৪.২. জীববৈচিত্র্য : সংজ্ঞা, জাতি, প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য :

টিপ্পনী

### জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা (Definatuion of Biodiversity) :

বিভিন্ন প্রকারের জীবের সংখ্যাগত তারুণ্যের ভিত্তিতে কোনও একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী সমগ্র জীবকূলের সমন্বয় দেখা যায় তার সামগ্রিক রূপকে জীব বৈচিত্র্য বলা হয়। এই জীববৈচিত্র্য তিন প্রকারের একটি বাস্তু সবস্থানে কার্যকরী হয়। যেমন - জাতিগত, প্রজাতিগত ভাবে এবং বাস্তুতন্ত্রগত ভাবে।

### জাতিগত জীববৈচিত্র্য (Genetic Biodiversity) :

জীববৈচিত্র্যের এই প্রকারটি জীব বৈচিত্র্যের মূল কারণ একটি নির্দিষ্ট জাতির জীব থেকে একাধিক প্রকার জীবের সৃষ্টি হতে পারে তাদের সঙ্গে অপরাপর প্রাণীর সমন্বয়ে কিংবা পরিবেশের তারতম্যের ভেদে। যেমন - ধরা যাক নির্দিষ্ট কোন এক যেমন চাল, তা চাষাবাদ শুরুর সময় যে আকারের বা বর্ণের ছিল তা সময়ের পরিবর্তনে বিবিধ প্রকার হয়েছে। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রানী সে জাতির অন্তর্গত তার সে পরিবর্তন তাকে ও জাতিগত জীববৈচিত্র্য বলা যায়।

### প্রজাতিগত জীববৈচিত্র্য (Specian Biodiversity) :

বিপুল সংখ্যাগত তারতম্যের ভেদে বা নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রানীকূলের মধ্যে যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় তাকে প্রজাতিগত জীববৈচিত্র্য বলা যায়। এটি কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল ভিত্তিক হতে পারে বলে একে জীব সম্পদ বা Biologicalm Wealth বলা হয়।

### বাস্তুতন্ত্রগত জীব বৈচিত্র্য (Ecosystem Biodiversity) :

এই বাস্তুতন্ত্রগত জীববৈচিত্র্য মূলত সংঘটিত হয় বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের ভেদে। এই বাস্তুতন্ত্রগুলি আবার গঠিত হয় খাদ্যশৃঙ্খল। খাদ্যজালিকা শক্তি প্রবাহ ইত্যাদির ভিত্তিতে। কোনও একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী সমগ্র জীবকূলের মধ্যে শক্তি প্রবাহ বা খাদ্য শক্তি সে রূপ খাদ্য-খাদক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার উপর নির্ভর কনরে খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জালিকার তারতম্যের ভেদে দেখা যায় সেই নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বহু প্রকার জীবের অবস্থান এবং তার তিত্তিতেই গড়ে ওঠে এই বাস্তুতন্ত্রগত জীব বৈচিত্র্য। এই বাস্তুতন্ত্রগত জীববৈচিত্র্য অঞ্চল ভিত্তিক হতে পারে।

সেখানে জলবায়ু, উদ্ভিদ ইত্যাদির ভূমিকাও সবিশেষ উল্লেখ্য। যেমন - তৈগা অরণ্য ভূমি, পর্ণমোচী অরণ্যভূমি, সাভালা মরুভূমি, যাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল আছে।

## অনুশীলনী :

টিপ্পনী

(১) খাদ্যশৃঙ্খল বলতে কী বোঝ ?

(২) সজীব বা জীবজাত উপাদান কাকে বলে ?

(৩) মুখ্য বা প্রধান বাস্তুতন্ত্রগুলির প্রকার উল্লেখ কর।

(৪) জীব বৈচিত্র্য বলতে কী বোঝ ?

(৫) জীব বৈচিত্র্যের ত্রিবিধ প্রকারগুলি সম্বন্ধে কী জান ?

## ২.৫. জীববৈচিত্র্যের মূল্য (Value of Biodiversity) :

জীববৈচিত্র্য যেমন স্বরূপগত ভাবে মূল্যবান তেমনি আর্থ-সামাজিক ভাবেও জীব বৈচিত্র্যের মূল্য অসীম। এর উপযোগীতা, বাস্তুরীতিগত কার্যকারিতা, সামাজিক ও সৌন্দর্য্যবোধ ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও কখনও এমন হয় যে আমরা কোনও নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবের গুরুত্ব বুঝি পৃথিবী থেকে এর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি করণের পর। শুধু তাই নয় অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবও যারা আপাতদৃষ্টিতে অনুপযোগী বলে মনে হয়, তারাও বাস্তুতন্ত্রে নিজেদের উপযোগীতা বলে। বিভিন্ন মারণ রোগের ওষুধ নির্মাণে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়।

### জীববৈচিত্র্যের ব্যবহারপযোগীতা (Consymptive use value) :

জীববৈচিত্র্য সেখানে সরাসরি খাদ্য, জ্বালানী ওষুধ নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। যেমন -

**খাদ্য (Food) :**

বর্তমানে প্রায় বিপুল সংখ্যা মানুষ বিভিন্ন গাছ, শাক পাতা, সবুজ উদ্ভিদকে নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এইজ প্রকার প্রায় ৮০,০০০ (আশি হাজার ) সংখ্যার প্রজাতি বৃক্ষের সাজান অরণ্যভূমিতে পাওয়া যায়। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের ফলে প্রতিদিন প্রায় ৯০ শতাংশ খাদ্য পাওয়া যায় অরণ্যভূমি থেকে শুধু, তাই নয় এই অরণ্যভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণীও খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয় অন্যান্য জীবকূলের জন্য।

**ওষুধ (Medicine) :**

বিভিন্ন প্রকার গাছ পালা, শিকড়, বিভিন্ন লতা, গুল্ম, প্রানীদের দেহ, হাড় ইত্যাদি বর্তমানে ওষুধ নির্মাণ শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৭৫ শতাংশ জনগণ এই সকল উদ্ভিদের উপর তাদের রোগ নিরাময়ের ওষুধের জন্য নির্ভরশীল। যেমন, - পেনিসিলিয়াম থেকে পাওয়া গেছে পেনিসিলি-য়াম। সিঙ্কোনা গাছ থেকে পাওয়া গেছে কুইনাইন যা মারনাত্মক ম্যালেরিয়া রোগের নিরাময়ে কার্যকরী। বর্তমানে অতিগুরুত্বপূর্ণ 'Vinblastin' এবং 'Vincristine' নামক দুটি ওষুধ দূরারোগ্য ক্যানসার রোগের নিরাময়ের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে, তা পাওয়া যায় 'Peri winkle (Cathrantnus) plant' থেকে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীও এই রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে।

**জ্বালানী (Fuel) :**

কয়লা, পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য, জ্বালানী তেল ও কাঠ ইত্যাদি উৎপাদনেও অরণ্যের ভূমিকা অণ্যতম। যেমন জীবাশ্ম জ্বালানী পাওয়া যায় কয়লা থেকে এবং জীববৈচিত্র্যের জীবাশ্মের রাসায়নিক বিকিরণ থেকেই পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়াও জ্বালানী কাঠ শহুরে সভ্যতায় বাজার থেকে উপলব্ধ হয় এবং গ্রাম্য সভ্যতায় সরাসরি অরণ্যভূমি থেকে।

**ব্যবহারপোযোগী মূল্য (Productive use Value) :**

অরণ্য এবং তার থেকে প্রাপ্ত সকল দ্রব্য যেমন খাদ্য, খাদ্য দ্রব্য, জ্বালানী, ওষুধ ইত্যাদি সবকিছুরই একটি বাজার ভিত্তিক বাণিজ্যিকী করণ হয়, যার ফলে আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর পূর্ণমূল্যায়ণ সম্ভব হয় দেশে - বিদেশে যার মূল্য তাৎপর্য্য পূর্ণ। যেমন -Silk বা রেশম নির্মাণ শিল্পে গুটিপোকার ব্যবহার ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। তেমনি সোনা-রূপা ধাতু, কাগজ এবং কাষ্ঠ নির্মাণ শিল্পে, চর্ম শিল্পে, মুক্তো বাণিজ্যিকী করণেও এই জীববৈচিত্র্যর অন্যোন্য ভূমিকা স্বীকার্য্য।

**সামাজিক মূল্য (Social Value) :**

একটি অরণ্য ভূমির অন্তর্গত বিভিন্ন বৃক্ষের পূজোও প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে, যার মূল্যবোধ ধর্মের ভিত্তিতে অনস্বীকার্য্য। যেমন হিন্দুগণ - বেলগাছ, তুলসী, বট প্রভৃতি গাছের পূজার্চনা করেন এবং শুধু তাই নয় এদের পত্রগুলি পূজাচর্ণার কাজে ব্যবহার করেন। তেমনি করে বিভিন্ন পশুপাখী যেমন হাতি, ঘোড়া,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সিংহ, ময়ুর ইত্যাদি ও আমাদেদর ধর্মবোধের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

**নৈতিক মূল্য (Ethical Value) :**

মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' বা Live and let live' এই নৈতিকতাকে আদর্শ করে আমাদের প্রত্যেকর উচিৎ বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত প্রতিটি প্রজাতির জীবের অস্তিত্ব রক্ষার প্রতি সচেতন হওয়।

**সৌন্দর্য্য মূল্য (Aesthetic Value) :**

বলা বাহুল্য সে একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হলে তা অবশ্যই প্রকৃতিক সৌন্দর্যায়নের বৃদ্ধি ঘটবে। বিভিন্ন স্থানে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠবে যার ফলে উন্নয়ন হবে আর্থ সমাাজিক পরিস্থিতির।

## ২.৫.১. আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য (Hotspots of Biodiversity) :

কোন একটি নির্দিষ্ট মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেসকল প্রাণি (Indemic) তাদের জন্য যে বাস্তুতন্ত্র এবং বৈচিত্র্য তাকে বলালায় আঞ্চলিক জীব বৈচিত্র্য বা Hotspots of Biodiversity'. ভারতবর্ষে এইরকম বহু সংখ্যক endemic প্রানীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে প্রায় ৬২ শতাংশ উভচর এবং ৫০ শতাংশ টিকটিকি উল্লেখযোগ্য । ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম Myers রা এইরূপ Hotspots' এর কথা উল্লেখ করেছিলেন । সমগ্র বিশ্বের ২৫ টি এইরূপ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য জণিত (বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ স্থান) স্থানেদর উল্লেখ পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে দুটি ভারতে অবস্থিত। যেমন - প্রথমটি হল পূর্ব হিমালয় এবং দ্বিতিয়টি হল পশ্চিম ঘাট।

**(ক) পূর্ব হিমালয় (Eastern Himalayan) :**

এখানে বিভিন্ন প্রজাতির লতা গুল্ম এবং তদ্‌জনিত জীব বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় বিশেষ ভাবে।

**(খ) পশ্চিম ঘাট (Western Ghats) :**

কর্নাটক, কেরালা, তামিলনাড়ুতে বিশেষভাবে পো্রসিদ্ধ প্রানীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ উদ্ভিদ অস্তিত্বশীল। যেগুলি প্রধানত অগস্ত্য পাহাড় এবং শান্ত উপত্যাকার বিরাজমান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ যে, এবিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে যে, সমগ্র বণভূমির মধ্যে মাত্র ৬.৮ শতাংশ বণভূমি বর্তমানে অস্তিত্বশিল আচর বাকি

অংশগুলি বিলুপ্ত হয়েছে। যে অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জীব বৈচিত্র্য জনিত সংকটের সম্মুখীন করবে । কারণ এটি খুব স্বাভাবিক যে এই রূপ জবণভূমি বিলুপ্তিকরণ বা অরণ্য ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই বহু প্রজাতির জীবের অস্তিত্ব হারিয়েছি যা অবশ্যই জীব বৈচিত্র্যকে ক্ষুন্ন করেছে।

## অনুশীললনী :

টিপ্পনী

(১) জীব বৈচিত্র্যের নৈতিক মূল্যবোধ কী ?

(২) ভারতবর্ষে দুই প্রকার আঞ্চলিক ভাবে প্রসিদ্ধ জীববৈচিত্র্যের আলোচনা কর।

## ২.৬. জীববৈচিত্র্যের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি এবং জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ :

প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ, নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ, মনুষ্যসৃষ্ট নানা প্রকার কারণ প্রতিনিয়ত জীববৈচিত্র্যের অবলুপ্তিকরণ ঘটিয়ে চলেছে। যা অবশ্যই আদূর ভবিষ্যতে এক আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তৈরী করতে পারে। এ বিষয়ে তথ্য এই রুপ যে একবিংশ শতকে আমাদের বর্তমান জীব বৈচিত্রের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ হারিয়ে ফেলতে পারি এবং বিভিন্ন কারণ গুলি হল -

## ২.৬.১. বাস্তুতন্ত্রের অবলুপ্তি করণ (Loss of Habitat) :

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে প্রতনিয়ত বাস্তুতন্ত্রের প্রকারগুলির ধ্বংস হচ্ছে, যা জীব বৈচিত্র্যের অবলুপ্তিকরণের অণ্যতম কারণ। যেমন কৃষিক্ষেত্রের বিস্তৃতিকরণ, শিল্পায়ন, বসতি স্থাপন, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্য প্রতিনিয়ত বণভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। যা পরিণতিতে জীব বৈচিত্র্যকে অবলুপ্ত করছে।

**সংরক্ষিত প্রানী শিকার :**

বিভিন্ন প্রকার অবলুপ্ত প্রায় প্রজাতির প্রাণী যাদের শিকার করা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেই সকল প্রানী গুলিকে অবলীলায় হত্যা করাও এই জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ। তাই এদের সংরক্ষণ কল্পে জনসগণকেই সচেতন হতে হবে। যেমন - আমরা অবশ্যই চামড়ার ব্যাগম বেল্ট সেগুলি কিনা কুমীরের চামড়ার দ্বারা নির্মিত হয় সেই গুলির ক্রয় করবো না। যাতে করে তাদের প্রাণ রক্ষা পায়। তাদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হয়।

টিপ্পনী

**মানুষ এবং বণ্যপ্রানী দ্বন্দ্ব :**

মানুষ এবং বণ্যপ্রানী দ্বন্দ্ব বিষয়টি দেখা যায় মূলতঃ কোন বিরল প্রজাতির বন্যপ্রানীর সংরক্ষণ কেন্দ্র করে তার স্থানীয় এলাকা কিংবা অঞ্চলে। এমন কোন বিরল প্রজাতির বা অবলুপ্ত প্রায় হয়ে আসছে এমমন সকল প্রানীদের সংরক্ষিত করার জন্য যে স্থান নির্ধারিত হয়, তাঁর স্থানীয় অঞ্চলের জনবসতিতে বসবাস করার জন্য ক্ষেত্র বিশেষ বিপদজনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে মানুষ এবং বন্যপ্রানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তবে এই সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে, যদি মানুষ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে তাদের বসবাসের স্থান অন্যত্র নির্ধারণ করতে পারে। তাহলে তাদের এবং পাশাপাশি অন্য বণ্যপ্রাণীদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হতে পারে।

## ভারতবর্ষে বিরল, আঞ্চলিক সীমাবদ্ধ এবং বিদেশী প্রানী :

**ভারতবর্ষে বিরল প্রজাতির প্রানী (Endangered Specian of India) :**

যে সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন কোন প্রানী বিরল হতে পারে। সেগুলি হল -

(১) তিন প্রজন্ম ধরে বা বিগত দশ বছরে যে সকল প্রাণীর সংখ্যা প্রায় ৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

(২) তারা নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলেই বসবাস করে।

(৩) তাদের সংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পায়।

(৪) এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা অতি সীমিত।

(৫) বণ্যপ্রানী জগৎ থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যাদের প্রবল।

ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি বিরল প্রজাতির পাখি হল Jerdons Courser, Forest, Owlet, Andaman White - tootwd shrew ইত্যাদি।

ভারতের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধ বৈশিষ্ট্য যুক্তপ্রানী (Endemic Species of India) :

'Endemic Specius' বলতে বোঝানো হয় সেই সকল উদ্ভিদ ও প্রানীদের যারা একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলেই হয় বসবাস করে ভারতবর্ষে এমন কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রানী দেখা যায় দক্ষিণে।

**বিদেশি প্রজাপতি (Exotic Species) :**

যে সকল প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রানী স্থানীয় কোন বৈশিষ্ট্য ছাড়াই হঠাৎ করে সৃষ্ট হয় বা উৎপত্তি লাভ করে, তাদের বলা হয় বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রানী।

কোন একটি নির্দিষ্ট বাস্চতুতন্ত্রে এহেন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রানীর সমাবেশ নিঃসন্দেহে জীব বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে । এরকম কতকগুলি বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ হল অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা 'N A c a c i a' এবং 'Eucalyptus' উদ্ভিদ । আসবাব পত্রের চাহিদানুসারে এই উদ্ভিদ গুলির চাহিদাও বৃদ্ধি হয়। কারণ এগুলি অতি দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে।

একইরকম ভাবে 'Mnenicon weed এবং 'American Wheat' এই গুলির ও চাহিদা পরিলক্ষিত হয় বর্তমান ভারতবর্ষের বাজারে।

তবে এই সকল বিদেশী প্রাজাতির উদ্ভিদ ও প্রানী জীব বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করে যেমন এর বৈচিত্র্যের আরও মানোন্নয়ন ঘটায় তেমনি এর কিছু নঞনর্থক প্রভাবও পরিবেশে পরিলক্ষিত হয়। কারণ সেহেতু এই সকল শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রানী সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিবেশে সৃষ্ট হচ্ছে বা উৎপত্তি লাভ করছে। তাই তার প্রতিপক্ষ কোন উদ্ভিদ বা প্রানী এরা পায়না, ফলে এরা কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পর্যবসিত হয় না। তাই অতি দ্রুত হারে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে, যা প্রাকৃতিক ভার সাম্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে পরিলক্ষিত হতে পারে। আবার যেহেতু এই ভিন্ন প্রজাতির খাদ্যশস্য বর্তমান ভারতিয় বাজারকে প্রভাবিত করেছে; তাই একথা অবশ্য স্বীকার্য যে দেশীয় বাজার এর ফলে প্রভাবিত হয়। শুধু তাই নয় এর পাশাপাশি ভিন্ন দেশীয় কোন উদ্ভিদ ও প্রানীর অস্তিত্বহীন তার কারণ হতে পারে।

তাই এবিষয়ে প্রত্যেকেই সতর্ক হতে হবে যে, বিদেশীর কোন খাদশস্য ব্যবহার করার সময় যাতে দেশীয় পন্য কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আবার বিদেশী প্রজাতির কোন উদ্ভিদ যাতে এদেশীয় কোনও উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করতে পারে কিংবা কখনই কোনই বিদেশী প্রজাতির প্রাণীর জন্য দেশীয় কোনও পশুর অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়।

## ২.৬.২. জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ (Conservation of Biodiversity) :

কোনও একটি রাষ্ট্রের কাছে তার অন্তর্গত জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ হল অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রিয়া। কারণ এই জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র ভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারে ; যেমন - এর একটি বানিজ্যিক মূল্য আছে, ব্যবহারিক মূল্য আছে, চিকিৎসাজনিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এছাড়াও আছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় মূল্য। তাই এই সকল কারণেই জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি ভিন্ন উপায়ে এই সংরক্ষণ করা যায়।

যেমন -

প্রথমত - Ex-Situ conservation এবং

দ্বিতীয়ত : In - Situ Conservation।

**এক্স-সিটু কনজারভেশন পদ্ধতি (Methods of Ex-Situ Conservation) :**

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রধানতম উপায় হল প্লাজম সংরক্ষণ। প্লাজম বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবের কোষ বা কোষ সমষ্টির সংরক্ষণ। এই প্লাজম সংরক্ষণ সম্ভব হয় এক্স সিটু ও ইন সিটু কনজার ভেজন পদ্ধতি দ্বারা।

কোশ উন্নত বা বিরল, অবলুপ্তপ্রায় রুগ্ন জীবের প্রোটোপ্লাজমাযুক্ত কোষ, ভ্রুণ, পরাগরেণু, শুক্রানু, ডিম্বানু প্রভৃতিকে চরম সংরক্ষণ করণকে বলা হয় এক্স সিটু কনজারভেশন বাংলা পরিভাষায় একে নিবাস দূরবর্তী সংরক্ষণ বলে। 'নিবাস-দূরবর্তী' বা 'প্রাকৃতিক বাসভূমি থেকে দূরে' একথা বলার কারণ হল, সে প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা দরকার, সেই প্রজাতির কোন জীবের কোষ, শুক্ররানু, ডিম্বানু প্রভৃতিকে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়। এই কাজে সহায়তা করার জন্য চিড়িয়াখানা, জীন ব্যাঙ্ক, উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি করতে হয়। পরে দরকার মত উদ্ভিদ বা প্রানীর শরীরে ঐ কোষ, শুক্রানু ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এর ফলে বিরল প্রজাতির জীব ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

(পরিবেশ, অসীম চট্টোপাধ্যায়)

**এক্স-সিটু কনজারভেশন পদ্ধতির দূর্বলতা (Drawback of Ex-Situ Conservation) :**

এক্স সিটু কনজার ভেশন পদ্ধতির মাধ্যমে যদিও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হয়। এবং বিপন্ন বিরল প্রজাতির জীবের অস্তিত্বও সংরক্ষিত হয় তথাপি এর কিছু দূর্বলতাও আছে। যেমন - এই নির্দিষ্ট পদ্ধতি কোনওভাবেই বাসভূমি বা বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে পারে না। এবং ক্ষেত্রে বিশেষে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যায় সাপেক্ষ নয়।

**ইন-সিটু কনজারভেশন পদ্ধতি (In-Situ Conservation) :**

ইন সিটু কনজার ভেশন পদ্ধতিতে কোনও বিরল বিপন্ন প্রজাতির জীবকে তাদের নিজ বসতি বা বাসভূমিতেই সংরক্ষিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে তাদের বাসভূমিকেও সংরক্ষিত করা হয়, যার মাধ্যমে জীবকূল সুরক্ষিত হয়।

বণ্যপ্রানী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এক্স-সিটু

কনজারভেশন পদ্ধতির তুলনায় ইনসিটু কনজারভেশন পদ্ধতির প্রয়োগ অতি জনপ্রিয়। উল্লেখ্য যে, সেসকল ক্ষেত্রে ইন সিটু পদ্ধতি দ্বারা জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষিত করা সম্ভব হয় না, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই এক্স সিটু কনজারভেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

**বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (Wild life Protection Act) :**

**বিধি :**

বণ্যপ্রানী বা বণ্যজীবন (ব্যাপক অর্থে) অর্থাৎ যেকোন প্রজাতির বন্য জীব ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ করার জন্য যে সকল বিধি গুলি গৃহীত হয়েছে তা অবশ্যই নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন হবে।

(১) নির্দিষ্ট কমিটি তৈরি করতে হবে এর জন্য।

(২) লুপ্তপ্রায় বিপন্ন বা বিরল প্রজাতির জীবকে রক্ষা করতে হবে।

(৩) এবিষয়ে বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের প্রতিও সচেতন হতে হবে।

(৪) বণ্যপ্রানী সংরক্ষণের জন্য তাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসভূমি তৈরি করতে হবে।

(৫) চিড়িয়াখানা বা পশু উদ্যান এ বিষয়ে উদ্যোগী হবে।

(৬) অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত বণভূমিতে যেকোন প্রকার অপরাধমূলক আচরণ বন্ধ করতে হবে।

(৭) জলাশয় তৈরি করে জীবদের জন্য পানীয় জল এবং খাদ্যের যোগান অটুট রেখে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে।

(৮) বণ্যপ্রানী সংরক্ষণের জন্য কঠোর নিয়ম বা আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(৯) আইন মান্য করার পক্ষনে অফিসার নিয়োগ করতে হবে এবং অমান্যনকারীদের জন্য শাস্তি দিতে হবে।

(১০) বণ্যনপ্রানী বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহি হতে হবে।

**বণভূমি সংরক্ষণ বিধি (Forest Conservation Act) :**

বণভূমি ভূমিক্ষয় নিবারণ করে। কাঠ ও নানবা বিধ উপজাত সামগ্রী দিয়ে মানুষের চাহিদা পূরণ করে। অরণ্য পরিবেশতন্ত্রকে অটুট রাখে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের জন্য বণভূমির হাতে সুরক্ষিত হয়। আর এই কারণেই মানুষ বণভূমির বিলোপ প্রশমিত করার চেষ্টা করে, বণসম্পদ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়।

(পরিবেশ, অসীম চট্টোপাধ্যায়)

টিপ্পনী

বণভূমি সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি বিধি গৃহীত হয়েছে। যেমন -

(১) প্রতি রাজ্যসরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের কে এবিষয়ে সতর্ক হতে হবে যে তারা কেবল বণভূমির ব্যবহনার তার প্রয়োজনেই করতে পারবে।

(২) বণসৃজনেদর প্রতি তারা যত্নবান হবেন।

(৩) আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রয়োজনে অথর্ণনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে সমাজকে, এমন বৃক্ষাদি রোপন করবেন।

(৪) বণভূমির সংরক্ষণের জন্য বণভূমির বিনাশ কারীদেদর আইনানুগ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ বিষয়ে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধনে বেশ কিছু বিধি গৃহীত হয়েছিল যেমন -

(ক) ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত বিধি অনুসারে কেন্দ্র সরকারের অনুমতি অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে বণভূমির মধ্যে কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব এই নিয়মের পরিবর্তন হয়।

(খ) জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য তৈরী হয়।

(গ) যেকোন প্রকানর অর্থনৈতিক চাষাবাদ, যেমন, চা, কফি এগুলির বণভূমিতে নিষিদ্ধ হয়।

(ঘ) পরিবর্তে যেকোন প্রকার ওষুধ উৎপাদনকারী বৃক্ষের রোপন বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঙ) সিল্ক উৎপাদনকারী বৃক্ষাদি যদি বহিঃবাণিজ্যিকী করণের জন্য হয় তবে তা নিষিদ্ধ, তবে তা যদি বণভূমির নিকটে বসবাসকারী উপজাতিদের জীবিকা প্রয়োজনে হয় তাহলে তা ক্ষেত্রে বিদেশে স্বীকৃত হতে পারে।

(চ) এতদ্ অতিরিক্ত ক্ষেত্রে যদি এমনকোনও ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে বনভূমিতে কোন অবনভুমিচিত্র ক্রিয়ার জন্য অনুমতি নিতে হয় তবে তাতে আর্থ-সামাজিক লাভ এবং পরিবেশ মিত্রতার তথ্যটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

এইভাবে বিভিন্ন বিধির দ্বারা বণভূমি সংরক্ষণের প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

## অনুশীলনী :

(১) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দুটি পদ্ধতি আলোচনা কর।

(২) বিরশ ও বিপন্ন প্রজাতির জীবদের সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৩) বিদেশী বা ভিন্ন প্রজাতির জীব সম্বন্ধে কি জান ?

## ২.৭. সারমর্ম (Summary) :

- 'ইকোলজি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে বিজ্ঞানী এ. কে সৈময়লে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ ঐকস (Oiks) থেকে যার অর্থ বাসভূমি বা বসবাসের স্থান।
- 'Ecosystem' শব্দটি এসেছে 'Eco' এবং 'System' থেকে 'Eco' শব্দটির অর্থ হল বাস্তুরীতি বা নির্দিষ্ট কোনন বসবাসের স্থান সেখানে জীবকূল অবস্থান করতে পারে। এবং 'System' বলতে বোঝায় ঐ নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী জীবকূলের পারস্পরিক সম্বন্ধ।
- 'জন্মের হার মৃত্যহারকে অতিক্রম করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় কম হলে জনসংখ্যা হ্রাস পায়।
- বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জীবমন্ডল। পৃথিবী পৃষ্ঠে সেখানেই প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাই জীবমন্ডলের পরিসরের অন্তর্গত।
- জীবমন্ডলে অবস্থানকারী সকলেরই প্রান আছে। এদের মধ্যে বিয়োজকরাও আছে।
- '১৯৮২ সালে বিজ্ঞানী সিমন্স তাঁর 'বায়োজিওগ্রাফিক্যাল প্রসেসেন' নামক গ্রন্থে বায়োমের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, বায়োম হল পরিবেশ প্রণালীর মধ্যে বৃহত্তম একক।
- পৃথিবী পৃষ্ঠের যে অংশটি জল বা জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত নয় তাকে বলা হয় ভূমি। পৃথিবী পৃষ্ঠে এই ভূমির দমনকারীতা অতিগুরুত্বপূর্ণ।
- যেকোন বাস্তুতন্ত্রেরই বায়ুদূষণ বাস্তুতান্ত্রিক বিভিন্ন কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে। কারণ বায়ু বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা সমগ্র জীবকূলের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ অক্সিজেনে সরবরাহ করে প্রাকৃতিক উপায়ে। কাজেই বায়ুদূষণ ঘটলে, সেই ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে বাস্তুতন্ত্র ও এদর কার্যাবলী প্রভাবিত হয়।
- বাস্তুতন্ত্র মানবজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান কারন কোন নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রেই মানুষ তার বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ পায়, সে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্যশক্তি (শক্তি প্রবাহ) সহ তার বিকাশের জন্য যাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- বাস্তুতন্ত্রে জীব বৈচিত্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির জীব অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রানী এই জীব বৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- জীববৈচিত্র্য ওষধ উৎপাদনকারী বৃক্ষ রোপনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।
- জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে বণভূমির বিলোপন এবং বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বস্থার বিনাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
- জীব বৈচিত্র্যের বিনাশ বা অবলুপ্তি করণ ভবিষ্যৎ এর বিভিন্ন আশঙ্কা জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। তাই সেই সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বাস্তুতন্ত্রে জীববৈচিত্র্য রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এর প্রতিগুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রধান দুটি উপায় বা পদ্ধতি হল - এক্স সিটু কনজারভেশন পদ্ধতি। ইন সিটু কনজারভেশন পদ্ধতি।

## ২.৮. অনুবন্ধ বা মূলকথা বা মুখ্য আলোচনা (Key Terms)

**জড় উপাদান (Abiotic Component) :**

বাস্তুতন্ত্রে জড় বা অজীব উপাদান গঠিত হয় জল, মাটি, বায়ু, শক্তি ও বিবিধ প্রকার অজৈব পদার্থ দ্বারা।

**সজীব উপাদান (Biotic Component)**

বাস্তুতন্ত্রে সজীব উপাদান বলতে সমগ্র জীব এবং প্রানীকূলকে বোঝানো হয়।

**বাস্তুসংস্থান বা ইকোলজি (Ecology) :**

বাস্তুতন্ত্রে অবস্থান কারী বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রানী ও মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন জড় উপাদান যেমন জল, মাটি, বায়ু, আলো এদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অধ্যায়ন করাকে বলা হয় ইকোলজি।

**বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) :**

যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে কোনও নির্দিষ্ট একটি বাসভূমিতে বসবাসকারী সকল জীব সম্প্রদায় ঐ অঞ্চলের জড় বা অজৈব উপাদানের পারস্পরিক সম্বন্ধ হয় তাকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র।

**জনসংখ্যা (Population) :**

জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় বেশী হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তে জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় কম হলে জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

**প্রজাতি (Species) :**

যে সকল জীব সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে আচার আচরণগত, জাতিগত এবং ব্যবহারগত দিক থেকে সমৃদ্ধ।

**সম্প্রদায় (Community) :**

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির জীব গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীব সমষ্টি।

**চক্র (Cycle) :**

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানগুলি পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীব দেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে, তাকে বলা হয় চক্র।

**খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain) :**

খাদ্য কাদক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে খাদ্যশক্তি উৎপাদক থেকে ক্রমপর্যায়ে আরও উন্নত জীব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয়, শক্তি প্রবাহের সেই ক্রমিক পর্যায়কে খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয়।

**ধারণ ক্ষমতা (Carrying Capasity) :**

একটি নির্দিষ্ট বাসভূমিতে বসবাসকারী একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর যে সর্বাধিক জনসংখ্যা তাকে বলা হয় ধারণ ক্ষমতা বা সেই স্থানের ধারণ ক্ষমতা।

**জীববৈচিত্র (Biodiversity) :**

একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী সকল জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকার সহ তাদের বিবিধ বৈশিষ্ট্য কে জীববৈচিত্র্য রূপে নির্দেশ করা হয়।

**বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য (Ecosystem Biodiversity) :**

বাস্তুতান্ত্রিক জীব বৈচিত্র্য বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন পুষ্টি স্তর সহ খাদ্য শক্তি প্রবাহ , খাদ্য শৃঙ্খল, পুষ্টি চক্র ও বাস্তুরীতি।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

## ২.৯. ক্রমিক উন্নতির আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ (Answers to check your Progress) :

(১) ইকোলজি শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'একস' থেকে। যার অর্থ বসবাসের স্থান।

(২) কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী সকল জীব গোষ্ঠী ও জড় উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উৎপন্ন অবস্থা বা তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র।

(৩) বাস্তুতন্ত্র দুই প্রকার। যেমন -

(ক) স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র।

(খ) কৃত্রিমক বাস্তুতন্ত্র।

(৪) বাস্তুতন্ত্রে সহ অবস্থানের বিষয়টি হল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে স্বভোজী জীব বা উৎপাদক (Autotrophs) এবং খাদক বা পরভোজী পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরতা পূর্ব্বক অবস্থান করে। এদের এইরূপ আবশ্যিক এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের জন্য খাদ্যশক্তি প্রবাহ এক দেহ থেকে অণ্য দেহে স্থানান্তরিত হতে পারে। যা ভৌত প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) CPR বা Common Property Resourees বা সাধারণ সম্পদ বলতে বোঝায় এমন সকল সম্পদ যা শহুরে বা গ্রামে অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী সকলেই নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। তবে এইগুলি কারণই একান্ত ব্যাক্তিগত সম্পত্তি নয়।

(৬) অভ্যন্তরীন যান্ত্রিকতা : নির্দিষ্ট কোন পরিবেশে তার নিজস্ব সকল নিয়ম বা বিধিকে অভ্যন্তরীন যান্ত্রিকতা বা Hoomco Static Mechanism বলা হয়। বিষয়টি এইরূপ যে। যদি কোন পরিবেশে নির্দিষ্ট কোন প্রজাতির জীবের সংখ্যা অত্যাধিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের চাহিদানুসারে যদি খাদ্যের যোগান না দেওয়া যায় তবে সেই বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যকে অর্থাৎ তার গ্রহণ এবং সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে বিবিধ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। তার ফলে বহু প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে ও সেই বাস্তুতন্ত্রে কাম্য জীব সংখ্যাই বসবাস করবে, এইভকাবে সেই বাস্তুতন্ত্রে পুনরায় জীবের ভারসাম্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৭) একটি বাস্তুতন্ত্রের জড় উপাদান বলতে বোঝায় জল, মাটি, বায়ু, শক্তি প্রবাহ, জলবায়ু ইত্যাদি সকল ভৌত উপাদান।

(৮) বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী সকল জীবগোষ্ঠীর মধ্যে এক জীবদেহ থেকে অণ্য জীব দেহে শক্তির (খাদ্য) স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে বলা হয় শক্তি প্রবাহ।

(৯) সবুজ উদ্ভিদের দ্বারা সমস্ত সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করণকে বলা হয় Gross Primary Production বা GPP.

(১০) এক জীবদেহ থেকে অণ্য জীবদেহে খাদ্যশক্তির প্রবাহ সম্ভব হয় খাদ্য, খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে।

(১১) একটি বাস্তুতন্ত্রের সকল জীবগোষ্ঠীর সজীব উপাদানের অন্তর্গত । সজীব উপাদানকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

(ক) উৎপাদক (Autrapha) বা স্বভোজী। যেমন সবুজ উদ্ভিদ।

(খ) খাদক বা পরভোজী (Heterptrophs) । যেমন যেকোন প্রানী যারা অপর প্রানী অথবা সবুজ উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

(১২) অধিকাংশ বাসভূমিই হল স্থলভাগের। যেমন -

(ক) তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্র (Granland Ecosystem)

(খ) বনভূমি বা অরণ্যভূমি (Forest Ecosystem)

(গ) মরুভূমি বাস্তুতন্ত্র (Desert Ecosystem)

(১৩) কোনও একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী সকল প্রকার জীবকূলের সে সমন্বয় দেখা যায় তার সামগ্রিক রূপকে বলা হয় 'জীব বৈচিত্র্য'। এই জীববৈচিত্র্য তিন প্রকারের হয়। যেমন -

(ক) জাতিগত জীব বৈচিত্র

(খ) প্রজাতিগত জীব বৈচিত্র।

(গ) বাস্তুতন্ত্রগত জীব বৈচিত্র্য।

(১৪) বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' এই রূপনৈতিক আদর্শকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রত্যেকেই উচিৎ বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী সকল প্রকার জীবের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে সহায়ক হওয়া।

(১৫) সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২৫ টি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ আঞ্চলিক জীব বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থান এবং উল্লেখ পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে অণ্যতম দুটি স্থান ভারতে অবস্থিত। যাদের একটি হল পূর্ব হিমালয় এবং দ্বিতীয়টি হল পশ্চিম ঘাট।

(১৬) জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করার অণ্যতম পদ্ধতি হল জার্সাপ্লাজম সংরক্ষণ।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(১৭) জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের অণ্যতম প্রধান দুটি পদ্ধতি হল -

এক্স সিটু কনভারজেশন।

ইন সিটু কনজারভেশন।

(১৮) যে সকল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রানীর অস্তিত্ব বিভিন্ন মৃত্তিকার এমন সকল মানুষ্যসৃষ্ট কর্মকান্ডের কারণে অবলুপ্ত হয় তাদের বলা হয় বিপন্ন প্রজাতির জীব (Endangred Species)।

(১৯) বিভিন্ন বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ হল সর্পগন্ধা, কলসীপত্র, সুন্দরী, গরাণ ও গেঁওয়া এবং প্রানীদের মধ্যে আছে একশৃঙ্গ গন্ডার, নীল তিমি, এশিয়াটিক সিংহ এবং Taxon।

(২০) Taxon বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ গুলি হল -

(ক) বিগত দশবছরে এই সকল জীবের জন্ম হার হয়ত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কমেছে।

(খ) এরা নির্দিষ্ট কতকগুলি ভৌগলিক অঞ্চলেই বসবাস করে।

(গ) অন্যান্য ৫০ প্রকার প্রজাতির জীবের তুলনায় এদের সংখ্যা দ্রুত গতিতে কমেছে।

(ঘ) বণভূমি থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সকল সম্ভাবণা এদের মধ্যে দেখা গেছে।

(২১) যে সকল প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণী স্থানীয় কোন বৈশিষ্ট বা পরিবেশ ছাড়াই হঠাৎ করে সৃষ্ট হয় বা উৎপত্তি লাভ করে। তাদের বলা হয় বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রানী।

## ২.১০. প্রশ্নাবলী এবং অনুশীলনী :

**ছোট প্রশ্ন :**

(১) বাস্তুরীতি এবং বাস্তুতন্ত্র বলতে কি বোঝ ?

(২) বাস্তুতন্ত্রের সজীব এবং জড় উপাদানগুলি কি কি ?

(৩) বাস্তুতন্ত্রের অর্জিত উন্নয়ন বলতে কি বোঝ ?

(৪) ভূসম্পদ অবলুপ্তি বা ক্ষতির কারণগুলি কি কি ?

(৫) মরুভূমির সজীব উপাদানগুলি উল্লেখ কর।

(৬) খমাদ্যশৃঙ্খল কাকে বলে ? এর প্রকার গুলি কি কি ?

(৭) জীব বৈচিত্র্যের সংকটের মুখ্য কারণগুলি কি কি ?

(৮) আঞ্চলিক  জীব বৈচিত্র্য (Hot spots Biodiversity) বলতে কি বোঝ ?

(৯) ভারতে অবস্থিত এমন দুটি স্থানের নাম উল্লেখ কর, তাদের বৈশিষ্ট্য সহ।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

# তৃতীয় একক

# পরিবেশগত ক্ষয় এবং ব্যবস্থাপনা

টিপ্পনী


৩.০. ভূমিকা

৩.১. এককের উদ্দেশ্য

৩.২. পরিবেশগত দূষণ

    ৩.২.১. দূষণ নিবারণে ব্যাক্তির ভূমিকা

৩.৩. পরিবেশ সম্পর্কিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যাবলী

    ৩.৩.১. পরিবেশ রক্ষা আইন

    ৩.৩.২. বায়ু (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রন) আইন

    ৩.৩.৩. জল (প্রতিরোধ এবং দূষন নিয়ন্ত্রণ) আইন

৩.৪. জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন

    ৩.৪.১. বৃষ্টি এবং পতিত জমি শোধন

৩.৫. জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জল বিভাজিকার ব্যবস্থাপনা

৩.৬. জৈবসার : সংজ্ঞা, জৈবসারের প্রজাতি এবং গুরুত্ব

৩.৭. ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমিকা

    ৩.৭.১. বিপর্যয় মোকাবিলা : বন্যা এবং ভূমিকম্প

    ৩.৭.২. ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভূমিকা (TSPCB)

৩.৮. সারসংক্ষেপ

৩.৯. প্রধান শব্দসমূহ

৩.১০. অনুশীলনের উত্তর সমূহ

৩.১১. প্রশ্নাবলী এবং অনুশীলন

৩.১২. অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম


## ৩.০. ভূমিকা :

পরিবেশ রক্ষা আইন ১৯৮৬ অণুযায়ী জল, বাতাস, ভূমি এবং তাদের আন্তঃসম্পর্কের সাথে মানবজাতি, অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীব সবই পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দূষণ বলতে বোঝায় বায়ু, জল ও ভূমির সেই সমস্ত পদার্থের উপস্থিতি, যেগুলি মানবীয় বা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং যা জীবজগৎ পরিবেশের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্যে

টিপ্পনী

অনিষ্টকর পদর্থের সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের ক্ষতি করে। সেই অবস্থাকে বায়ুদূষণ বলে। স্বাভাবিকভাবে পরিবেশচক্র দ্বারা এই দূষণ শোষিত হয় না বলেই এই বায়ুদূষিত হয়ে পড়ে।

আবহমন্ডল দূষিত হয় মূলত সেই সমস্ত দূষিত পদার্থের নির্গমণের জন্য যেগুলি উৎপন্ন হয় বিভিন্ন কলকারখানা, গৃহস্থালির আবর্জনা, যানবাহন ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শহরাঞ্চল গুলির বায়ুমন্ডলের উচ্চহারে বায়ুদূষণ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। বিশেষ করে সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন এবং বিষাক্ত বস্তুকনার পদার্থসমূহের বায়ুমন্ডলে উপস্থিত মানুষসহ অন্যান্য জীবজগতের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।

দূষণ বলতে সেই সমস্ত পদার্থগুলিকে (দূষণকারী) বোঝায় যেগুলি নৃতাত্ত্বিক জনিত (মানুষের / মানবীয়) কার্যক্রম হিসাবে ইচ্ছাকৃত বা আপদকালীনভাবে পরিবেশে মুক্ত হয় (যেমন, ভোপাল গ্যাসদূর্ঘটনা অথবা চার্নবিল পরমাণুকেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নির্গমন ছিল একটি দুর্ঘটনা)। দূষণের নির্দেশক বিন্দু হল পরিবেশের এমন একটি পরিবেষ্টনকারী গুণ যেটি বোঝায় পরিবেশ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। মানবীয় কার্যক্রম, যা কিনা শিল্প উৎপাদন অথবা নিকাশী ব্যবস্থা (নর্দমার ময়লার জল) এদের প্রভাব জল, বায়ূ এবং ভূমির উপর পড়ে, যার ফলাফল পরিবেশবেষ্টনকারী পরিবর্তনের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট পদার্থ (বর্জ্য) পুনর্ব্যবহৃত বা নির্গমন / বর্জ্য পদার্থ হিসাবে উৎপাদিত হয় যেগুলি মানুষের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

এটা দেখা গেছে যে, বায়ুদূষণের প্রাকৃতিক উৎসগুলি অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের পক্ষে লাভবান হতে পারে। এইগুলি হল যেমন অগ্ন্যুৎপাত বা দাবানলজনিত প্রাকৃতিক কারণের ফলে উৎপন্ন পদার্থ। কিন্তু এই প্রাকৃতিক দূষণকারী পদার্থগুলি বায়ুমন্ডলে দীর্ঘস্থায়ী হয় না কারণ এইগুলি জৈব রাসায়নিক চক্র দ্বারা পুনর্ব্যবহৃত হতে থাকে। সুতরাং তারা শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী সমস্যা হিসাবে ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

এই অধ্যায়ে উপরে উল্লেখিত সমস্ত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। একইসাথে এই সমস্ত পরিবেশ দূষণের ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (TSPCB) এর ভূমিকা সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

## ৩.১. পাঠের উদ্দেশ্যগুলি :

এই অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে সক্ষম হবেন।

- বিভিন্ন প্রকার দূষণের সংজ্ঞা, কারণ এবং প্রভাবগুলি সম্পর্কে আলোচনা।
- দূষণের সমস্যাগুলির মূল্যায়ন এবং তার থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলি বুঝতে পারা।
- বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা।
- কঠিন পদার্থ ব্যবস্থাপনা এবং জল সম্পদের ব্যবস্থাপনার মত বিষয়গুলির পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।
- পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন - কানুন গুলি আলোচনা।

টিপ্পনী

## ৩.২. পরিবেশ দূষণ :

এই অংশে আমরা বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আলোচনা করব। যেগুলি হল -

**(১) বায়ুদূষণ :**

বায়ু (প্রতিরোধক দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১ অনুযায়ী 'বায়ুদূষক এবং তাদের স্বসম্পর্কিত বিষয়গুলিকে বায়ুদূষণ বলা হয়। 'বায়ুদূষণ' বলতে বোঝায় আবহমন্ডলে দূষিত ধোঁয়া, গ্যাস, গন্ধ, ধোঁয়াসা, বাষ্প ইত্যাদি যে পরিমাণে বা যতক্ষণ স্থায়ী হলে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জগতে ক্ষতি হয় বা বায়ুমন্ডলে জমে থাকা যে সমস্ত দূষিত পদার্থ মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দে বাধা দেয় তাকে বায়ুদূষণ বলে। বায়ুদূষণ বলতে আবহমন্ডলে যেকোন রকম বায়ুদূষকের উপস্থিতিকে বোঝায়। এই প্রসঙ্গে নির্গমনের সংজ্ঞা খুবই প্রাসঙ্গিক। নির্গমন বলতে যেকোন ধরনের চিমনি, নালী, অথবা যেকোন বাহির পথ দিয়ে বেরিয়ে আসা কঠিন, তরল অথবা গ্যাসীয় পদার্থকেই বোঝায়। এক্ষেত্রে নির্গমনের নির্দিষ্ট মাত্রা এবং আইন বিদ্যমান আছে।

সাধারণত পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে নিম্নস্তর থেকে ৯৫ শতাংশ বায়ুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ; যাকে ট্রপোস্ফিয়ার বলা হয়। সাধারনভাবে বাতাস ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২১ শতাংশ অক্সিজেন, ০.৪ শতাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড, কিছু পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের সংমিশ্রনে তৈরী। গ্রহের অবশিষ্ট ০.৫ শতাংশ বায়ু যা বায়ুমন্ডলের উপরের স্তরের ওজোন গ্যাসের সাথে মিশে থাকে, সেই স্তরটিকে বলা হয় স্ট্রাটোস্পেয়ার।

বায়ুদূষকগুলি প্রাথমিক বা গৌণ প্রকৃতির হতে পারে। প্রাথমিক বায়ুদূষক

টিপ্পনী

গুলি হল কার্বণ-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড (জীবশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে উৎপন্ন সমস্ত ধরনের গ্যাস), সি. এফ. সি এবং বস্তুকণা । গৌণদূষকগুলি হল অ্যাসিডবৃষ্টি বা ওজন। সালফার -ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের সাথে জলের মিশ্রণে বায়ূমন্ডলে সূর্যালোকের দ্বারা বিক্রিয়ায় অ্যসিডের ফোঁটা সৃষ্টি হয় যা ভূ-পৃষ্টে অ্যাসিডবৃষ্টি হিসাবে নেমে আসে।

## বায়ুদূষণের উৎস :

বায়ুদূষনের উৎসগুলি প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় ধরণের হতে পারে।

**প্রাকৃতিক উৎসগুলি :** বায়ূদূষণে প্রাকৃতিক উৎসগুলি হল - আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, জৈবিক ক্ষয়, আলোকসংশ্লেষ (জারণ), সামুদ্রিক লবন স্প্রে, স্থলজ জীবজন্তুর পচনের ফলে সৃষ্ট দূষিত গ্যাস, ফুলের পরাগরেণু। পৃথিবীর ভূত্বকে তেজস্ক্রীয় ক্ষণিজ পদার্থের উপস্থিতি বায়ুমন্ডলে তেজস্ক্রিয়তার একটি প্রাকৃতিক উৎস।

**মানুষের তৈরী উৎসগুলি :** মানুষের তৈরী বায়ুদূষণের উৎসগুলি হল পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, শিল্প, কল-কারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস, জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, কৃষি কার্যক্রম ইত্যাদি । ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বিশেষ মুখ্যভূমিকা পালন করে । শিল্প-জাত ধূলি (ফ্লাই অ্যাশ) এবং সালফার - ডাই - অক্সাইড থেকে বেশী মাত্রায় বায়ুদূষক নির্গত হয় । ধাতব কেন্দ্রগুলি অনেক বেশী কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে এবং একইরকম বায়ুদূষক সৃষ্টি করে। সার উৎপাদন কেন্দ্র, গলন / গালা কেন্দ্র, টেক্সটাইল মিল, রাসায়নিক শিল্প, কাগজ ও মন্ড শিল্প হল বায়ুদূষণের অন্যান্য উৎস।

অটোমোবাইল কেন্দ্র থেকে নিষ্কাকশিত বিভিন্ন প্রকার গ্যাস বায়ুদূষণের অপর এক মুখ্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

**আভ্যন্তরীন বায়ুদূষণ :** আভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ হিসাবে মুখ্য দায়ী যে গ্যাসটি সেটি হল রজন গ্যাস । এই গ্যাসটির জন্যই প্রতিবছর ফুসফুসের ক্যানসার জনিত রোগের কারণে প্রচুর মানুষ মারা যান। এই গ্যাসটি নির্গত হয় মূলত বাড়ী তৈরীর সরঞ্জাম যেমন - ইঁট, কপ্ক্রিট ও টাইলস থেকে । ভারতের মত উন্নয়ন শীল দেশের বেশিরভাগ বাড়ীতে রান্নার জ্বালানি হিসাবে কয়লা, গোবরের ঘুঁটে, কাঠ ও কেরোসিন ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত জ্বালানীর সম্পূর্ণ দহনের ফলে সৃষ্টি হয় কার্বণ-ডাই-অক্সাইড এর মতো বিষাক্ত গ্যাস। আবার জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহন বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস ও কার্বণ মনোক্সাইড সৃষ্টি করে।

## বায়ুদূষণের প্রভাব :

**১) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব :** ধূমপান সহ অন্যান্য বায়ু দূষণকারী গ্যাসের ফল হিসাবে মানবদেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং যার ফলস্বরূপ ফুসফুসের ক্যানসার, হাঁপানি, দুরারোগ্য ব্রংকাইটিস এর মতো মারণরোগ দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য বায়ুদূষক আছে যেগুলি বিষধাতু, যা পরিব্যাপ্তির কারণ হিসাবে, প্রজননজনিত সমস্যা এমনকি ক্যানসার রোগের সৃষ্টি করে।

**২) গাছপালার উপর প্রভাব :** গাছের পাতার পত্ররন্ধের দ্বারা কোষে ঢুকে বায়ুদূষকগুলি তার প্রভাব বিস্তার করে। যার কুপ্রভাব হল গাছের মৃত্যু।

**৩) জলজ জীয়নের উপর প্রভাব :** বায়ুদূষকগুলি বৃষ্টির সাথে মিশে বিভিন্ন হ্রদের স্বচ্ছ জলের অম্লতা বৃদ্ধি করে যা জলজ প্রাণী বিশেষ করে মাছেদের জীবনে কুপ্রভাব ফেলে। বেশকিছু স্বচ্ছ জলের হ্রদের সমস্ত মাছেদের মৃত্যু ঘটেছে এই কারণে।

**বায়ুদূষণের নিয়ন্ত্রণ :**

নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির দ্বারা বায়ুদূষণ এর মাত্রা কমানো যেতে পারে :

১) সঠিক পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন গবেষনার পর শিল্পস্থাপন।

২) শিল্পে কম সালফারযুক্ত কয়লার ব্যবহার।

৩) কয়লা থেকে সালফার বিযুক্তিকরণ (ধুঁয়ো বা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে)

৪) দহন - ক্রিয়ার দ্বারা নাইট্রোজেন অক্সাইড এর বিয়োগ ঘটানো।

৫) ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর, ব্যাগ আভ্যন্তরীন ফিল্টার, ঘূর্ণিঝড় বিভাজক, স্ক্রাবার, ইত্যাদি নিযুক্ত দ্বারা স্ট্যাক নিষ্কাশন গ্যাসের থেকে বস্তুকনা মুছে ফেলার পদ্ধতি।

৬) যানবাহনের ইঞ্জিনের নিয়মিত টিউন আপ দ্বারা পরীক্ষা, কনর্ভাটার, উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা ইঞ্জিন পরিবর্তন। এছাড়া যানবাহনে দূষণ কমানোর জন্য জ্বাললানী সাশ্রয়কারী (চর্বিহীন) মিশ্রণ ব্যবহার যা কার্বণ মনোক্সাইড (CO) ও হাইড্রোকার্বন এর নির্গমন কম এবং ধীর ও শিতল জ্বালানী ব্যবহার বাড়াতে হবে যা নাইট্রোজেন অক্সাইড এর নির্গমন কমায়।

৭) সাইকেল একসাথে যাতাযাত ব্যবস্থার ব্যবহার।

৮) কম দূষণযুক্ত জ্বালানি (হাইড্রোজেন গ্যাস) ব্যবহার করতে হবে।

৯) অ-প্রচলিত শক্তির উৎসের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

১০) জৈবিক ছাকনী (ফিল্টার) এবং জৈব - স্ক্রাবার এর ব্যবহার।

১১) বৃক্ষরোপন বাড়ানো।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১২) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন এর সঠিক রুপায়ন।

## (২) শব্দদূষণ :

আমরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের শব্দ শুনে থাকি। শব্দ এমন এক ধরনের যান্ত্রিক শক্তির রূপ যা সৃষ্টি হয় কোনো স্পন্দিত উৎস থেকে। কোনো শব্দ কারো কাছে খুবই সুখানুভূতির সৃষ্টি করে আবার সেটাই অণ্যদের কাছে কষ্টদায়ক বা শ্রুতিকটু বলে মনে হয়। সেই কারণে এই ধরণের অবাঞ্ছিত এবং শ্রুতিকটু শব্দই শব্দদূষণের পর্যায়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (CPCB) বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য তাদের নির্ধারিত শব্দের মাত্রা বির্ধারণ করে দিয়েছেন।

**শব্দদূষণের ফলাফল :**

১) মানুষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা : কোলাহল যুক্ত জায়গায় মানুষের কথাবার্তার যোগাযোগ বিঘ্ন হয়।

২) শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট : শব্দদূষণের কারণে ক্ষণস্থায়ি বা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কানে শোনার ক্ষমতা হারিয়ে যেতে পারে। এটি নির্ভর করে শব্দের স্থায়ীত্ব ও তীব্রতার মাত্রা বা স্তরের উপর। শ্রবণ সংবেদনশীলতা কয়েক মিনিটে বেশী হ্রাস হয় যদি সে উচ্চ কম্পাঙ্ক যেমন ৯০ ডেসিবেল এর মধ্যে অবস্থান করে।

৩) মানসিকতার পপরিবর্তন : নিয়মিত শব্দদূষণে মানবদেহে বিভিন্ন অংশের কার্যক্ষমতা প্রভাবিত হয়। যার ফলশ্রুতি হিসাবে উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, হজমশক্তি কমে যাওয়ার মত উপসর্গ দেখা যায়।

**শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ :**

১) শব্দদূষণের উৎসগুলি কমানোর প্রয়োজন।

২) যে সমস্ত যন্ত্রপাতি থেকে অবাঞ্ছিত শব্দ তৈরী হয় সেই ধরণের যন্ত্রপাপতির উপর শব্দ প্রতিরোধ আচ্ছাদন ব্যবহার করেও শব্দদূষণ প্রতিরোধ করা যায় এবং যার কুপ্রভাব কর্মীদেদর উপর পড়বে না।

৩) যন্ত্রপাতির সঠিক দেখভাল তথা রক্ষণাবেক্ষণ শব্দদূষণ কমাতে সাহায্য করে।

৪) শব্দ নিরোধক ব্যবহার করা যেতে পারে যা অবাঞ্ছিত শব্দ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের শব্দ প্রতিরোধ ধাতব আচ্ছাদন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫) সুদীর্ঘ জীবন কামনায় বৃক্ষরোপন খুবই দরকারী।

৬) আইন , সংবিধান দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক অণুষ্ঠানে শব্দের তীব্রতা কমানোর ব্যবস্থা

করা যেতে পারে। জনবহুল এলাকায় মোটর সাইকেল, মোটরগাড়ী প্রভৃতি যানবাহন চালানোর সময় অযথা হর্ণ দেওয়া বন্ধ করলে শব্দদূষণ কমে।

## (৩) জলদূষণ :

জলের সঙ্গে অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলে যদি জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং তার ব্যবহারের ফলে যদি জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে জলের সেই খারাপ অবস্থাকে জলদূষণ বলে।

**জলদূষণের উৎস সমূহ :**

জল হল আমাদের বাঁচার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। আমরা জলকে ব্যবহার করি পানীয় হিসাবে, রান্নার কাজে, স্নানের কাজে, ধোওয়া, সেচ এবং সমস্ত শিল্প কারখানার কাজে। জল যেমন একটি সম্পত্তি যা অনেক পদার্থকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। সে কারণেই জল খুব সহজেই দূষিত হয়ে পড়ে। জলদূষণের কারণ হিসাবে কিছু প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উৎসকে দায়ী করা যেতে পারে। জলদূষণের প্রত্যক্ষ উৎসগুলি হল কলকারখানা, বিদ্যুৎ- উৎপাদনকেন্দ্র, নর্দমা, ভূগর্ভস্থ খনি অঞ্চল।

**ভৌম জলদূষণ এবং জলাশয় জলদূষণ :**

**ভৌমজলদূষণ :**

ভূপৃষ্ঠে সমগ্র জলের ৬.২ শতাংশ ভৌমজল হিসাবে বর্তমান। যা জলাশয় জলের থেকে ৩০ গুণ, যেমন নদী, জলধারা বা হ্রদ এবং মোহনা, সেপটিক ট্যাঙ্ক, শিল্পজাত (কাপড়, চর্ম, রাসায়নিক) গভীর নলকূপ, খনি ইত্যাদি যেগুলি হল ভৌম জলদূষণের অপরিবর্তনীয় এবং মূল কারণ। ভৌম জলদূষণের সাথে আর্সিনিক, ফ্লোরাইড এবং নাইট্রেট এবং মিশ্রণগভীর স্বাস্থ্য-জনিত সমস্যার সৃষ্টি করে।

**জলাশয়ে জলদূষণ :**

জলাশয়ে জলদূষণের মুখ্য উঃসগুলি হল নিম্নরূপ :

১) নর্দমাচর নোংরা জল।

২) শিল্পজাত আবর্জনা।

৩) রাসায়নিক ডিটারজেন্ট।

৪) কৃষিজাত আবনর্জনা।

৫) তেল।

৬) তাপদূষণ।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জলদূষণের ফলাফল :

বিভিন্ন ধরণের জলদূষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফল হল নিম্নরূপ :

১) অক্সিজেনের জন্য তৈরী হওয়া বর্জ্য।

২) নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের যৌগ (পুষ্টি)।

৩) প্যাথোজেন গুলি।

৪) বিষজনিত যৌগ।

৫) জলবাহিত সংক্রমণ / রোগ।

৬) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের হ্রাস।

পানীয় জলে বিভিন্ন ধরনের জীবানুনাশক যেমন, DDT, অ্যালড্রেইন প্রভৃতি মেশানোর ফলে বহু মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরী হচ্ছে। তাই অতিসত্ত্বর এগুলির ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। অতি সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশে কিছু মানুষকে এর ফল ভুগতে দেখা গেছে।

**জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার উপায় :**

দূষিত জলকে নিয়ন্ত্রণ করার যেমন প্রত্যক্ষ উপায় আছে, তেমনি জল যাতে দূষিত না করা হয়, তারজন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও আছে। যেমন -

১) নদী, খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ, সমুদ্রের জলে সরাসরি আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা।

২) জলকে শোধন করে তবেই নদী, খাল, বিল, জলাশয়ে ছাড়ার বন্দোবস্ত করা।

৩) পুকুর, হ্রদ ও জলাশয়ে চড়াহারে ফসফেট মেশানো ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় কাচা বন্ধ করা।

৪) চাষ আবাদের কাজে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করা।

৫) সমুদ্রের জলে তেল ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা।

৬) শুধুমাত্র আবর্জনা দিয়ে পুকুর বা জলাশয় ভরাট বন্ধ করা।

৭) জনসচেতনতা বৃদ্ধি সহ জলদূষণ সংক্রান্ত আইন গুলি মেনে চলা।

৮) বৃক্ষরোপন দূষণ নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে ভূমিক্ষয় রোধ করে।

## ঘটনা : রিও গ্রান্ডেতে দূষণ

১৯৬৫ সালে মেক্সিকো সীমান্ত শিল্পায়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি সূচনা করে যা ম্যাকুলাডোরা কর্মসূচী নামে পরিচিত। এই অনুষ্ঠানে অংশ হিসাবে বিদেশী কোম্পানীগুলি (প্রধানত এশিয়া ও আমেরিকা) মেক্সিকোতে তাদের নিজেদের কারখানা গড়ে তোলেন এবং যন্ত্রাংশগুলি আমদানি করে কর ছাড়ে। যদিও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে জলদূষণেরও মাত্রা বৃদ্ধি পায়। রিও গ্রান্ডেতে জলদূষণের

জন্য বিভিন্ন কারণ দায়ী ছিল। যার মধ্যে অন্তভুক্তি ছিল সীমান্তের উভয়দিকের সম্প্রদায়ের অবৈজ্ঞানিক অপরিস্কার সেচ ব্যবস্থা, অক্সিজেনের জন্য তৈরী হওয়া বর্জ্য এবং প্যাথোজনিক ক্ষুদ্রকণা এবং বিশেষত রিও গ্রান্ডে ভ্যালিতে বা তার চারপাশে চাষাবাসের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার। পরিশেষে বলা যায় ম্যাকুইলাডোরা ও অন্যান্য শিল্পকারখানা যেগুলি গড়ে উঠেছিল সীমান্তের দু-পাশে যার কুফল আমাদের কাছে এক বিষময় ফল নিয়ে আমার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল।

১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ও মেক্সিকো একসাথে তাদের সীমান্ত এলাকার জন্য প্রাথমিক পর্যায় (১৯৯২ - ১৯৯৪) সুসংহত পরিবেশগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যে পরিকল্পনায় ছিল মূলত সেইসমস্ত পরিবেশগত সমস্যাগুলির যৌথ সমাধান। যেগুলি সীমান্ত এলাকায় সৃষ্টি হবে। এই পরিকল্পনার বিষয় হিসাবে বিশেষত সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হত যেগুলি সীমান্ত অতিক্রম করে জলদূষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করবে বলে সম্ভাবনা সৃষ্টি হত।

১৯৯৩ সালে দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়া উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণীজ্য চুক্তি (NAFTA) পরিবেশগত সচেতনতা প্রসারে অবদান রেখেছিল। জনগণের বিতর্কের অংশ হিসাবে NAFTA কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আলোচনার বিষয় ছিল পরিবেশ, বিশেষত যার প্রভাব যুক্তরাষ্ট্র - মেক্সিকোর অর্থনৈতিক সংহতিতে পড়েছিল যা সীমান্ত পরিবেশগত। এই বিষয়কচে কেন্দ্র করে বলা যায় NAFTA পরিবেশের সহযোগী হিসাবে পার্শ্বিক প্রস্তাবনা গঠন করে যৌথ বা ত্রয়ী জাতীয় হিসাবে যাতে পরিবেশগত সমস্যায় মোকাবিলা করতে পারা যায়। এগুলির মধ্যে অন্তঃভুক্ত -

১) পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা ও নোংরা জলের পরিশ্রুতকরণের অভাব।

২) ম্যাকুইলাডোরা উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপন্ন বিভিন্ন বর্জ্য সম্পর্কিত পরিমাপ ও সমস্যাকে নির্দিষ্ট করা।

৩) ম্যাকুইলাডোরা উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত শিল্প কারখানার বায়ু ও জলদূষণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া বা সচেতন হওয়া।

এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আরো বেশিভাবে কার্যকরীভাবে মোকাবিলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশগত সুরক্ষা সংস্থা (EPA) ও টেক্সাস প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কমিশন (TNRCC) যৌথ ভাবে তাদের সহযোগী মেক্সিয় গোষ্ঠীর সাথে সীমান্ত সম্পর্কিত পরিকল্পনাকে আরো সুদৃঢ় করার কাজে জোর দেয়। রিওগ্রান্ডে কলোরেডোর দক্ষিণাঞ্চলের মান জুন পর্বত সংলগ্ন অঞ্চলে তাদের কাজ শুরু করে

টিপ্পনী

যা ১.৮৮৫ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত মহয়ে মেক্সিকোর উপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। নদীর গতিপথ এবং তার শাখা উপশাখা অঞ্চল মিলিয়ে যার আয়তন ক্যাললিফোনিয়ার আয়তনের দ্বিগুন ছিল। এই নিকাশী অঞ্চল বা অববাহিকা যা যুক্তরাজ্য ও মেক্সিকোর পাহাড় পর্বত, বনাঞ্চল, মরুভূমি অঞ্চলকে ও আড়াআড়িভাবে বেষ্টন করে রেখেছিল। এই অববাহিকার অন্তর্গত ছিল বাড়ী থেকে প্রত্যত উদ্ভিদ এবং বণ্যপ্রাণী সহ দশলক্ষ জনসাধারণ। মোটামুটিভাবে বলা যায় সীমান্তবর্তী দুই দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশকে এই নদী তার পরিষেবা দিত।

নদী হল এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা শিল্প , কলকারখানা, কৃষিকাজ, গার্হস্থ্য জলের প্রয়োজন, বিনোদন, নৈর্স্বগীক আনন্দ এবং বণ্যপ্রাণী সহ জলজ প্রজাতিদের কাজে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবিষয়ে এটি সম্মানযোগ্য এবং বিশেষ অবদান যেমন আছে তেমনি বেশকিছু অভিশাপ ও গুরুত্বপূর্ণভাবে দর্শনীয়। রিওগ্রান্ডে এর জলের কারণে বেশকিছু পরিত্যাক্ত কৃষিজমি চাষের জন্য সেচের সুযোগ পেত। এই দুই দেশের জনগণের প্রায় ৭৪% মানুষচের কাছে এই নদীজলই ছিল একমাত্র পানীয় জলের উৎস।

NAFTA যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল তাই নয় বরং বলা যায় সীমান্ত এলাকায় জনগণ বৃদ্ধি ও শিল্পায়ন বৃদ্ধিতেও সাহায্য করেছিল যা Taxas Clean Rivers Act (1991), এর অনুমোদিত দ্বিবার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ আছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পায়ন যে জলের গুণগত ও পরিমাণগত ক্ষেত্রে কি বিশাল বিপদের সম্ভাবনার সম্মুখীন করেছিল তাও সে রির্পোটে উপলব্ধ।

বিগত দশ বছরে সীমান্ত এলাকার দুই পাশেই জনসংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। NAFTA এবং পূর্ববর্তী সীমান্ত শিল্পায়ন পরিকল্পনা এই বৃদ্ধিকে আরো সাহায্য করেছিল। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে শুধুমাত্র জীবিকা বৃদ্ধি এনেছিল তাই নয় বরং অপরিস্কার নিকাশি ব্যবস্থা, অবৈজ্ঞানিক কৃষিকাজ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ এর মতো বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

বর্জ্য জল পরিশ্রুতকরণ এর সৌজন্যে অন্যান্য যে বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছিল সেগুলি হল জলদূষণ, পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাগুলি। একটি গবেষনায় দেখা গেছে যে মেক্সিকোর সীমান্তের শহরগুলির জন্য বর্জ্য জলের পরিশ্রুত করণের কেন্দ্র বসানোর জন্য খরচ হবে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার ; কিন্তু এই ব্যয়ভার নদী অববাহিকার জলের গুণগত মান উন্নতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়ত সীমান্ত এলকার বর্জ্য সরানোর কাজের গতিপ্রকৃতি

ও নজরদারীর জন্য ১৯৯৩ তে টেক্সাস প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষন কমিশন, সীমান্ত বিষয়ক এবং পরিবেশগত ন্যায় নামক একটি দপ্তর খোলে। এই দপ্তর টেক্সাস প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কমিশন এর বিভিন্ন উদ্যোগগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতো এবং সীমান্ত পরিবেশগত সমস্যা ও কাজ সহ যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম যা চারটি সীমান্তবর্তী মেক্সিকান রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর এর সহযোগী হিসাবে কাজ করত।

পরিশেষে, ম্যাকুইলাডোরা ব্যবস্থার ফলে উদ্ভুত দূষণকে নির্দিষ্ট করা যায় এবং তার পদক্ষেপ হিসাবে Taxas Clean Riivcers Act তাদের দ্বিবার্ষিক রিপোর্ট বা প্রতিবেদনে যে সমাধান পথ নির্দেশ দেয় তা হল এই জল পরিশ্রুত পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণ ও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি ও সাহায্য প্রয়োজন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে রিওগ্রান্ডে বা রিওব্রাভো অববাহিকা ১৯৯৫ এর অক্টোবর মাসে দিয়া ডেল রিও ও জনগণ নিয়ে এক যৌথ কর্মশালার আয়োজন করে এবং ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে পরিষ্কার নদী প্রকল্পের সহযোগী গূণগত জল সমস্যা সম্মেলন আয়োজন করে।

## (৪) তাপদূষণ :

তাপদূষণ বলতে বোঝায় জলে অত্যাধিক তাপের উপস্থিত, যার কারণে স্বাভাবিক পরিবেশের অবাঞ্ছিত বা অনভিপ্রেত পরিবর্তন দেখা যায়।

এই তাপদূষণের মূল উৎসগুলির মধ্যে পড়ে, বিভিন্ন তাপ উৎপাদনকারী কারখানা, যেমন - তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র, পরিশ্রুতকরণ কেন্দ্র ও ইস্পাত কারখানা।

**তাপদূষণের ফলাফল :**

১) উচ্চ তাপমাত্রায় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন এর উপাদান গুলি তেতে যায় ও তার মাত্রা কমে যায়। ফলে তা অদ্রবনীয় বা অদ্রবীভূত অবস্থায় থেকে যায়।

২) উচ্চ তাপমাত্রা ঠান্ডা জলে অক্সিজেনের প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

৩) তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে রাসায়নিক পদার্থ, ডিটারজেন্ট ও কীটনাশকের বিষক্রিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়।

৪) জলজ উদ্ভিদকূল ও প্রাণীকূল এর বিভিন্ন প্রজাতির যে ভারসাম্য তা বিঘ্নিত হয়। এই আকস্মিক তাপবৃদ্ধির কারণে, পরবর্তীকালে তার জায়গায় আসে অত্যাধিক তাপ সহনকারী প্রজাতি।

৫) জলজ জীবকূলের বিপাকীয় ক্রিয়াকর্মের হারবৃদ্ধি পায় যা বেশী অক্সিজেন দাবী করে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৬) উপকূলের কাছাকাছি জল গরম বা তাপবৃদ্ধির কারণে মাছেদের ডিম থেকে বাচ্ছা হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে আবার অনেক ক্ষেত্রে বাচ্ছা মাছেদের মৃত্যু ঘটায়।

তাপদূষণের নিয়ন্ত্রণ :

তাপদূষণের নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে :

১. কুলিং পুকুর
২. কুলিং টাওয়ার
৩. স্প্রে পুকুর

## (৫) সামুদ্রিক দূষণ :

সামুদ্রিক দূষণের মূল উৎসগুলি হল :

১) নদীসমূহ, যেগুলি তার অববাহিকার দূষণ সৃষ্টিকারী নোংরা সমূহ বয়ে নিয়ে আসে।

২) বিভিন্ন নালা ও সমুদ্র উপকূল যেখানে মানুষজন বসবাস করে বিভিন্ন হোটেল, কারখানা, কৃষিকাজ করা হয় তার বর্জ্য।

৩) তৈল্য উত্তোলন ও রপ্তানীকৃত কাজ।

বেশীরভাগ নদী সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। যে সমস্ত দূষিত বর্জ্য নদীগুলি বয়ে নিয়ে আসে সেগুলি সাগরে গিয়ে ফেলে। যেগুলির মধ্যে অন্যতম হল সেচের কাদামাটি, কারাখানা নিঃসৃত বর্জ্য, সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট, কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক, কঠিন বর্জ্য, প্লাস্টিক, ধাতু ও কারখানার থেকে নিঃসৃত তাপীয় পদার্থ।

সমুদ্র জলে মেশার পর এই দূষিত পদার্থগুলি দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে জৈব উপাদান যেগুলি সমুদ্রের উপাদান সেগুলি ভেঙে দেয়। ইস্পাত এর মতো কিছু দূষণকারী বর্জ্য আছে যেগুলি তাদের ধর্ম অপরিবর্তিত থেকে সমুদ্রদূষণ ঘটায়।

বিভিন্ন জাহাজ সহ অন্যান্য রপ্তানীর মাধ্যমে, পেট্রোলিয়াম শিল্প, তৈল সংশোধনাগার, ধাতু শিল্প ও রংশিল্প, জাহাজের ধ্বংসাবশেষ সংক্রান্ত শিল্প কারখানার বর্জ্যগুলি সামুদ্রিক দূষণ ঘটায়। বিভিন্ন কারণে সমুদ্রে তেল, পেট্রোল ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ছড়িয়ে যায় যা সমুদ্রের দূষণ সহ সামুদ্রিক জীব বৈচিত্রকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে।

**সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ :**

১) বিভিন্ন শিল্পকারখানার বর্জ্য, দূষণকারী পদার্থ ও সেচ ব্যবস্থার নোংরা বর্জ্য যাতে সাগরের উপকূলে না মেশে তা দেখতে হবে।

২) উপকূলবর্তী এলাকার কাছাকাছি দূষণের গৌণ উৎসগুলি বন্ধ করা ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩) নর্দমার উপচে পড়া অতিরিক্ত জল যাতে সমুদ্রে না মেশে তারজন্য আলাদা নালা, নিকাশির দ্বারা মাটিতে মেশাতে হবে।

৪) বিষজাতীয়, ক্ষতিকর বর্জ্য ও সেচের বর্জ্য কাদা সমুদ্রে নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৫) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী যা উপকূলবর্তী অঞ্চলে হয় তার মাত্রা কমাতে হবে।

৬) তেল ও চর্বি জাতীয় বস্তুর পরিশুদ্ধকরণের দ্বারা পুনঃব্যবহারযোগ্য করতে হবে।

৭) তেল যা নুড়ি (ballasts) থেকে উৎপন্ন হয় তা সমুদ্রে সমাধিস্থ করা যাবে না।

৮) পরিবেশগত স্পর্শকাতর উপ কূল অঞ্চলকে বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে যাতে সেখানে কোন প্রকার খনন কাজ না হয়।

## (৬) মৃত্তিকা দূষণ :

মৃত্তিকা হল পৃথিবীর ভূত্বকের উপরিভাগ যা বিভিন্ন শিলার ক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হয়। মাটির জৈব উপাদান, বস্তুগুলি এটিকে আমাদের বানযোগ্য করে তুলেছে ও সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন খনিজ, বিশেষত গার্হস্থ্য ও শিল্পজ বর্জ্য যা আমরা মাটিতে নিক্ষেপ করি। পরবর্তীকালে তাই মাটিকে দূষিত করে তোলে।

গার্হস্থ্য বর্জ্যগুলির মধ্যে বিশেষত নোংরা আবর্জনা, ধাতব আবর্জনা যেমন কাঁচ, প্লাস্টিক, টিনের কৌটো, কাগজ, ছিবড়া, রঙের পরিত্যাক্ত জিনিষগুলি দায়ী। চিকিৎসার বর্জ্য যা সেচের ট্যাঙ্ক যা খুবই ক্ষতিকারক বিষ খুবই দূষিত করে মাটিকে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলি থেকে বৃহৎ পরিমান Fly ash বা ফ্লাই অ্যাস বা উড়ন্ত ছাই তৈরী হয়। এই ছাই পরবর্তী সময়ে মাটিতে মীশে মাটির উর্বরতা শক্তি কমিয়ে দেয় ও মাটিকে দূষিত করে তোলে। শিল্পজাত বর্জ্য তা জৈব বা অজৈব উপাদানে গঠিত তা অবাধ্য ও তা বিয়োজন অবস্থায় মৃত্তিকা দূষণ করে।

মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মল, মূত্র মাটিতে মিশছে। এগুলি থেকে সৃষ্টি হয় এছাড়া ড্রেনের নালা - নর্দমার কাদা মাটি, নোংরা জীবানু, ব্যাকটেরিয়া সহ অভ্যন্তরীণ জীবানু যা মাটিকে দূষিত করে তোলে।

### মৃত্তিকা দূষণের প্রভাব :

শিল্পজাত বর্জ্য নর্দমার নোংরা বর্জ্য যা মাটিকে দূষিত করার মধ্য দিয়ে মূলত মানুষের স্বাস্থ্যকে ও প্রভাবিত করে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যেমন - অ্যাসিড, অ্যালকালি বা ক্ষার, কীটনাশক এবং অন্যান্য কীটনাশক বস্তু যা শিল্পজাত বর্জ্য হিসাবে নির্গত হয়ে জমির উর্বরতা ক্ষমতা হ্রাস করে। আবার অনেক সময় মাটির ভৌত,

টিপ্পনী

রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

কিছু মহনশীল রাসায়নিক বিষ খাদ্য শৃঙ্খলায় মিশে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে । নর্দমার কাদা মাটিতে মিশে থাকা বিভিন্ন ধরনের পরজীবি, জীবানু ও আভ্যন্তরীন জীবানু অনেক সময় বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে।

**মৃত্তিকা দূষণ নিয়ন্ত্রণ :**

টিপ্পনী

১) মাটিতে মেশার আগে নি র্গত প্রবাহগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা দরকার।

২) কঠিন বর্জ্যগুলিকে সঠিকভাবে সংগ্রহ ও সঠিক পদ্ধতিতে ধ্বংস করা প্রয়োজন।

৩) বর্জ্যগুলি থেকে যাতে ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি উদ্ধার করা যায়।

৪) বিয়োজন সক্ষম জৈব বর্জ্যকে বায়োগ্যাস উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়।

৫) মিথেন গ্যাস তৈরীর কাজে গবাদী পশুর গোবরকে ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র কালো মাটি অর্থাৎ পায়খানায় রাতে যে ময়লা জমে তা দিয়ে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করা।

৬) বিয়োজক উপাদান থেকে জীবানুর ক্ষয়কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার করণে মাটি দূষণ কমানো সম্ভব।

(৭) নিউক্লিয়ার পারমানবিক বিপদ : প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবশিষ্টাংশ যৌগ উপস্থিত । যারা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে গিয়ে আলফা ও বিটা কণা, গামারশ্মি নামে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরী করে যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা । তবে অনেক সময় এই কণা ও তরঙ্গ অতি অল্প সময়ে এত স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বৃদ্ধি করে । যা জীবদেহে প্রবেশ করলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হবে । পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন আবর্জনার মধ্যেও এরকম অনেক তেজস্ক্রিয় উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা বিভিন্ন মাত্রায় বিকিরণ ছড়ায় । তাই জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে উদ্ভূত পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থাকে পারমাণবিক বিপদ বলা হয়।

**পারমাণবিক দূষণের নিয়ন্ত্রণ :**

১) পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের আগে সেই বিষয়ের স্বল্পকালীণ ও দীর্ঘকালীন ফলাফল সম্বন্ধে সচেতনতা দরকার।

২) পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে নির্গত পরীক্ষাগারের বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা দরকার।

৪. কঠিন বস্তুর ব্যবস্থাপনা :যে বস্তুকে মানুষ বর্জন করতে চায় তাকে বর্জ্যবস্তু বলে। বর্জ্যবস্তু মানুষ ও প্রকৃতির ক্ষতি করে। তাই বর্জ্যবস্তুর ব্যবস্থাপনা দরকার। মানুষের

পরিবেশ চেতনা ও উন্নত প্রযুক্তি ছাড়া বর্জ্যবস্তুর প্রকৃত ব্যবস্থাপনা একটি দূরহ কাজ। এই ক্রমবর্ধমান জনংখ্যার উচ্চবিলাসবহুল জীবনধারণের জন্যেই বর্জ্যবস্তুর পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। যদি এখনই এর ক্রমবর্ধমান তাকে আটকানো না যায় তাহলে খুব সম্প্রতি আমাদের হাত থেকে এই বিষয়টি বেরিয়ে যাবে।

কঠিন বর্জ্যবস্তুর সঠিক ব্যবস্থাপনাই এর কুপ্রভাবকে কমাতে পারে। কঠিন বর্জ্য বলতে সেই সমস্ত বস্তুকে বোঝায় (তরল বা গ্যাসীয় ছাড়া) যেগুলি পৌর, কারখানার বর্জ্য, কৃষিজাত, চিকিৎসাজনিত, খনিজ, নালা-নর্দমার কাদামাটি যুক্ত বর্জ্য।

**শহুরে ও কলকারখানা বর্জ্যের উৎস :**

চিকিৎসাজনিত বর্জ্যগুলি মূলত তৈরী হয় হাসপাতাল থেকে, বাড়ি ও অফিস, বাজার থেকে পৌর কঠিন বর্জ্য, এছাড়া বিভিন্ন পার্ক ও বাগান থেকে উদ্যানজনিত বর্জ্য তৈরী হয়।

পৌর কঠিন বর্জ্য পদার্থ বা বস্তু যেগুলি অনু-জীবানু দ্বারা বিয়োজন করা সম্ভব যেগুলিকে বলে বিয়োজনক্ষম বর্জ্য। যেমন - শাক-সবজি জনিত বর্জ্য, বাসীখাবার, চা-পাতা, পচা ডিম, চিনা বাদামের খোল, শুকনো পাতা, ইত্যাদি হল কঠিন বর্জ্য।

আবার বর্জ্য যেগুলি অনু জীবানু দ্বারা বিয়োজিত করা সম্ভব নয় যেগুলিকে বলে অ-বিয়োজনক্ষম বর্জ্য। যেমন পলিথিন ব্যাগ, ভাঙাচোড়া ধাতু, গ্লাস, বোতল ইত্যাদি।

শিল্প কলকারখানাজাত বর্জ্যের মধ্যে বৃহৎ পরিমানে ধাতু অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে কারখানার আবর্জনা, জৈব বর্জ্য ও অ্যাসিড অন্তর্ভুক্ত।

**কঠিন বর্জ্যবস্তুর প্রভাব :**

পৌর বর্জ্য পদার্থ সঠিকভাবে নিযুক্তির ব্যবস্থা না করার জন্য রাস্তায় যত্রতত্র উঁচু হয়ে পড়ে থাকে। মানুষ নিজের বাড়িও চারিপাশ পরিষ্কার রাখার জন্য নোংরা বাইরে নিক্ষেপ করে যা সমগ্র সম্প্রদায় সহ আমাদের প্রত্যেককেই প্রভাবিত করে। এই ধরণের খালাস করার প্রক্রিয়ারদ্বারা বিয়োজনযোগ্য পদার্থগুলিও অনিয়ন্ত্রিতভাবে ও অস্বাস্থ্যকরভাবে মাটিতে মিশতে পারে না। যা পরবর্তীতে তৈরী করে দুর্গন্ধ ও বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ও পরিবেশকে আরো দূষিত করে তোলে।

শিল্পজাত কঠিন বর্জ্য এর জন্যই বিষাক্ত ধাতু ও বিপদযুক্ত বর্জ্য তৈরী হয় যা মাটিতে ছড়িয়ে যায় এবং মাটির জৈবিক ও মনো রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটায়, যা মাটির উর্বরতাকে বিনষ্ট করে। বিষাক্ত অবশিষ্টাংশগুলি অনেক সময় মাটির

টিপ্পনী

গভীরে ভূগর্ভস্থ জলস্তরকেও প্রভাবিত করে।

**কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :**

বর্জ্য ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি 'RS' বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যা হল হ্রাস (Reduse), এবং পুনব্যবহার উপযোগী করে তোলা (Recycle)। এগুলি করা দরকার বর্জ্যের ধ্বংস বা সঠিক সংরক্ষণের পূর্ব।

১) কাঁচামালের ব্যবহার কমাতে হবে।

২) বর্জ্যবস্তুর পুর্নব্যবহার দরকার।

৩) বস্তুকে পুর্নব্যবহার যোগ্য করে তোলা দরকার।

বর্জের খারিজ বা বাতিলের ক্ষেত্রে নিমোক্ত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে :

১) নীচু জমি ভরাট করার কাজে ব্যবহার করা যায়।

২) কম্পোষ্ট সার তৈরী করা যায়।

৩) বর্জ্য বস্তুকে উচ্চতাপে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা যায়।

## ৩.২.১. দূষণ রোধে ব্যাক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা :

পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য প্রত্যেকের ব্যাক্তিগত ভূমিকা উদ্যোগই হল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি প্রত্যেকে ধারাবাহিকভাবে তাদের অবদান রাখে তবে তার সুপ্রভাব কেবললমাত্র যে সেই সম্প্রদায়, শহর রাজ্য বা জাতীয় স্তরে দেখা যাবে তাই নয় বরং আন্তর্জাতিক বা বিশ্বদরবারে দেখা যাবে কারণ পরিবেশের কোনো সীমারেখা নেই।

মানুষ জাতি হিসাবে এটা আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য যে আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করা ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা কারণ, আমরাই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি। এছাড়া পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া অন্যান্য প্রজাতিকে সহায়তা করা। মকানুষকে তার নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটু প্রচেষ্টাই সারা বিশ্বে বিশ্বজনীন, কাজ হোক আঞ্চলিক"

প্রত্যেক মানুষকে ব্যাক্তিগত স্তরে তার জীবনধারা পরিবতর্নের মধ্য দিয়ে পরিবেশের দূষণ কমানো সম্ভব। যেটি সম্ভব নিম্নের কয়েকটি বিষয়কে মাথায় রাখলেই -

১) দূষণ নিয়ন্ত্রণের থেকে দূষণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশী সাহায্য করে।

২) পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যের বহুল ব্যবহার।

৩) CFC এর ব্যবহার কমাতে হবে কারণ এটি ওজোন স্তরকে নষ্ট করছে।

টিপ্পনী

Polystyrene Cups এর ব্যবহার না করা কারণ এতে CFC আছে যা ওজোনস্তরকে নষ্ট করছে।

৪) কম্পিউটার এর চিপ ও যন্ত্রাংশ পরিষ্কার এর কাজে CFC এর পরিবর্তে সেই সমস্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিত যা plum ho peach গাছ থেকে উৎপন্ন।

৫) CFC বিহীন ঠান্ডার যন্ত্র ব্যবহার করা দরকার।

উৎপাদনকারী সংস্থা ও প্রক্রিয়াকে আরো উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা পরিবেশকে দূষিত না করতে পারে।।

বায়ুদূষণকে আটকানো যেতে পারে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জ্বালানী তেল ব্যবহার করে, যেমন - হাইড্রোজেন জ্বালানি। এটি এমন একটি বিষয় যা জলে তড়িৎ চালনার দ্বারা তৈরী হয় না । যারফলে পরিবেশ দূষিত হতে পারে । তাই এখন সৌর হাইড্রোজেন জ্বালানি প্রয়োজন।

দূষণকে আটকাতে এলে প্রত্যেককে যে সমস্ত বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন সেগুলি হল :

১) জীবাশ্ম জ্বালানী, বিশেষত কয়লা ও তেল এর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

২) প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যুৎ এর ব্যবহার করে নষ্ট না করা । কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্বারা তৈরী হওয়া পরিবেশ দূষণকে আটকানো।

৩) পুর্ননবীকরনযোগ্য শক্তির উৎসগুলিকে প্রচার ও তার ব্যবহার বাড়াতে হবে।

৪) শক্তির ক্ষমতার প্রসার দরকার যা শক্তির অপচয় রোধ করবে বা কমাতে সাহায্য করবে।

৫) পুর্নব্যবহার যোগ্য ও পুনঃ উৎপাদন এর বিষয়টির প্রচার দরকার যা বর্জ্যের পরিমাণ কমাবে।

৬) গন পরিবহন ব্যবস্থার ব্যবহার করা । বিশেষত স্থানীয় জায়গায় যাবার জন্য সাইকেল বা পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো।

৭) অটো মোবাইলের ব্যবহার কমানো।

৮) বিশেষ প্রয়োজনে কীটনাশকের পরিমিত ব্যবহার।

৯) পুনরায় রিচার্জ করা যাবে এমন ব্যাটারির ব্যবহার করতে হবে। যা ধাতু দূষণ কমাতে সাহায্য করবে।

১০) সম্ভব হলে কম বিপদযুক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার করা।

টিপ্পনী

১১) একটি উৎপাদকন প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদিত কঠিন বর্জ্য অন্য কোনো কেন্দ্রের কাঁচামাল হিসাবে অণ্য পদ্ধতিতে ব্যবহার হলে।

১২) ভূগর্ভস্থ জল বা নর্দমায় কোনো কীটনাশক, রং, তেল, সহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ফেলা চলবে না।

১৩) প্রাত্যহিক কাজে প্রয়োজনানুসারে পরিমিত জলের ব্যবহার।

১৪) বৃক্ষরোপন বাড়াতে হবে তবেই গাছ বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করে বিশুদ্ধ বাতাস তৈরী করবে।

১৫) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবেই দ্রব্যের চাহিদার নিয়ন্ত্রণ হবে।

## অনুশীলনী :

১. পরিবেশ কি ?

২. দূষণ কি ?

৩. কিছু প্রাথমিক দূষকের নাম কর।

৪. অম্লবৃষ্টি কি ?

৫. জলদূষণ কি ?

## ৩.৩. পরিবেশগত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং বিধিসমূহ :

এই অংশে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন যা পরিবেশ সম্পর্কিত তা নিয়ে আলোচনা করব। যেমন - বায়ু, জল ইত্যাদি।

## ৩.৩.১. পরিবেশ সুরক্ষা আইন :

১৯৮৬ সালের ১৯ই মে নভেম্বর এই আইনটি কার্যকর হয়। এই আইন সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রসারিত। পরিবেশ সম্পর্কিত বেশ কিছু শর্ত যা এই আইনে বর্ণিত আছ তা হল নিম্নরূপ -

১) পরিবেশ বলতে জল, বায়ু ও ভূমি এদের আরও সম্পর্ককে বোঝায় যা মানবজীবন সহ অন্যান্য জীবন্ত প্রজাতির, সম্পত্তির মধ্যে বিরাজ করছে।

২) পরিবেশগত দূষণ বলতে বোঝায় যেকোনো রকম কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের উপস্থিতি তা দ্রবীভূত অবস্থায় হতেও পারে যা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক।

৩) বিপদযুক্ত বস্তু বা পদার্থ বলতে বোঝায় সেই সমস্ত পদার্থ বা প্রস্তুতিকরণকে যা ধেকে তৈরী হয় মনো-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য যা আমাদের মানবজাতি সহ অন্যান্য

জীবকূল ও পরিবেশের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত।

বর্জ্যবস্তুকে উচ্চতাপে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা যায়। এই আইন বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় যাতে তারা পরিবেশকে রক্ষা ও উন্নত করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিতে পারে, যাতে রাজ্য সরকার ও সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে। এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের মূল কাজগুলি হল :

ক) বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও কারণে ব্যবহৃত জল, বায়ু ও মাটির গুণগত মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

খ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রবীভূত করণের জন্য বিভিন্ন পরিবেশগত দূষকের মিশ্রণের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া।

গ) বিপদযুক্ত বস্তু বা পদার্থের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার পদ্ধতি ও নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা।

ঘ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপদযুক্ত পদার্থের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ও নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া।

ঙ) শিল্পস্থাপনের অঞ্চল, তার প্রতিস্থাপন ও উৎপাদন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা সুনিশ্চিত করা।

চ) দুর্ঘটনা নিবারনের উপায়, পদ্ধতি ও নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা যা পরিবেশগত দূষণের সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া পরবর্তীকালে ঘটে যাওয়া সেই দুর্ঘটনা থেকে মুক্তির উপায় নিশ্চিত করা।

এই আইনের মোতাবেক কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থা বা আধিকারিককে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে সে নির্দিষ্ট তদন্তের ক্ষমতা, নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতাসহ ইত্যাদি পেতে পারে।

এই সংক্রান্ত পরিবেশ (সংরক্ষণ) বিধি, ১৯৮৬ এর তপসিল I - IV ধারা অনুসারে নির্দিষ্টভাবে পরিবেশের গুণমান রক্ষা করার জন্য দূষিত বা বর্জ্য পদার্থের সর্ব্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে বা যে সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা লঙ্ঘন করনে আইন অমাণ্যকারীর শস্তির বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

তবে এই নির্দিষ্ট মাত্রা শিল্প কারখানা অনুযায়ী এবং নির্গমনের সংস্থান, মাধ্যমের ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

## ৩.৩.২. বায়ু (সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন :

এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

১) এটি বায়ুদূষণের নিবারণ, নিয়ন্ত্রণ ও উপশম এর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

২) বায়ুদূষণ বলতে বোঝানো হয়েছে বায়ুতে এমন কিছু কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তুর (কোলাহল সহ) উপস্থিতি যা বায়ুমন্ডলে উপস্থিত থেকে মানুষ জীবকূল, উদ্ভিদ সহ পরিবেশে অনান্য জীবও বস্তুর প্রতি ক্ষতিকারক সমস্যার সৃষ্টি করে।

৩) শব্দদূষণ বিষয়টিও ১৯৮৭ সালের আইনের মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে।

৪) কেন্দ্রীয়স্তরে বা রাজ্যস্তরে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ হল একমাত্র অণুমোদিত সংস্থা যে এই আইন বলবত করতে পারে। জল (দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণ) আইনের সাথে সমান্তরাল ক্রিয়া কর্মের মতো এই পর্ষদও একই কাজ করতে থাকে যাতে বায়ুর গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ রক্ষিত হয়।

এই পর্ষদ উক্ত আইনের অণুচ্ছেদ ১৭ অনুসারে কোনো শিল্প সংস্থা বায়ুদূষণ সৃষ্টি, নিগ্যমণের সীমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইন ও বিধি মানছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক নজর রাখতে পারবে। তাদের পর্যবেষিত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করবে শিল্পের পরবর্তী অনুমোদন পাওয়ার বিষয়টি।

৫) জল আইনের মতোই বায়ু আইনের ক্ষেত্রেও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সাংবিধানিকভাবে সেই ক্ষমতা ও কাজ দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা তহবিল, হিসাব, আর্থিক হিসাব পেশ, জরিমানা সহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৬) আইনের অনুচ্ছেদ ২০ অনুসারে অটো মোবাইল এর দূষণ নির্গমণের মাত্রা নির্দিষ্ট করা আছে। এর উপর নির্ভর করে অর্থাৎ মোটর ভেহিক্যাল আইন, ১৯৩৯ মোতাবেক রাজ্য সরকারের সেই ক্ষমতা আছে তে যে মোটর ভেহিক্যাল সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন নির্দেশ দিতে পারে যা তারা মানতে বাধ্য।

৭) অনুচ্ছেদ ১৯ অনুসারে, রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সাথে আলোচনা করে রাজ্য সরকার তার রাজ্যের কোনো স্থানকে। 'বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রিত এলাকা' বলে চিহ্নিত করতে পারে। যেখানে অনুমোদিত জ্বালানি ছাড়া অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহারের (দূষণ সৃষ্টিকারী) ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেও পারি। ফলে কোনো ব্যাক্তি রাজ্য পর্ষদের পূর্ব অনুমতি ছাড়া সেই নির্দিষ্ট 'বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রিত এলাকা'য় কোনো প্রকার শিল্পস্থাপন করতে পারবে না।

জল ও বায়ু আইনে বেশ কিছু আবেদনের বিধান বা ব্যবস্থা রাখা আছে। জল আইনের অনুচ্ছেদ ২৮ এবং বায়ু দূষণের অনুচ্ছেদ ৩১ অনুসারে এই ধরনের আবেদনের বন্দোবস্ত রাখা আছে। এই আবেদনের জন্য যে কমিটি তা এক বা তিনজনের দ্বারা গঠন করবে রাজ্য সরকারের প্রধান অর্থাৎ রাজ্যপাল। আবেদনের সারমর্ম ও আলোচনা শুনে ৩০ টি কার্যদিবসের মধ্যে কোনো নির্দেশনামা জারি

করতে পারে, যা রাজ্য পর্ষদের দ্বারা নিষ্পত্তি ও প্রতিফলিত অনুসৃত হবে।

উক্ত আইন ও নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য ব্যাক্তি বা সংস্থার মালিককে প্রথমে এক মাসের জেল, ২০০০ টাকা জরিমানা বা দুটি শাস্তি একসাথে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আবার দ্বিতীয়বার একই অপরাধের জন্য দুই মাসের জেল, ৫০০০ টাকা জরিমানা বা দুটি শাস্তি একসাথে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

## ৩.৩.৩. জল (দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণ) আইণ :

টিপ্পনী

এটি জলকে বিভিন্ন দূষণের হাত থেকে সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ প্রদাণ করে সুবন্দোবস্ত করে। জলের সঙ্গে কোন অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলে যদি ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে জলের সেই খারাপ অবস্থাকে জলদূষণ বলে।

এই আইনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি যেগুলি অনুমোদিত সেগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হল -

১) ভূগর্ভস্থ জল এবং ভূত্বকের সমস্ত জলের গূণগত মানের পুনরুদ্ধার ও সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

২) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যপর্ষদ গঠন করা প্রয়োজন দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য।

৩) দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিনিধিত্বের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে জলদূষণ এবং নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ, সংযোগ এবং দক্ষতাগত সাহায্য করার সংস্থান থাকবে।

৪) এই আইন অনুসারে কেন্দ্র এবং রাজ্যদুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হাতে তহবিল, কাজেই, অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশ করার বিধান থাকবে।

৫) এই আইন অনুসারে আইন লঙ্ঘণকারীদের জন্য সমস্তরকম জরিমানা এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদই হল মূল নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যারা নিম্নলিখিত দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি পালন করা নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী :

**কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (Central Pollution control Board, CPCB):**

এই পর্ষদের কাজ হল -

১) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

টিপ্পনী

২) রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদেরএবং বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দক্ষতামূলক সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া।

৩) দূষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নিবারণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

৪) দূষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাগুলি জনমানসে প্রচারের জন্য বিভিন্ন সহযোগী অনুষ্ঠানে আয়োজন করা।

৫) দূষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করা।

৬) খালবিল এবং বাণিজ্যিকভাবে দূষণের সুবন্দোবস্ত জন্য পুস্তিকা (নির্দেশনামা) তৈরী করা।

৭) জলের গুণগত পরিমাপমাত্রা হ্রাস করা।

৮) দূষণ হ্রাস অথবা নিয়ন্ত্রণ এবং নিবারণের জন্য জাতীয় স্তরে বিভিন্ন কর্মসূচীর পরিকল্পণা করা।

৯) জল, নর্দমার ময়লা বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন অনুমোদিত পরীক্ষাগারে স্থাপন করা।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এ তত্ত্বাবোধনে ও অনুমোদনে রাজ্যস্তরে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একই কাজ করে থাকে এবং তা রাজ্যস্তরে প্রয়োগ করে থাকে।

১) রাজ্যের যেকোনো স্থানের কোনো শিল্পসংস্থা যদি দূষণ সৃষ্টি করে বা তার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে সে বিষয়ে পর্ষদ রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দান করে থাকে।

২) প্রবাহমানতার গুণমান হ্রাস করে এবং নদী, কুয়া ও বাণিজ্য প্রবাহ ও খাল - নর্দমা যেগুলি কারখানার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকে।

৩) গুণগত মাত্রার মান কমানোর ক্ষেত্রে রাজ্যপর্ষদ আইনের সহায়তা নেয় ও নমুনা সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া মেনে। এই নমুনা সংগ্রহ করা হয় সরকারী আধিকারিক এবং যান্ত্রিক পক্ষের উপস্থিতিতে দুই ভাগে, সীল ও স্বাক্ষর সহ । তারপর তা বিশ্লেষণের জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। যদি পরীক্ষার পর দেখা যায় যে, সেই নমুনা জলের নুণ্যতম গুনমান মাত্রা অতিক্রম করতে না পারে তাহলে সেই কারখান / শিল্পের অনুমোদন বাতিল করা হয়।

৪) প্রতিটি শিল্প সংস্থাকে পর্ষদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয় (যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) নির্দিষ্ট বয়ানে সমস্ত যান্ত্রিক তথ্য নির্দিষ্ট টাকা খরচ দিয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে।

৫) পর্ষদ অনুমতির দেওয়ার বর্জ্যের সদ্ব্যবহার, আচরণ ও সুষ্ঠ বিন্যাস বিষয়ে পরামর্শ দেয়।

সেই পর্ষদের হাতে আইনগত সমস্ত অধিকার, ক্ষমতা দেওয়া আছে যার

দ্বারা পর্ষদ য কোনো সংস্থা থেকে যেকোনো তথ্য, বাণিজ্যিক নমুনা, নতুন সংস্থার সংকোচন ও সম্প্রসারন আটকানো সহ তাকে অনুমোদন দেওয়া বা বাতিল করতে পারে।

যদিও উন্নয়ন প্রয়োজন, তব তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন দূষণকে নিয়ন্ত্রণ নিবারণ করা যা মানবজীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। ভূমি এবং জল দূষণ পরীক্ষার জন্য সমস্ত শিল্প সংস্থার আবশ্যিকভাবে আধুনিক কর্মক্ষম প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই আইনের কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে তা মেনে নিয়ে, জল আইনের বিধানগুলিকে প্রশস্ত করা হবেছে যাতে এর বিধির দ্বারা সঠিকভাবে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণ করা যায়।

যদি কেউ আইন না মানে তা হলে প্রথমবারের জন্য শাস্তি হিসাবে ৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) জরিমানা অথবা ছয় বছরের জন্য জেল হতে পারে আবার দুটো হতে পারে। একই অন্যায় আবার করলে শাস্তির জরিমানা ১০,০০০ টাকা এবং ছয় বছরের কারাদন্ড হতে পারে।

টিপ্পনী

## অনুশীলনী :

৬. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন কবে থেকে বলবৎ হয় ?

৭. জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইনের যেকোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

## ৩.৪. জলবায়ু পরিবর্তন এবং পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি : (গ্লোবাল ওয়ার্মিং)

এই অংশে আমরা জলবায়ুর পরিবর্তন এবং পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির বিষয়ে জানতে পারবো।

জলবায়ু পরিবর্তন :

জলবায়ু বলতে কোনো অঞ্চলের গড় আবহাওয়াকে বোঝায়। এটি মূলত কোনো এলাকা বা স্থানের সাধারণ আবহাওয়ার অবস্থা, ঋতু বৈচিত্র্য এবং আবহাওয়ার সর্বোচ্চ অবস্থাকে বোঝায়। এই রকম কোনো স্থানের দীর্ঘদিনের (কমপক্ষে ত্রিশ বছরের) গড় অবস্থাকে বোঝায়।

১৯৯০ এবং ১৯৯২ সালের Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCE) দ্বারা প্রকাশিত তথ্যে বা নথিতে বিগত দিনের জলবায়ুর পরিবর্তন, গ্রীণ হাউসের প্রভাব এবং বিশ্ব তাপমাত্রার সাম্প্রতিক পরিবর্তন সংক্রান্ত

টিপ্পনী

আলোচনা ও তথ্যে আছে। এটি পর্যবেক্ষণ করা গেছে যে পৃথিবীর আপমাত্রা ভূতাত্ত্বিক সময় অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিজ্ঞতা দ্বারা এটি পর্যবেক্ষিত যে এটি ঘটেছে জমাট বাঁধার অবস্থা থেকে অতি জমাট বাঁধার অবস্থার সময় পর্যন্ত। যদিও বর্তমান আন্তঃজমাট বাধার ১০,০০০ বছর সময়কালে, অর্থাৎ বিগত ১০০ - ২০০ বছর ধরে $0.51^{0}C$ হারে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। কৃষিকাজের এবং জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির জন্য গত একহাজার বছরের জলবায়ুর পারস্পারিক সহন স্থিতিশীল অবস্থায় বর্তমান। এমনকি জলবায়ুর সামান্যতম পরিবর্তন ও চাষাবাদকে প্রভাবিত করতে পারে। যারফলে জীবজন্তু সহ মানুষকেও স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করতে পারে।

মানবকেন্দ্রীয় ক্রিয়াকার্যের কারণে দুঃখজনকভাবে ভারসাম্যকে দুর্বল করে তোলে যা গড়ে উঠেছিল পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে। বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের গড় তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এর কারণে জলবায়ু সম্পর্কিত তাত্ত্বিক চক্রকে বিপর্যস্ত করে তুলছে যার ফলাফল স্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অতিবন্যা, খরা, সমুদ্র জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়া থেকে শুরু করে কৃষিতে উৎপাদনের হ্রাস, দুর্ভিক্ষ, সহ স্ট্রোকের কারণে মানুষের মৃত্যুও ঘটে চলেছে।

## পৃথিবীর উষ্ণতা বৃধি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং :

বায়ুমন্ডলে সর্বনিম্ন স্তরটি হল ট্রপোস্ফিয়ার ; যা প্রাকৃতিক উপায়ে কিছু গ্যাসীও পদার্থের উপস্থিতিতে উষ্ণতাকে ধরে রাখে। এই ঘটনাকে গ্রীণহাউস প্রভাব বলা হয়। গ্রীণহাউস শব্দটির অর্থ হল গাছপালার পরিচর্চার জন্য কাঁচের ঘর। যেখানে রোদ অবাধে প্রবেশ করে তাপমাত্রায় বাড়ায়, তেমনি পৃথিবীকে বিশাল কাঁচের ঘরের মত ঘিরে রেখেছে বায়ুমন্ডল। সৌরশক্তি এই বায়ুমন্ডলের ভিতর দিয়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় এবং পুনরায় মহাশূন্যে ফিরে যাবার সময় কিছুটা তাপশক্তি বায়ূমন্ডলে আবদ্ধ হয়। ফলে বায়ুমন্ডলে গড় তাপমাত্রা বাড়ে। বায়ুমন্ডলে মূলত যে গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলি দেখত পাওয়া যায় সেগুলি হল কার্বণ-ডাই-অক্সাইড, ওজোন, মিথেল, নাইট্রাস অক্সাইড এবং জলীয়বাষ্প। বায়ুমন্ডলে এগুলির ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আর এই ঘটনাকে বলা হয় গ্রীন হাউস প্রভাব বলে।

বিশ্বের গড় তাপমাত্রা হল $15^{0}C$। গ্রীণ হাউস গ্যাসের উপস্থিতিতে এই তাপমাত্রা হতে পারে $48^{0}C$। তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রীণ হাউস প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে $33^{0}C$।

বায়ুমন্ডলে গ্রীণহাউস গ্যাসগুলির দ্বারা তাপমাত্রাকে আটকে রাখার কারণে আমাদের গ্রহ অনেকটা নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় থেকে আমদের মত অন্যান্য জীবজগতকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। দুটি আদিপত্যশীল গ্রীন হাউস গ্যাস হল জলীয়বাষ্প, যে জলতাত্ত্বিক চক্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অণ্যটি হল কার্বন - ডাই - অক্সাইড । যেটি আবার বিশ্ব কার্বণ চক্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । যদিও আবহমন্ডলে জলীয়বাষ্পের স্তর তুলনামূলকভাবে এখনও নির্দিষ্ট, কিন্তু কার্বন-ডাই অক্সাইডের স্তর ক্রমে বেড়াই চলেছে।

টিপ্পনী

অন্যান্য গ্যাস যেমন মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড যেগুলির মাত্রা বৃদ্ধি পায় মূলত মানবীয় ক্রিয়াকর্মের কারণে । নিয়মিত গাছ কাটার ফলে গাছের স্বাভাবিক সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় । যারজন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যায় । বিগত দশকে আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে, মাত্র $2^0C$ তাপমাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণে যে উষ্ণ বা শীতল অবস্থার সৃষ্টি হয় । যার কারণে মানুষ সহ বাস্তুতন্ত্রের জীব বৈচিত্র্যের উপর প্রভাব পড়ে । এমনকি খরা, সমুদ্র জলস্তর গড় বৃদ্ধির জন্য বন্যার কারণে বেশ কিছু অঞ্চল অবসবাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

### গ্রীন হাউস গ্যাসগুলি :

যে ঘটনাটি পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বেশী ভাবাছে তা হল নৃতাত্ত্বিক কাজকর্ম, যেখানে দেখা যাচ্ছে বাতাসে এই গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আবার সৌরশক্তি যা বায়ু মন্ডলের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছানোর পর আবার অবহেলিত শক্তিরূপে (Infrared Energy) মহাশূন্যে দিয়ে যাবার সময় সেই তাপীয় শক্তিকে শোষণ করে। যার ফল স্বরূপ বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে । গ্রীণ হাউস গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনাকে গ্রীণহাউস প্রভাব বলে।

তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবী নিজে একটি গ্রীণ হাউস। এই গ্রহ নিজে তার স্বাভাবিক 'গ্রীণ হাউস' প্রভাবিত হয়েছে বলেই এখানে জীবমন্ডলে উদ্ভব হয়েছে। পৃথিবীর স্বাভাবিক 'গ্রীণ আউস' অবস্থানটি যদি না থাকত, তাহলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হত প্রায় $23^0C$ যা, জীবজগতের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($Co_2$), ওজন ($O_3$), কার্বন মনোক্সাইড (CO), মিথেন ($CH_4$) নাইট্রাস অক্সাইড ($N_2O$) প্রভৃতি গ্যাসগুলিকে মূলত গ্রীণ হাউস গ্যাস বলে । বায়ু মন্ডলের এগুলির উপস্থিতির ফলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে।

টিপ্পনী

গ্রীণহাউস এফেক্টের বৃদ্ধির প্রভাব :

গ্রীণ হাউস এফেক্টের বৃদ্ধির ফলে যে কেবল বিশ্ব উত্তরায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংই ঘটে তাই নয় এছাড়া অন্যান্য জলবায়ুগত এবং প্রাকৃতিক বিষয়গুলির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। যেমন -

**(১) বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি :**

এখনও পর্যন্ত যে আরে 'গ্রীণ আউস গ্যাসগুলির নিঃসরণ চলছে তাতে এটি মনে করা হচ্ছে যে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫ থেকে ৫.৫ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে।

**(২) সমুদ্র জলস্তর বৃদ্ধি :**

বিশ্বতাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রের জলও বাড়ছে। এছাড়া তাপমাত্রা বাড়ার ফলে মেরুপ্রদেশের বরফ ও হিমাবাহগুলি গলে গিয়ে সমুদ্রের জলের সাথে মিশছে। বর্তমান হিসাব যা বলছে তাতে বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা যে হারে বাড়ছে অর্থাৎ $3^{0}C$ তাতে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের জলস্তর আগামী ৫০ - ১০০ বছরে প্রায় ০.২ থেকে ১.৫ মিটার বেড়ে যাবে।

একমিটার সমুদ্র জলস্তর বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত শহর একটু নীচু স্থানে অবস্থিত যেমন, সাংহাই, কায়রো, ব্যাংকক, সিড়নি, হামবার্গ এবং ভেনিস এমনকি কিছু নীচুস্থানে অবস্থিত চাষযোগ্য জমি এবং ভারত, চীন, বাংলাদেশ, ইজিপ্টের ব-দ্বীপগুলি ও জলের নীচে চলে যাবে। এর প্রভাব শস্য উৎপাদনেও পড়বে। এই বিষয়টির কুপ্রভাব পড়বে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বেশকিছু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যেমন - ডিম ছাড়ার জায়গা, উপহ্রদ, মোহনা ও প্রবাল, ডুবো পাহাড় এর মতো জায়গাকে ঝড় এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ভারতের লাক্ষাদ্বীপ দ্বীপটির সর্বোচ্চ মাত্র ৪ মিটার উচ্চতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বর্তমান যা আবার ভঙ্গুর, মুম্বাই এর মতো শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে গেলে বেশ শক্ত বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন।

এই সমুদ্র জলস্তর বৃদ্ধি পেলে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে যারা এই সমস্ত নদী যেমন - গঙ্গা, নীল, মেকং, মিশিসিপি এর ব-দ্বীপে বসবাস করছে।

**(৩) মানবজীবনে প্রভাব :**

এই বিশ্ব উষ্ণায়ন বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টির ধারাবাহিকতাকে পরিবর্তন করে দেবে, যার ফলে বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত রোগ যেমন - ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ও গোদের প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে।

বর্তমানে যে সমস্ত জায়গা এখনও ম্যালেরিয়ার মতো রোগের থেকে বাইরে

আছে সে সমস্ত জায়গাও এই সমস্ত রোগের বাহকদের আদর্শ প্রজনন স্থান হয়ে উঠবে। এই ভাবে চলতে থাকলে এর প্রভাব পড়তে পারে ইথিতপিয়া, কেনিয়া ও ইন্দোনেশিয়া নামক দেশগুলিতে। ইষদউষ্ণ তাপমাত্রা এবং অতিরিক্ত জল জমার স্থানই হল মশা, শামুক ও অন্যান্য ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গের আদর্শ - প্রজনন যেগুলি হল বিভিন্ন ভয়াবহ রোগের বাহক।

উচ্চ তাপমাত্রা ও স্যাঁতস্যাতে অবস্থা চর্মরোগ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যার সৃষ্টি করে।

**(৪) কৃষিকাজের উপর প্রভাব :**

কৃষিকাজের বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। যেগুলি দেখায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত অঞ্চলের খাদ্যশস্যের উপর এর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বর্তমান। মহাদেশীয় এবং উপমহাদেশীয় অঞ্চলগুলিই বেশী প্রভাবিত হয় এই উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে। এমনকি $2^{0}C$ তাপমাত্রায় বৃদ্ধিই শস্যের জন্য ক্ষতিকারক যথেষ্টভাবে। মাটির নমনীয়তা হ্রাস এবং জলীয়বাষ্প বেড়ে যাওয়ায় তা ধান, গম, ভুট্টার মতো শস্য উৎপাদনে সমস্যা সৃষ্টি করে।

তাপমাত্রা ও আদ্রতা বেড়ে যাওয়ায় ক্ষতিকারক নাশক পোকার বৃদ্ধি ও বেড়ে যায় যা বিভিন্ন রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। এমনও দেখা যায় যে এদের বৃদ্ধি শস্য বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। এই পরিবর্তনের পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতে গেলে, খরা মোকাবিলা, তাপমাত্রা, পোকা - মাকড় এর প্রতিবন্ধী হিসাবে বিভন্ন প্রকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াতে হবে।

**বিশ্বউষ্ণায়ন এর নেতিবাচক প্রভাব কমানো :**

বিশ্ব উষ্ণায়ন এর মাত্রা কমানোর জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১)জীবাশ্ম জ্বালানী ও CFCs এর ব্যবহারের পরিমাপ ব্যাপক হারে কমানো।

২) শক্তির পরিমিত ব্যবহার।

৩) পুনঃ উৎপাদনশীল শক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

৪) খনিজ কয়লা থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারে বাড়ানো।

৫) মিথেন গ্যাসকে জ্বালানি হিসাবে বন্দী ও ব্যবহার করা।

৬) বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনের জন্য পরমাণু শক্তিকেন্দ্রের ব্যবহার।

৭) দীর্ঘস্থায়ী কৃষিকাজের গ্রহণ করা।

৮) জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে পরিমিত করে ভারসাম্য আনা।

টিপ্পনী

৯) $CO_2$ নির্গমন করে এমন প্রত্যক্ষ উৎসের পরিমাণ কমানো।

১০) অনেক বেশী গাছ লাগানো দরকার।

১১) অতিরিক্ত সালোকসংশ্লেষ সক্ষম এমন অ্যালগির দ্বারা পরিবেশ $CO_2$ এর পরিমাণ কমানো।

টিপ্পনী

## ৩.৪.১. বৃষ্টি এবং পাতিত জমির পুনঃরোদ্ধার :

সালফারের অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র শিল্প কারখানা জাত প্রক্রিয়াকরন থেকে এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনই অ্যাসিড প্রস্তুতকারী গ্যাসের প্রধানতম উৎস। অ্যাসিড় প্রস্তুতকারী গ্যাসগুলি অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয় বহুদিন ধরে এবং যার পরবর্তী দল হিসাবে এটি প্রায় হাজার কিলোমিটার চলার উপযোগী হয়ে ওঠে। বাতাসে এই গ্যাসগুলি সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইত্রিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড নির্গত হয়। এটি হল অ্যাসিড বৃষ্টির অন্যতম কারণ।

বায়ুদূষণের ফলে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। প্রধানতঃ কলকারখানা, যানবাহন, ধাতু নিষ্কাশন চুল্লী থেকে নির্গত গ্যাস ওধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি জমা হয় । এই রাসায়নিক পদার্থগুলি ভাসমান জলকণার সাথে বিক্রিয়া করে বৃষ্টি, শিশির, তুষারের মাথ্যমে পৃথিবীতে আসে । এভাবেই অ্যাসিড বৃষ্টি হয় এই জলে অম্লতার পরিমান (pH) ৫.৬ বা তার কম।

**অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাব :**

অ্যাসিড বৃষ্টিতে অম্লতার পরিমাণ যদি ৫.১ এর কম হয় তবে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি হতে পারে। যদিও এই ক্ষতি দেখা যায় pH যখন ৫.৫ এর নীচে নেমে আসে তখন থেকেই।

**অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য পরিবেশের উপর প্রভাব :**

(১) অ্যাসিড বৃষ্টি পরিবেশের ক্ষতি করে। কারণ অ্যসিড বৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ দরকার দুটি রাসায়নিক পদার্থ, যেমন একটি সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অন্যটি নাইট্রিক অ্যাসিড। এই দুটি রাসায়নিকই বায়ুকে দূষিত করে ল সে কারণে বিজ্ঞানীরা এদের "প্রাথমিক বায়ুদূষক" বলেছেন।

(২) অ্যাসিড মিশ্রিত বৃষ্টির জল পুকুর, হ্রদ, জলাশয়ের জলকেও অম্ল করে তোলে। ফলে মাছ, পোকা - মাকড, শৈবাল মারা যায়। মাছের ডিম পাড়ার ক্ষমতা কমে যায়।

(৩) অ্যাসিড জলের প্রভাবে হ্রদ, নদী, পুকুরের শৈবাল, পোকামাকড়, মাছ ইত্যাদি মারা যাওয়ার ফলে ঐ জায়গায় বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয়। খাদ্য-শৃঙ্খল ভেঙে পড়ে। জল

দূষিত হয়।

(৪) গাছপালার উপর অ্যাসিড বৃষ্টি হলে গাছের ক্ষতি হয়। যেমন - গাছের পাতা ঝলসে যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়। ফলে সালোকসংশ্লেষ বিঘ্নিত হয়। গাছের উচ্চতা কমে যায়। অঙ্কুরোদগম বাধা পায়। কাষ্ঠ শিল্পের জন্য কাঠের যোগান কমে যায়।

(৫) অ্যাসিড বৃষ্টি মাটিকে দূষিত করে। মাটির উর্বরতা কমে যায়।

(৬) অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে মার্বেল দিয়ে তৈরী স্ট্যাচু বা অন্যান্য স্মারক, অট্টালিকা, প্রাসাদ এবং ধাতু নির্মিত সেতু, কলকারখানা ইত্যাদিরও বিশেষ ক্ষতি হয়। যেমন , বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, মথুরা তৈল শোধনাগার থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ অ্যাসিড বৃষ্টির মাধ্যমে আগ্রার তাজমহলের ক্ষতি করছে।

(৭) অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য জীবজন্তু ও মানুষের ত্বক ও কোষের ক্ষতি হয়।

**অ্যাসিড বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ :**

(১) বাতাসে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের যোগান অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র থেকে এদের নির্গমনের পরিমাণ কমাতে হবে। তবেই অ্যসিড বৃষ্টির আশঙ্কা কমবে।

(২) জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমাতে হবে।

(৩) ধাতু নিষ্কাশন চুল্লী থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস ও ধোঁওয়াকে পরিশ্রুত করতে হবে। এছাড়া যানবাহনের ইঞ্জিনকে উন্নত করতে হবে।

**পতিত জমি পুনরুদ্ধার :**

অর্থনৈতিকভাবে অনুৎপাদনশীল জমি যেগুলি পরিবেশগত অবমূল্যায়নএর ফলে বর্তমানে পতিত জমি বলে পরিচিত। এই পতিত জমির মধ্যে মূলত লবণাক্ত জমি, বালুকাময় জমি, উঁচু ঢেউ খেলানো জমি, অনুর্বর পাহাড়ী এলাকা ইত্যাদি গুলিই অন্তর্ভুক্ত। শৈত দ্বারা আবৃত অঞ্চল, জমাট বাঁধা তুষার অঞ্চল, ধান চাষ করা যোগ্য এমন পতিত অঞ্চল। আমাদের দেশের ভৌগলিক অঞ্চলের অর্ধেকের বেশী (প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন হেক্তর) এই পাতিত জমি হিসাবে পড়ে আছে। এই বিষয়টি আমাদের মতো দেশের যার জনসংখ্যা বিশ্বের ৬ ভাগের ১ ভাগ, তাদের সামনে কতটা সমস্যা হিসাবে পড়ে আছে।

আমদের দেশের সবথেকে বেশী জমি পতিত হিসাবে চিহ্নিত আছে সেরকম রাজ্য হল রাজ্যস্থান (৩৬ মিলিয়ন হেক্টর )। তারপর যথাক্রমে স্থান মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ। হরিয়ানার মতো রাজ্যে সমগ্র জমির প্রায় ৮.৪ শতাংশ পতিত জমি হিসাবে আবৃত যা আবার খনিজ, বালি ও অন্যান্য আকরিক দ্বারা সমৃদ্ধ।

টিপ্পনী

এই পতিত জমিগুলি তৈরী হয় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উঁচু জমি, তুষারবৃত্ত জমি, উপকূলবর্তী নোনা অঞ্চল এবং বালুকাময় অঞ্চল দ্বারা অথবা মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া পতিত জমি।

পতিত জমি পুনরুদ্ধারকরন প্রক্রিয়া :

আমাদের দেশে পতিত জমি পুনরুদ্ধার এবং তর উন্নতি সাধনাই হল পতিত জমি উন্নয় পর্ষদের প্রাথমিক লক্ষ্য, যারা নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে কাজ করছে।

(১) জমির বাহ্যিক গঠন ও প্রান্তিক মাটির গুণগত মান উন্নত করা।

(২) ঐ সমস্ত জমির সেচের জন্য উন্নত জল পরিষেবার বন্দোবস্ত করা।

(৩) বন্যা ও ধ্বস থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৪) ভবিষ্যতের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য জমির জৈবিক উপাদান গুলিকে সংরক্ষণ করে রাখে।

## অনুশীলনী :

৮. গ্রীণ হাউস এফেক্ট কি ?

৯. কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রীণ হাউস গ্যাসের নাম করো।

## ৩.৫. জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জলসংগ্রহ, জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা :

জল এমনই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনের দুলর্ভ্য উৎস যা আবশ্যিকভাবে সংরক্ষনের প্রয়োজন । এই জল সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

**(১) পড়ে থাকা (গড়ানো) জল বৃদ্ধি পাওয়া :**

মাটিতে পড়ে পড়ে অনেক জল নষ্ট হয় কারণ তার কোন কাজে লাগানো হয় না। তবে এটিকে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার, মাটির নীচে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে এই জল নষ্টের পরিমাণ কমবে। সীমাসূচক চাষ, বাড়ীর ছাদে চাষাবাদ, জলসিঞ্চন, রাসায়নিক চিকিৎসা এবং উন্নতমানের জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারাই এমন লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

**(ক) সীমারেখাসূচক চাষ :**ছোট ছোট জমিতে এবং সেতুবন্ধ করে বৃষ্টির জলকে ধরে রাখতে হবে এবং বেশী সময় তাকে চাষাবাদের উপযোগী করে রাখতে হবে। ছাদগুলিকেও এই ব্যবস্থার উপযোগী করে তুলতে হবে।

**(খ) জলছাদ দ্বারা সংরক্ষণ :** পড়ে থাকা জলকে নির্দিষ্ট কাঠামোর দ্বারা জলছাদের আকারে সংরক্ষণ করতে হবে।

**(গ)** বিভিন্ন কৃত্রিমশালা তৈরী করে জলকে সেই চ্যানেল দ্বারা প্রবাহিত করাতে হবে। এর দ্বারা প্রবাহিত জলকে আমরা ইচ্ছামত সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবো।

**(ঘ) ভেজানো সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ :** সাধারণ মাটিতে এই রাসায়নিক মেশানোর ফলে সেই মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

**(ঙ)** বিভিন্ন রাসায়নিক সহযোগী যেমন জিপসাম মেশানোর পর মাটির উর্বরতা ও জলধারণ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। যাতে জল গড়ীয়ে নষ্ট হবে না। এরকমই অন্য একটি সহযোগী রাসায়নিক হলো HPAN।

**(চ)** চাষীদের ব্যাক্তিগত উদ্যোগ গড়ে ওঠা বিভিন্ন কাঠামো যেমন পুকুর, গভীরগর্ত বা খাল যা জলকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

**(২) বাষ্পীকরণের জন্য জলের অপচয় কমানো :**

এটি খুবই উপযোগী স্যাঁতস্যাঁতে প্রবণ অঞ্চলের জন্য। তবেই অনুভূমিক অঞ্চলের মাটির নীচের জলস্তরকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং শস্য উৎপাদন ৩০ - ৪০ শতাংশ বাঁনো যাবে। এই ব্যবস্থা খুবই উপযোগী বেলেমাটি অঞ্চলের জন্য কিন্তু কাদামটি যুক্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে ততটা প্রয়োজনীয় নয়।

শ্বেতসারযুক্ত একধরনের পলিমার আছে যা অত্যন্ত প্রতিহতকারী যার নাম 'Super Slumper" যেতি নিজের ওজনের প্রায় 1400 গুন পর্যন্ত বেশী জল শোষণ করতে পারে। এই ধরণের রাসায়নিক খুঁজে পাওয়া যায় যা বেলেমাটি অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

**(৩) মাটির মধ্যে জল মজুত করা :**

স্যাঁতস্যাঁতে অঞ্চলে গাছের মূলের গোড়ায় (গভীরে) জল জমিয়ে রাখে যেটি প্রয়োজনের সময় যোগান দেয়। এর দ্বারা বছরের কোন এক ঋতুতে অতিরিক্ত জল অণ্য বছরে বা অন্য ঋতুতেও ব্যবহার করা যায় যা শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

**(৪) সেচের জন্য জল অপচয় কমানো :**

(ক) ক্যানেল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট মাত্রার জলক ব্যবহার করতে হবে।

(খ) সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল খুব সকালে বা বিকালে, সন্ধ্যাতে সরবরাহ করলে তা বাষ্প আকারে নষ্ট হতে পারবে না।

(গ) সিঞ্চন পদ্ধতিতে বা ফোঁটার  ঝারন পদ্ধতিতে জল সেচকাজে প্রয়োগ করলে

টিপ্পনী

৩০ - ৫০ শতাংশ জল অপচয় বন্ধ হয়।

(ঘ) একই শস্যের চচাষ বারবার না করে বিভিন্ন প্রজাতির শস্য চাস করলে জল অপচয় বন্ধ হয়। এছাড়া এমন শস্যের চাষ করতে হবে যারজন্য জল কম লাগে।

**(৫) জলের পুনঃব্যবহার :**

পানীয় জলকে পানের জন্য ছাড়া অণ্য কাজে ব্যবহার না করলে আমরা পানীয় জলকে অপচয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারি। যেমন : হাতধোওয়া, স্নান করা, বাসন মাজা, গাড়ী ধোয়া ইত্যাদি।

**(৬) জল অপচয় নিয়ন্ত্রণ :**

এটি শুধুমাত্র সম্ভব বাড়ীতে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী স্থান গুলিতে।

(ক) ব্যবহার হওয়ার পরে নলটি ঠিকমতো বন্ধ করা।

(খ) জলবাহিত পাইপের কোন জায়গার ছিদ্রগুলি নিয়মিত সারানো।

(গ) টয়লেটের প্রয়োজনে পরিমিত জলের ব্যবহার।

**(৭) জলের মিটার বসানো :**

জল ব্যবহার কারীজরা যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ব্যবহার করে তার জন্য মিটার নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন । অর্থাৎ বেশী প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার করলে তাকে অতিরিক্ত বিল দিতে হবে। যেটি জলের পরিমিত ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে।

**বৃষ্টির জল সংরক্ষণ :**

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ হল এমন একটি প্রযুক্তিগত কৌশল যা ভূগর্ভস্থ জলের স্তরকে ভারসাম্য রক্ষা করে। বিভিন্ন জলাধার নির্মাণ, গভীর কুঁয়ো তৈরীর মধ্য দিয়ে এই বিশেষ প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করা হয় । বৃষ্টির জল মাটিতে স্পর্শ করার আগেই সংরক্ষণ করে তাতে দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বিষয়টি কেবলমাত্র পাহাড়ী বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলই নয় বরং অন্যান্য অঞ্চলেও প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০০ মিলিমিটার যদিও বেশীরভাগটাই সংগঠিত হয় বর্ষাকালে (জুন - সেপ্টেম্বর)। এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, চেরাপুঞ্জি যা দ্বিতীয় বৃহত্তম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল (১১০০ মিমি) হওয়া সত্ত্বেও জলকষ্ট দেখা যায়। কারণ এ সমস্ত অঞ্চলের বৃষ্টির সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ফলে সমস্ত জলই মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়। যদি এখানে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা

যেত তাহলে ঐ অঞ্চলে জলকষ্টের কোন সমস্যাই দেখা যেত না।

**বৃষ্টির জলসংরক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ :**

(১) মাটিতে পড়ে অপচয় হওয়া জলের পরিমাণ কমানো।

(২) রাস্তায় জল জমতে না দেওয়া।

(৩) জলের চাহিদা অনুযায়ি তার জোগানের ভারসাম্য বজায়।

(৪) ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা (রিচার্জ)।

(৫) ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ কমানো।

(৬) সারাবছর (সমস্ত ঋতুতে) জলের সরবরাহ বজায় রাখা।

যে কারোর পক্ষে নিম্নলিখিত পদ্ধতির দ্বারা বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করা সম্ভব -

(১) মাটির উপরে বা নীচে জলাধার তৈরী করে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা।

(২) ছোট গর্ত, কুঁয়োখনন, উপহ্রদ সৃষ্টি, নয়নজলি, ছোট নদী সৃষ্টি করা।

(৩) ভূগর্ভস্থ জল এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োগের আগে সেখানকার মাটির বৈশিষ্ট্য, আয়তন, বৃষ্টিপাতের ধরণ, অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা অত্যন্ত জরুরি।

**বৃষ্টির জল সংগ্রহের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি :**

ভারতবর্ষে উচ্চ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলগুলিতে পুরোনো পদ্ধতি মেনে ছাদের জলকে ট্যাঙ্কে সংগ্রহ করা হত। পাহাড়ে পাদদেশ গুলিতে বিভিন্ন প্রস্রবন এবং ঝর্ণাগুলি থেকে জল সংগ্রহ করে রাখা হত বিভিন্ন বাঁধ বা ভেড়ির মাধ্যমে। হিমালয়ের পাদদেশগুলিতে লোকেরা প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলি থেকে জল সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন হিসাবে বাঁশকে ব্যবহার করত। রাজস্থানে 'টঙ্কাস' (মাটির নীচের জলাধার) এবং 'খাদিনস' (খানাখন্দ বা বাঁধ) এর দ্বারাই বৃষ্টির জলকে সংগ্রহ করা হত। আমাদের প্রাচীন সময়ে আমরা তালাবস্ (Taalaabs), বাওয়ারিস, জোহারস, হাউজ ইত্যাদিকে পর্যাপ্ত জল সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক নগর, গ্রাম এবং রাজধানীগুলিতে ব্যবহার করা হত শুকনো অঞ্চলে প্রয়োজনের সময় জল সরবরাহের জন্য।

**বৃষ্টির জল সংগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি :**

শুকনো এবং অর্ধেক শুকনো অঞ্চলগুলিতে, কৃত্রিমভাবে ভূগর্ভস্থ জলের ভারসাম্য (Water recharging) বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন শ্যালো গঠন করা হত। জল অনুপ্রবেশনের জন্য। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৃষ্টির জল নদীতে সরবরাহের জন্য জলাধার নির্মাণ করা হত পাথর, গাছপালা, ভাঙা পাথর ইত্যাদির দ্বারা। রাজেন্দ্র সিং

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যিনি রাজস্থানে Water Man নামে পরিচিত তিনি এ ধরনের জলাধার তৈরী করে বৃষ্টির জলকে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের মতো প্রশংসা যোগ্য কাজ করে দেখিয়েছেন। যারফলে তিনি ম্যাগসাই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

এই ধরনের ড্যাম বা জলাধারগুলি মূলত মাটির নীচে হওয়ায় জল অনেকদিন ধরে সংরক্ষিত ধাকে কারণ বিভিন্ন কারণে জল জলীয়বাষ্প আকারে উবে যাওয়ার মত কোন ভয় থাকে না।

ছাদের বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা শহুরে বাড়ীগুলির ক্ষেত্রে খুবই কম খরচে সাপেক্ষ এবং লাভজনক পদ্ধতি। কারণ এই জল ছাদে জমা হবার পর তা সরবরাহের পাইপের দ্বারা বাড়ীর বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ভূগর্ভস্থ জল হিসাবে জমা রেখে তা পরে হ্যান্ড পাম্পের দ্বারা তুলে প্রয়োজন মেটাতে পারে।

**জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা :**

মূল নদী থেকে উৎপত্তি হওয়া একটি অঞ্চল, যাকে নদী অববাহিকা বলে এরকম অনেকগুলি নদী অববাহিকার দ্বারা তার কেন্দ্রস্থলে কয়েক হাজার কিলোমিটার অশ জুড়ে হয় জল বিভাজিকা,যা বিভিন্ন নদী থেকে জল গড়ীয়ে এসে জলাধারের ন্যায় সংগৃহিত হয় । সংগ্রহের পথ অনেকগুলি থাকলেও এই জল বিভাজিকা গুলি থেকে জল বেরোনোর রাস্তা মাত্র একটি। এই জল বিভাজিকা গুলি মাটি, ভূপৃষ্টের বৈশিষ্ট্য এবং জল সবার একটি জটিল সংমিশ্রণ যেখানে মানুষ এবং বণ্য জীবজন্তুরাই হল অবিচ্ছেদ্য অংশ যারা একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই জল বিভাজিকাগুলি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ধারাবাহিক খাদ্য উৎপাদন, সেচের জন্য জল সরবরাহ, শক্তি উৎপাদন, যাতাযাত সহ মৃত্তিকাক্ষয় রোধ, গাছপালা বৃদ্ধি, বন্যা এবং করা প্রভৃতি মোকাবিলার কাজে।

১৯৪৯ সালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) এর দ্বারা প্রথম সুসংহত জল বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি ব্যবহার করা হয় । পরবর্তীকালে এই প্রকল্পটি মৌলিক কার্যকারী একক হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালণ করতে থাকে।

**জলবিভাজিকার পতন :**

অনিয়ন্ত্রিত, অপরিকল্পিত এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে ভূমির ব্যবহার করে কাজ করার ফলে জল বিভাজিকাগুলি বিভিন্ন সময়ে পতনের সম্মুখিন হয়েছে। এছাড়াও বৃক্ষছেদন, খনন, ইমারতি কারবার, শিল্পায়ন, স্থানান্তর চাষ, প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম দাবানল, মাটির ধ্বংস এবং স্থানীয় মানুষজনদের দ্বারা এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতাই

হল এই পতনের মুখ্য কারণ।

**জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য :**

ভূমির এবং জলের যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন যা প্রাকৃতিক সম্পদে সর্বনিম্ন ক্ষতি করে, যা জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা নামে পরিচিত। জল বিভাজিকার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) ভূমির সঠিক ব্যবহার দ্বারা জলবিভাজিকা গড়ে তোলার ফলে মাটির ধ্বস এবং আদ্রতা বজায় রাখা সম্ভব যা কৃষকদের উন্নত উৎপাদন নিশ্চিত করে।

(২) জলবিভাজিকার ফলে বাড়ীতে জলের সরবরাহ, সেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সহ বিভিন্ন সহযোগী উন্নতিগুলি পরিলক্ষিত হয়।

(৩) বন্যা, খরা এবং ভূমির ধ্বসের মত সংকটজনক পরিস্থিতি মাত্রাকে কমিয়ে দেয়।

(৪) গ্রামীন অঞ্চলে পরিষ্কার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

**জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার অনুশীলন :**

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এই জল বিভাজিকা ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে একটি জাতীয় নীতি তৈরী করা হয়েছিল। এই জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার প্রকল্পটির উন্নয়ন নির্ভর করে বিভিন্ন সম্পদের পর্যাপ্ত সরবরাহের ওপর।

ভূমি এবং জলের উন্নতির এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় মানুষদের দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে। এই ব্যবস্থাপনার সঠিক রূপায়নের জন্য সঠিক পরিমাণে নীচের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

**১. জল সংগ্রহ :**

শুকনো সময়ে কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে জলের প্রয়োজন মেটাতে জলের সঠিক সংগ্রহের প্রয়োজন। এটি বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

**২. বনসৃজন এবং কৃষি বনায়ন :**

এই জলবিভাজিকাগুলির উন্নয়নের জন্য বনসৃজন এবং শস্যরোপন একটি বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা ভূমিধ্বসকে রক্ষা করে এবং মাটির আদ্রতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে কাষ্ঠল গাছগুলি বেড়ে ওঠা শস্য গাছের মাঝে মাঝে। যা গড়িয়ে যাওয়া জলের পরিমাণকে হ্রাস করে। দেরাদুনে ইউক্যালিপোটাস, লিউসিয়ানা গাছগুলি এবং চারিসোপোজন এর মতন

টিপ্পনী

ঘাসগুলি এগুলি বেড়ে ওঠে ভুট্টা এবং গম গাছের সাথে উদ্দেশ্যপূরণের জন্য। কাষ্ঠল গাছগুলি সফলভাবে বেড়ে ওঠে কৃষি বনায়ন পরিকল্পনার মতন। যারমধ্যে অন্তর্গত শেশাম, টেক এবং কেকার মাধ্যমে। যেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে যমুনা নদীর জলবিভাজিকার অঞ্চলে।

**৩. মাটির ক্ষয় কমানোর জন্য এবং গড়ীয়ে যাওয়ার জলের পরিমাণ কমানোর জন্য ব্যবহৃত যান্ত্রিক পদ্ধতি :**

বিশেষ করে জল বিভাজিকা অঞ্চলের ধাপগুলিতে ভূমিধ্বস এবং জল গড়িয়ে ফসল তোলার মত বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয়। দেরাদুন এবং শিবালিক এর মত জায়গায় ভূমিধ্বস এবং গড়িয়ে পড়ার জল কমানোর জন্য Bunding নামক পদ্ধতিটি খুবই ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

**৪. পাথর অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক খনন :**

অবৈজ্ঞানিকভবে পাথুরে অঞ্চল খনন করার ফলে ভূমি বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার ফলস্বরূপ ভূমিধ্বস নিয়মিত ধ্বস দেখা যায়। এসমস্ত অঞ্চলে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে কমপক্ষে এক মিটার অন্তর জলের উৎস নেই এমন জায়গা খনন করা। এছাড়া বিভিন্ন গাছ রোপন করা উচিৎ যেগুলি মাটিকে ধরে রাখতে সাহায্য করবে এবং জলের উৎসকেও সঠিকভাবে বজায় রেখে পরোক্ষভাবে জলবিভাজিকার প্রকল্পকে সাহায্য করবে।

**৫. জনপ্রতিনিধিত্ব :**

যেকোন জলবিভাজিকার ব্যবস্থাপনার প্রকল্পগুলি যেগুলি বিশেষত ভূমি এবং জল সংরক্ষণ সমন্ধীয় সেগুলি সফলতার পিছনে সাধারণ চাষী বা কৃষক এবং উপজাতি সহ জনসাধারণের অংশগ্রহণ মূল চাবিকাঠি। তাদের সহযোগিতা এবং অংশগ্রহনই এগুলিকে সাফল্য এনে দেয়। অনেকক্ষেত্রে সরকার প্রত্যক্ষভাবে, আবার অনেক সময় সরকার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) গুলির দ্বারা স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণের কাজটি কিছু সাহায্যের বিনিময়ে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করিয়ে থাকে।

স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধমেই হরিয়ানার সুখ মাজারি পাঞ্চখুলা অঞ্চলে জলবিভাজিকার প্রকল্পটির সাফল্য পেয়েছে। হিমালয়ের সংলগ্ন অঞ্চলে এতকাল অবধি সবথেকে গুরুত্ব পেয়েছে এই জলবিভাজিকার সংক্রান্ত পরিকল্পনাটি।

## অনুশীলন :

১০) জল সংরক্ষণের জন্য গৃহীত হয়েছে এমন দুটি পদ্ধতির নাম কর।

১১) বৃষ্টির জল সংগ্রহ বিষয়টি কি ?

১২) সুসংহত জল বিভাজিকার ব্যবস্থাপনাটি প্রথম কখন গৃহীত হয় ?

## Vermicomposting :- এর সংজ্ঞা, Vermicomposting জীব এবং এর গুরুত্ব :

টিপ্পনী

Vermicomposting হল মৃত্তিকার গুণগত মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে কীটপতঙ্গের জৈব অংশ বিশেষ প্রক্রিয়ায় জৈব মিশ্রণে পরিণত করণ। USD এদর প্রদত্ত নির্দেশাবলী (২০০২ সালের ২১শে অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া) অনুযায়ী Varmicompost হল "An organic matter of plant and / or animal organ consisting mainly of finely divided earthworm castings, produced non-thermophilically with bio-axidat on and stabilization of the organic material, due to interacting between aerobic microorganism and earthworm, as the materials pass through the earthworm gut."

সঠিক তাপমাত্রায় সঠিক প্রজাতির কেঁচোকে Vermicomposting প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে মিশ্রণ করতে পারলে উন্নতমানের মিশ্রসারে তৈরী করা সম্ভব। বিভিন্ন Engyme এর ক্রিয়া ও কেঁচোকে যত ভালোভাবে মন্ডক বানিয়ে মিশ্রণ ঘটানো যায় ততভালো মিশ্রসার প্রস্তুত করা যায়। কেঁচোরা যেহেতু অত্যন্ত অধিক পরিমানে খাদ্য গ্রহণ করে তাই স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্নভাবেই বিভিন্ন জৈব খাদ্য গ্রহণের সময় তার একটা অংশে মল, মূত্র ত্যাগের মধ্য দিয়ে মাটিতেই যোগ করে। যা Vermicaiting নামে পরিচিত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে খুব উন্নতমানের সার হিসেবে কাজ করে। এই Vermicompost উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দিয়ে বৃদ্ধিকে তবান্বিত করার সাথে সাথে মৃত্তিকা কাঠামোর গুণগত মান উন্নত করে এবং তার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধতি করে। এই Vermicompost (জৈব মিশ্রসার) ব্যবহৃত মাটিতে যে ফুল, ফল, শাকসব্জি ইত্যাদির ফলন হয় তার গুণগত মানও উন্নত হয়। বর্তমানে কেঁচোকে ব্যবহার করে এই জৈব মিশ্রসার উৎপাদনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যাক্তি ভীষণ উৎসাহ দেখাচ্ছে। এই জৈব মিশ্রসার তৈরী করার খরচ যেহেতু কেজিপ্রতি মাত্র ২টাকা করে ও কম তাই কেজি পিছু ৪ - ৪.৫০ টাকা করে বিক্রি

টিপ্পনী

করলেও তা ভীষণ লাভজনক হয়।

**প্রক্রিয়া :**

কেঁচো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে জৈবসার উৎপাদন হয় তার সাথে গোবর ও বিভিন্ন শষ্যের উচ্ছিষ্ট বর্জ্য মিশ্রনের মধ্য দিয়ে তৈরি এই মিশ্র জৈব একটি গর্তের মধ্যে রাখা হয়। এই গর্তগুলিকে জলমগ্ন রাখা হয় যাতে করে কেঁচোগুলি মারা যায়। দ্রুতগতিতে এই প্রক্রিয়া চালানোর জন্য প্রায় ৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রাখা হয় । এভাবে যে জৈব যৌগ তৈরি হয় তাকে Vermicompost বলে । যা কেঁচোগুলির জৈব পদার্থ খেয়ে তৈরি করে। সাধারণত ০.৯ থেকে ১.৫ মিটার চওড়া ও .২৫ - .৩ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ইটের তৈরি ছাওনিতে প্রক্রিয়ায় এই পদার্থ তৈরি হয় । যা চারদিকে খোলা থাকে । বাণিজ্যিকভাবে এই পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই কাঠামোটি ১৫ সে. মি. লম্বা ১.৫ মিটার চওড়া ও ০.৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে । তবে এই কাঠামোর দৈর্ঘ্য সুবিধামতো পরিবর্তন করে নির্মিত হলেও প্রস্থ ও উচ্চতা অপরিবর্তিত রাখতে হয় কারণ, তা পরিবর্তণ করলে এই মিশ্রণটি নির্মাণ প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। কারণ এর দ্বারা উষ্ণতা পরিবর্তিত হয়।

গোবর ও চাষবাসের বর্জ্য একই স্থানে রেখে ০.৬ - ০.৯ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট স্তূপ তৈরি করা হয় । সাধারণত প্রতি ঘনমিটার আকারের প্রায় ১কেজি কেঁচো (সংখ্যায় প্রায় সাড়ে তিনশোটি) এই স্তূপে দেওয়া হয় । এই স্তূপটিকে জল ছিটিয়ে প্রায় ৪০ - ৫০ আর্দ্র করা হয় এবং এর তাপমাত্রা সাধারণত ২০ - ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করা হয়।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যখন এই Vermicompsot তৈরি করা হয় তখন প্রথমে পণ্যটি উৎপাদন যথেষ্ট পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় । প্রায় প্রতিটন Vermicompost উৎপাদনে ৫০০০ - ৬০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এটি তৈরি করতে কাঁচামালের যা খরচ হয় তার সাথে কাঁচামাল পরিবহনের খরচও যুক্ত হয়। পণ্যটি প্রস্তুত হওয়ার পর বাণিজ্যকরণের জন্য পরিবহন খরচ বাড়াতে থাকে।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই Vermicomposting প্রস্তুত নিয়ন্ত্রিত খরচার মধ্যেই হয়ে থাকে। Lunit - Vermocompost প্রস্তুতে যে উপাদানগুলি প্রয়োজন হয় সেগুলি হল -

**কেঁচো :** - ভারতের প্রায় ৩৫০ প্রজাতির কেঁচোর মধ্যে Eisenia Fetida, Elidrilus Eugeniae এবং Perionyx Excavatus ইত্যাদি প্রজাতির কেঁচো এই জৈব সার উৎপাদনে উপযোগী। Epigeic প্রজাতির কেঁচো সাধারণত এই স্তূপের

উপরিভাগের ছোটো ছোটো অবস্থান করে । আবার Anccis প্রজাতির কেঁচো মধ্যভাগের গর্তে এবং Endogeic প্রজাতির কেঁচো গভীর স্তরে অবস্থান করে।

যেকোন ধরনের জৈব যৌগেই এই কেঁচোগুলি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, এবং Vermicomposting সাধারণত সেইসব জায়গাগুলিতেই সব থেকে ভালো হয় যেখানে প্রচুর পরিমাণে জৈব উচ্ছিষ্ট বর্তমান থাকে । ছয় সপ্তাহ পর যখন কেঁচোগুলি প্রজননক্ষম হয় তখন প্রতি সাত-দশ দিন অন্তর ডিম পাড়ে এইভাবে কেঁচোর - সংখ্যা দ্রুত গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের আয়ু সাধারণত দুইবছর। প্রতি ডিম পিছু তিন সাতটি কেঁচো জন্মায় । পূর্ণাঙ্গ কেঁচোগুলিকে পৃথক করে শুকিয়ে নেওয়া হয় (ওভেনে), যা Wormmeal নামে পরিচিত। এটি হল উচ্চ প্রোটিনযুক্ত (70%) পশুখাদ্য।

**অবস্থান (Location) :** সাধারণত কৃষিনির্ভর, গ্রাম্য এলাকা, ছোটশহর যা আধা শহুরে গ্রামগুলিকে Vermicompost প্রস্তুতির সবথেকে ভালো স্থান বলে ধরে নেওয়া হয়, কারণ এগুলিতে কাঁচামালের প্রাচুর্য ওও তার বাজারিকরণের সুযোগ থাকে । যেহেতু এই পণ্যটি ফল, শাকসব্জি ও শস্য উৎপাদনে সবধেকে বেশি উপযোগী তাই গ্রাম্য এলাকায় ফুল, ফল, শাকসব্জি ইত্যাদির চাষ যেখানে বেশি সেখানেই এটা তৈরী করা হয়। আবার সাথে সাথে যদি সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচুর গবাদি পশু থাকে তাহলেও সস্তায় কাঁচামাল যোগানের ক্ষেত্রে (গোবর) বেশি সুবিধা হয়।

**একটি বাণিজ্যিক এককের উপাদান সমূহ :** Vermicompost উৎপাদনের এলাকাটি সাধারণতঃ যেখানে গোবরের প্রাচুর্য থাকে সেখানেই তৈরী করা উচিৎ। যেখানে গোবরের আমদানির ওপর উৎপাদন নির্ভর করে সেখানে Vermicompost তৈরীর কারখানা না করায় শ্রেয়। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভিত্তি করেই এর উৎপাদনের কারখানা ঠিক করা উচিৎ।

**চালা (Shed) :** Vermicomposting প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল Shed বা চালা। এই চালা বা ছাদগুলি সাধারণত বাঁশের খুঁটি সিমেন্টের খুঁটি , ঢালাই পিলার ইত্যাদির ওপর দাড়িয়ে থাকে । স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ছাদ বা HDPF Sheet দিয়েও এই ছাদ বা চালা নির্মাণ করা হয়। এতে খরচা ও কম হয়। তবে এই চালার চার প্রান্ত অবশ্যই খোলা রাখতে হয়।

**কেঁচোর স্তূপ :** সাধারণত কেঁচোরস্তূপ গুলি ০.৩ মিটার থেকে ০.৬ মিতার উচ্চতা বীশিষ্ট হয়। এর উচ্চতা নির্ভর করে জলের নিকাশি ব্যবস্থা পর্যাপ্ততার ওপর। এই Vermibed তৈরী করার সময় অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সমউচ্চতা ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সমগভীরতার বিষয়টি দেখতে হয়। সাধারণত Vermibed তৈরী করার সময় অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সমউচ্চতা ও সমগভীরতার বিষয়টি দেখতে হয় । সাধারণত Vermibed এর প্রস্থ ১.৫ মিটারের বেশি হওয়া উচিৎ নয় । কারণ খুব বেশি বড়ো হললে Bed টির মাঝখানে নাগাল পাওয়া যাবে না।

**ভূমি (Land) :** একটি Vermicutture Producction এর জন্য প্রায় ০.৫ - ০.৬ একর স্থান প্রয়োজন, যাতে করে এর ভিতরে ৬ থেকে ৮ টি চালা বা ছাদ তৈরী করা যায় । এর মধ্যেই একটি গভীর কূপ বা পাম্পসেটের ব্যবস্থা করা দরকার জলের প্রয়োজনে। সংশ্লিষ্ট ভূমিটি দশ থেকে পনেরো বছরের চুক্তি নিতে হবে।

**কাঠামো (Building) :** ব্যবসায়িক স্বার্থে Vermicomposting উৎপাদনের জন্য এটির প্রস্তুতির কারকানা, অফিসঘর ও গুদাম ঘর নির্মাণ করা প্রয়োজন, যাতে করে কর্মী ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে কাঁচামাল সংরক্ষণ ও উৎপপাদিত পণ্যর রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

**বীজ মজুত (Shed Stock) :** এটি ব্যয়বহুল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদিও ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কেঁচোর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবুই তার জন্য এতদিন অপেক্ষা করা কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। এক ঘনমিটার স্তূপ পিছু ১কেজি কেঁচো হলেই উৎপাদনের কাজ শুরু করা যায়।

**বেড়ানির্মাণ ও পথ :** কাঠামো নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় পথ নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরদ্বারা সহজে চাকা বিশিষ্ট ছোট ট্রলি ইত্যাদির যোগাযোগ সহজ হয় যাতে করে কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত Vemicompost সহজে আনা - নেওয়া করা যায়। সমগ্র এলাকাটি বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা প্রয়োজন যাতে করে কোনো পশু যেমন - ছাগল, গরু, ভেড়া ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে। রাস্তা নির্মাণ ও বেড়া নির্মাণের জন্য খরচা বৃদ্ধি হলেও এগুলি ভালো Vermicompost প্রস্তুতির জন্য আবশ্যক।

**জলের যোগান :** যেহেতু এই পণ্যটি উৎপাদনের জন্য সর্বদা প্রচুর জল প্রয়োজন। তাই প্রচুর জলের যোগানের ব্যবস্থা রাখতে হবে । এই উদ্দেশ্যে এই কারখানা স্থাপনের বিষয়টিও ব্যায় সাপেক্ষ । তবে সাময়িকভাবে বেশি খরচা হলেও দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে তা ব্যায় সংকুলানই করবে।

**যন্ত্রপাতি :** কাঁচামাল কেটে টুকরো টুকরো করে পণ্য বোঝায় ও খালি করা। জৈব যৌগ জোগাড় করণ ইত্যাদি নানা কাজের জন্য প্রস্তুতিতে বেশকিছু যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।

**পরিবহণ :** Vermicomposting এর প্রস্তুতিতে পরিবহন হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

উপাদান। যদি উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে কাঁচামালের উৎস দূরবর্তী স্থানে হয় তাহলে পরিবহনের জন্য খরচা করতেই হয়। যদি বাৎসরিক ১০০০ (একহাজার) টন পণ্য উৎপাদনের জন্য একটি বৃহৎ আকৃতির কারখানা তৈরি করা হয় তাহলে প্রয়োজনীয় পরিবহনের জন্য অন্তত তিন (৩) টন পরিবহন ক্ষম তিনটি মিনি ট্রাক প্রয়োজন। তবে উৎপাদন ক্ষেত্র ও কাঁচামালের উৎস কাছাকাছি হলে, বিশেষত ছোটো ট্রলির সাহায্যে পরিবহন করা সম্ভব হলে খরচ অনেক কমে যায়।

**আসবাব :** কারখানা নির্মাণ, অফিস ঘর নির্মাণ ইত্যাদির জন্য যে আসবাব প্রয়োজন তাতেও উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকে।

**আর্থিক দিক :**

আর্থিক দিক এর দুটি বিষয় রয়েছে। যথা -

**লাভ :**

এটা মনে করা হয় যে, প্রথম বছরে দুই - তিনবার পরবর্তী বছরগুলিতে ৬৫ - ৭০ দিন পিছু ৫-৬ বার Vermieoposting প্রস্তুত করা হয়। আবার বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকে মাথায় রেখেও একথা বলা যায় সমগ্র কারখানার পূর্ণ ব্যবহার প্রথম বছরে ৫০% এবং পরবর্তী বছরগুলিতে সর্বাধিক ৯০% পর্যন্ত করা যায়। প্রথম বছর প্রতি মেট্রিক টন ৪৫০০ টাকা করে এবং প্রতি কেজি কেঁচোতে ২০০ টাকা করে আয় হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে এই আয় বার্ষিক ৬, ৪৮, ০০০ টাকা করে হয়।

**প্রকল্পের ব্যায় :**

Vermicomposting এর উৎপাদন বছরে 10 MT (মেট্রিকটন) থেকে শুরু করে 1000 TPA পর্যন্ত করা যেতে পারে। যেহেতু Vermi-bed (খেঁচোর গোবরস্তূপ) এর আকারের আনুপাতিক হারে উৎপাদনের মাত্রা নির্ভর করে সেহেতু কম পরিমাপের ও কম আকারের প্রকল্প দিয়ে ব্যবসা শুরু করা উচিৎ এবং পরে অভিজ্ঞতা লাভের সাথে সাথে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হুৎপাদন বৃদ্ধি করা যাতে পারে।

৩২৪ ঘনমিটার মাপের Vermibed এ, যার মধ্যে সাধারণত ১৫ মিটার লম্বা ও ১.৫ মিটার প্রশস্ত এবং ০.৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ২৪ টি স্তূপ থাকবে, এমন মাপের স্তূপে বছরে ৬ বার মোট 200 TPA পন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে, যার প্রতিবার প্রস্তুতিতে ৬৫ থেকে ৭০ দিন করে সময় লাগে।

কাঁচামাল, কেঁচো, যন্ত্রপাতি, কার্যসম্পাদনহেতু খরচ ইত্যাদির খরচের একটা খসড়া Annexure - II ও Annexure - III এ দেখানো হয়েছে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

Annexure - III - এ পণ্য উৎপাদনের খরচ ও লাভ দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে Investment খরচ ১৩, ৫০, ০০০ টাকা কর্মসম্পাদনের খরচ ও ৩, ৪২, ০০০ টাকা এবং দুটি পর্যায়ের কর্মসম্পাদনে খরচ হল ১, ২৪, ৮০০ টাকা।

**লাভ :**

বর্তমান মডেল অনুযায়ী এই ব্যবসার লাভ হল প্রায় ২৫%, যা প্রায় ৩.৩৭৫ লাখ এর সমান।

**ব্যাঙ্ক ঋণ :**

ব্যাঙ্ক থেকে ৭৫% ঋণ পাওয়া যেতে পারে, যার মূল্য হল ১০.১২৫ লাখ টাকা।

**সুদের হার :**

RBI এর নির্দেশাবলী অনুযাবী ব্যাঙ্কগুলি সময় সময় সুদের হারের পরিমাণ ঠিক করে থাকে। যদিও সুদের আর ১৩% থেকে ১৫% হারে ধাকে তথাপি প্রকল্পটি বাস্তবিক দিক উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে এর হার সাধারণত ১৩% করা হয়ে থাকে।

**নিরাপত্তা :**

ব্যাঙ্কগুলি RBI এর নির্দেশনামা অনুযায়ী চালিত হয়।

**অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ :**

Annexure - IV এ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে। এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই বিষয়টি বস্তবায়নযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নির্দেশক নিম্নে দেখানো হল -

NPV : Rs 7.621 Lakh, BCR : 1.23 : 1, IRR : 34%

**ঋণ পরিশোধ :**

অর্থের যোগান অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের মান ও তালিকা Anexure - V এ দেখানো হয়েছে। সমগ্র ঋণ ৬ বছর সময় কালের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

## অনুশীলনী :

১৩. Vermicompost বলতে কী বোঝ ?

১৪. Vermicompost উপাদান ক্ষত্র তৈরী করার আদর্শ স্থান কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় ?

## ৩.৭. ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমিকা :

এই অংশে আমরা বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং ত্রিপুরা রাজ্যদূষণ নিয়ন্তরণ পর্ষদ (TSPCB) এর ভূমিকা নিবে আলোচনা করব।

## ৩.৭.১. বিপর্যয় মোকাবিলা : বন্যা এবং ভূমিকম্প :

টিপ্পনী

ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যেমন, ভূমিকম্প, ভলক্যানো বা আগ্নেয়াগিরি, বন্যা এবং ভূমিধ্বস এর মত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির ফলেই আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে আমরা বসবাস করছি। এই প্রকৃতি বেশকিছু সময় তার সর্বনাশা প্রভাব বিস্তার করে মানব প্রজাতির উপর। মানব সমাজ এই সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় গুলিকে বিভিন্ন সময় প্রত্যক্ষ করে এবং চেষ্টা করে প্রকৃতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে।

গুজরাট রাজ্যের ভূজ নামক শহরে এমনই এক বিভৎস বিপর্যয় নেমে এসেছিল ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে যা শহরটিকে তছনছ করে দিয়েছিল । এই ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের জলের স্রোতের সৃষ্টি হয় সুনামী নামে আর এক বিপর্যয়, যা ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল তামিলনাড়ু এবং কেরালার উপকূলের বেশকিছু অঞ্চলে।

### প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ সমূহ :

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়। তার বেশকিছু নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) মানবসৃষ্ট কিছু ক্রিয়াকর্ম যেমন, বড় জলাধারের পিছনে যে হ্রদ তাতে বিশাল পরিমাণের জল আটকে রাখার ফল হিসাবে এই বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। যেমন, মহারাষ্ট্রের কয়না জলাধার তৈরীর ফলে বেশকিছু ছোট-বড় ভূমিকম্পের মতো ঘটনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল । এছাড়া ভূগর্ভে পরমাণু শক্তির পরীক্ষা (রাজস্থানের থর মরুভূমিতে পোখরাণ ২ আএর পরীক্ষা) এই ধরণের বিপর্যয়ের কারণ।

(২) হঠাৎ অতিবৃষ্ঠি অথবা তুষারপাত অনেক সময় অর্থনৈতিক লোকসান সহ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ অতিবৃষ্টি বা তুষারপাত দুটি মিলে পাহাড়ী নদীগুলিকে আরও বেশী হিংস্র করে তোলে।

(৩) পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ভূমির আলগা অংশগুলি অনেকক্ষেত্রে নীচের দিকে পড়ার সময় পাশাপাশি গাছপালা এবং জলকেও প্রভাবিত করে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জল দূষিত হয়ে পাথরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের মধ্যবর্তী জোড় ভেঙে দেয় যা পাহাড়ী অঞ্চলকে ভূমিধ্বস প্রবণ

টিপ্পনী

করে তোলে।

## ভূমিকম্প :

ভূমিকম্প হল এমনই একটি প্রাকৃতিক ঘটনা যা কোনরকম বিপদ ঘন্টা না বাজিয়েই আমাদের সামনে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়। খুব কম সময় স্থায়ী হলেও তা পৃধিবীকে উল্টেপাল্টে দিয়ে তছনছ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মূলত পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন লিথোস্পেরিক প্লেটগুলি স্থান পরিবর্তনের সময় যে চাপ অভ্যন্তরে নির্গত হয় তার মুক্তির ফলশ্রুতি হল ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর মানুষের জীবনহানি, সম্পদহানি সহ ভূপৃষ্ঠে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।

**ভারতের পক্ষে ভূমিকম্প একটি আতঙ্ক :**

ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দীয়ে বড়ছে বিভিন্ন রকম অবৈজ্ঞানিকভাবে গড়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতার মত অট্টালিকার মত কাঠামো। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বহুতল বিলাস বহুল আবাসন, বৃহৎ এবং বিপুল কারখানা, দানবসম মল, সুপারমার্কেট, যেগুলি ভারতবর্ষকে একটি অতি সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অনেক আগেই আমাদের সাবধান করেছে - যে হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন অঞ্চলে যে হারে ভৌগলিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাতে মানুষের জীবন এবং সম্পত্তিহানি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এটা বলা যায় না যে, কোন একটি জায়গায় অর্থাৎ হিমালয়ের একটি অঞ্চলে ভূমিকম্প ঘটে তার ওপর অঞ্চলে তার প্রভাব পড়বে না। খুব সম্প্রতি আমরা দেখেছি হিমালয়ের নীচের প্রসারিত অঞ্চলেও ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছে। কোয়েনা ভূমিকম্প যেটি ঘটেছিল ১৯৬৭ সালে যা সিস্‌মিক্ আঞ্চলিক ম্যাপকে পুনঃগঠিত বা পরিমার্জিত করতে বাধ্য করেছিল। ফলস্বরূপ সিস্‌মিক্ নয় এমন অঞ্চলও ম্যাপ থেকে বাদ চলে গিয়েছিল। কোয়েনার চারিপাশের অঞ্চলও ম্যাপ থেকে বাদ চলে গিয়েছিল। কোয়েনার চারিপাশের অঞ্চল মূলত সিস্‌মিক্ অঞ্চল - IV নামে পরিচিত যা উচ্চ সংকটপূর্ণ বলে তালিকাভুক্ত। আবার ১৯৯৩ সালে কিল্লারিতে ঘতে যাওয়া ভূমিকম্প এই সিস্‌মিক্ অঞ্চলের ম্যাপকে আরও একবার পরিমার্জিত করে, যা আগে কম সংকটের তালিকাভুক্ত (সিসমিক অঞ্চল - I) অঞ্চলের সথে সিসমিক অঞ্চল II মিশে যায় এবং পরিণত হয় মধ্য সংকটপূর্ণ অঞ্চলে। সাম্প্রতিকতম বিভিন্ন গবেষণার দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বলা যায় বিভিন্ন কম সংকটপ্রবণ অঞ্চলগুলি উচ্চ সংকটপ্রবণ অঞ্চলে বা এর বিপরীত অবস্থাতেও পরিণত হচ্ছে।

দেশের উত্তরপূর্ব অংশে প্রায়শই মাঝারি থেকে বড় ধরণের ভূমিকম্পর মত

ঘটনা দেখা যায় যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উপরের উল্লেখিত দুটি। ১৯৫০ সাল থেকে এ সমস্ত অঞ্চল গুলি বিভিন্ন মাঝারি ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। সার্বিক গড় হিসাবে বলা যায় যে সমস্ত অঞ্চলগুলি যে ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারমধ্যে ৬.০ এর বেশী তীব্রতাযুক্ত ভূমিকম্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবছরই এ সমস্ত অঞ্চলগুলিকে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মত অঞ্চলগুলিও আন্তঃদেশীয় সীমারেখার প্লেটের ঠিক উপরে অবস্থান করায় প্রায়শই বিভৎস ভূমিকম্পের সম্মুখিন হয়।

ভূমিকম্পের বেড়ে চলা ঝুঁকির বিস্তার বিভিন্নরকম নগরায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিশ্বায়নের মত কাজগুলির সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে ভারতবর্ষে অর্থনীতিকে আরও ভেঙ্গে দিচ্ছে। উচ্চ প্রযুক্তিযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরী হওয়ার ফলে পরবর্তী কালে তা মানুষের ব্যবহারের দ্বারা মাঝারি ধরনের কৃত্রিম ভূমিকম্পের সম্ভবনাকে ত্বরান্বিত করছে। যার ফলস্বরূপ আমরা শুধুমাত্র মানুষের জীবনহানিই নয় বরং তার বেশী কিছু হারিয়ে ফেলছি। একটি ভূমিকম্প একটি দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ভিত্তিকে কয়েক যুগ পিছিয়ে নিয়ে যায় যা ভরাট করতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যায় তাও আগের মতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বলা যায় দিল্লী, মুম্বাই, কোলকাতার মত মেঘাসিটি গুলি যদি ভূমিকম্পের কবলে পড়ে তাহলে তা দেশের ক্ষেত্রে চরম হতাশা নিয়ে আসবে।

## বন্যা :

ভারতবর্ষ হল একটি উচ্চ বন্যাপ্রবণ এলাকা। সমগ্র ভৌগলিক এরিয়া ৩২৯ মিলিয়ন হেক্টরস এর মধ্যে ৪০ মিলিয়ন হেক্টরই হল বন্যাপ্রবণ। বন্যা এমন একটি ঘটনা যা প্রাকৃতিকভাবে সংগঠিত হবে নদীর দুই পারকে জলমগ্ন করে। ফলে মানুষষের জীবনহানি, সম্পত্তিহানি সহ পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। বর্তমানে বন্যার কারণে ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। যদি আমরা ১৯৯৬ - ২০০৫ সাল পর্যন্ত গড় ক্ষতির হিসাব করি তাহলে দেখব যে, ১৯৯৬ সালে ক্ষতির মোট পরিমাণ ছিল যেখানে ১৮০৫ কোটি টাকা, সেখানে ২০০৫ সালে এই ক্ষতির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭৪৫ কোটি টাকা। বন্যা সংগঠিত হওয়ার পিছনে যে সমস্ত কারণগুলিকে দায়ী করা যেতে পারে তার মধ্যে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন এর লক্ষ্যে গড়ে ওঠা নগরায়ন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বন্যার কারণে প্রতিবছর গড়ে ৭৫ লক্ষ একর জমি বা ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৬০০ জীবনহানি হয় এবং শস্য নষ্ট হয়। এছাড়া বাড়ি এবং

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সাধারণের ব্যবহার্য পরিষেবা মিলিয়ে ১৮০৫ কোটি টাকা নষ্ট হয় এই বন্যার কারণে। সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ১৯৭৭ সালের বন্যার কারণে ১১৩১৬ জন মারা যাওয়াতে। দেখা গেছে, প্রতি ৫ বছরে একটি বড় ধরনের বন্যা সংগঠিত হয়।

বন্যা প্রবণ নয় এমন এলাকাতেও বন্যা দেখা দিচ্ছে। সরকারী ভাবে বিভিন্ন সতর্কবার্তা, নির্দেশাবলী দেওয়া হচ্ছে বন্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে । জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ বর্ষার সময় ৮৫ শতাংশ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে থাকে। এই সময় নদীগুলি অত্যাধিক জল বহনের কারণে দু-পাড় ভেঙ্গে যায় এবং চারিপাশ জলমগ্ন হয়ে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এটা ঘটনা যে, ভারতবর্ষে নদীর কারণে বন্যার সৃষ্টির মূল উৎস প্রতিবেশী দেশ । অনেক নদী এমন আছে যেগুলি উৎপত্তি হয়েছে প্রতিবেশী দেশে এবং পরবর্তীকালে তা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহাসাগরে পড়েছে। বন্যার কারণে একটা বড় অংশ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় ভারতবর্ষ অর্থনৈতিকভাবে আরও পিছিয়ে পড়ছে যাকে পূরণ করতে একটা বড় অংশের ব্যায় করতে হয় প্রতি বছর যা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। বন্যার ক্ষয় ক্ষতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে NDMA এর প্রশাসনিক মর্মার্থ নির্দেশাবলী তৈরী করেছে যা প্রত্যেক সহযোগী সংস্থা সহ সরকারী স্তরে লাঘু করার মধ্য দিয়ে বন্যার ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হবে।

## বিপর্যয় মোকাবিলার নিয়ন্ত্রণ :

বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) ভূমিকম্পপ্রবন এলাকাগুলিতে এমন বাড়ী তৈরী করতে হবে যা ভূমিকম্পের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করবে। জাপানে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলিতে ভূমিকম্প রোধক হিসাবে কাঠের বাড়ী তৈরী করা হয়।

(২) বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, যারমধ্যে বড় জলাধারের পরবর্তে ছোট ছোট জলাধার তৈরী করা উচিৎ। বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলি থেকে জনবসতি সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ।

(৩) ভূমিকম্প, কম্পন, পাথরের অভ্যন্তরে অবিন্যাসগত সমস্যার মত বিভিন্ন কারণে ভূমিধ্বস হয়ে থাকে। এই ভূমিধ্বসকে কমানোর জন্য পাহাড়ের ধাপ তৈরী করা, পাথরগুলিকে তালের সাহায্যে বেঁধে বা আটকে রাখা এবং জলের প্রবাহকে সঠিকভাবে প্রবাহিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা করে দেওয়া প্রয়োজন।

(৪) সাইক্লোন নামক দানবীয় ঝড়কে আটকানো সম্ভব নয়। কিন্তু এর বিভৎসতা কমানোর জন্য বেশকিছু দীর্ঘস্থায়ি পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে । তারমধ্যে

উপকূলবর্তী এলাকায় গাছ লাগানো, জলাধার নির্মাণ করা, বাধ নির্মাণ করা, বায়ুর গতির হ্রাসের জন্য পরিকল্পনা, সঠিক নিকাশী ব্যবস্থা এবং চওড়া রাস্তা দরকার, যাতে দুর্ঘটনার সময় খুব তাড়াতাড়ি সেই জায়গা ছাড়া সম্ভব নয়।

## ৩.৭.২.ত্রিপুরা রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভূমিকা (TSPCB) :

টিপ্পনী

নীচে আমরা TSPCB এর বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করব।

১৯৭৪ সালে পার্লামেন্টে জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হল -

(১) জলদূষণ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ করা।

(২) জলের গুণগত মান বজায় রাখা।

(৩) জলদূষণ আইন কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং রাজ্যদূষণ পর্ষদকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া।

ভারতের সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সংবিধানের ২৫২ নং অনুচ্ছেদে ১ নং ধারা অনুসারে জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ করা হয়েছে। এই আইনের বলে রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাজ হল -

(১) নদী এবং নলকূপ ও পাতকূয়োর জলের দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

(২) রাজ্য সরকারকে জলদূষণ নিবারণের জন্য পরামর্শ দান করা।

(৩) জলদূষণ ওসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা উদ্দেশ্যে তথ্য সরবরাহ করা।

(৪) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গবেষণায় উৎসাহ দান করা।

(৫) কেন্দ্রীয় দূষণ পর্ষদের সাধে সহযোগীতা স্থাপন করা।

(৬) ময়লা জলশোধনের উদ্দেশ্যে শোধনাগার স্থাপন করা এবং জল শোধনের জন্য নির্ভরযোগ্য ও স্বল্প ব্যায় সাপেক্ষ পদ্ধতি আবিস্কারের উদ্দেশ্যে গবেষণা করা।

(৭) জল শোধনের পর ময়লা দূষিত পদার্থগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য পন্থা প্রকরণ উদ্ভাবণ করা।

### জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন 1974 :

(১) এই আইনের 25 (I)(a) ধারা অনুসারে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যাক্তি এমন কোন শিল্প, কারখানা বা উৎপাদন সংস্থা স্থাপন বা পরিবর্তন বা সম্প্রসারণ করতে

টিপ্পনী

পারবে না, যেগুলি থেকে দূষিত আবর্জনা নদী বা পুকুর বা পাতকুয়ো বা যেকোন ধরনের কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

(২) এই আইনের 25 (a) (I)(b) (c) ধারা অনুসারে কোন ব্যাক্তি রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি ছাড়া কোন তরল দূষিত পদার্থ বা দূষিত আবর্জনা সরানোর জন্য কোন নতুন নালা বা নির্গমন পথ নির্মান করতে পারবে না, এমনকি পুরাতন নির্গমন পথের পরিবর্তন করতে পারবে না।

(৩) উক্ত আইনের 41(1) (2) (3) (c) (1) অনুসারে কোন ব্যাক্তি এই আইনে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলিকে লঙ্ঘন করলে তাকে তিনমাসের জেল বা ৫.০০০ টাকা জরিমানা বা দুটি শাস্তি একই সাথে দেওয়া যেতে পারে।

## বায়ু (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮১ :

১৯৮১ সালে পার্লামেন্টে বায়ূ (প্রতিরোধ এবং দুষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ হয়। এই আইনের অন্তর্গত বিষয়গুলি হল -

(১) আলোচ্য আইনে ২১ নং ধারা অনুসারে কোন ব্যাক্তি বা সংস্থা রাজ্য দূষণ পর্ষদের অনুমতি ছাড়া কোন শিল্প বা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে না। এছাড়া, উৎপাদন শুরু করার আগে ও রাজ্য নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি নিতে হবে।

(২) আলোচ্য আইনের (17) (1)(a-j) ধারা অনুসারে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজ হল -

(অ) বায়ুদুষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেই পরিকল্পনাকে রূপায়ন করা।

(আ) রাজ্য সরকারকে আলোচ্য বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

(ই) কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সাথে যৌথ উদ্যোগে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন করা এবং ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(ঈ) বায়ুদূষণ নিরোধক অঞ্চলের সীমা নির্দিষ্ট করা এবং প্রয়োজন মত ঐ সীমানার পরিবর্তন করা।

(উ) রাজ্য বায়ু গবেষণাগার স্থাপন করা ইত্যাদি।

(৩) আলোচ্য আইনের 21, 22, 24 এবং 50 নং ধারা অনুসারে যে শিল্প সংস্থাগুলিকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রনের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলি হল -

(অ) অ্যাসবেসটস এবং অ্যাসবেসটস জাত সামগ্রী উৎপাদন শিল্প।

(আ) সিমেন্ট এবং সিমেন্টজাত সামগ্রী উৎপাদন শিল্প।

(ই) সেরামিক শিল্প।

(ঈ) রাসায়নিক শিল্প এবং ঐ শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থা।

(উ) কয়লা, লিগনাইট ভিত্তিক শিল্প।

(ঊ) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প।

(ঋ) ধাতু নিষ্কাশন শিল্প।

(এ) সার শিল্প

(ঐ) খাদ্য এবং কৃষিজাত পন্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প

(ও) খনি শিল্প

(ঔ) বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প

(ক) কাগজ, ববন শীল্প

(খ) তৈল শোধনাগার ও পেট্রো রসায়ন শিল্প।

উপরিউক্ত সমস্ত বিষয়ে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দান করবে এবং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সাথে সহযোগী ভাবে কাজ করবে।

**ত্রিপুরা রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আদেশপত্র :**

ত্রিপুরা রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আদেশপত্র নিম্নলিখিত আইন, নিয়ম এবং নির্দেশাবলীর দ্বারা তৈরী করা হয়েছে।

**আইন :**

জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) এইন, ১৯৭৫.

জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সেস আইন, ১৯৭৭.

বায়ু (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১

পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮৬

**নিয়মাবলী / বিধিসমূহ :**

জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৭৫.

ত্রিপুরা রাজ্যদূষণ নিয়ন্তরণ পর্ষদ (জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ) বিধি, ১৯৮৯.

জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ) বিধি, ১৯৭৮.

বায়ু (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৮২.

ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (বায়ুদূষণ)

**নির্দেশাবলী :**

বিপজ্জনক বর্জ্য (ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা) বিধিসমূহ, ২০০৪.

জৈব চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা) বিধিসমূহ, ২০০০.

প্লাস্টিক উৎপাদন, বিক্রি এবং ব্যবহারের বিধিসমূহ, ১৯৯৯

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শব্দদূষণ (প্রতিবিধান এবং নিয়ন্ত্রণ) বিধিসমূহ, ২০০০
ব্যাটারী (ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা) বিধিসমূহ, ২০০১.
পৌর কঠিন বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার) বিধিসমূহ, ২০০০
বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন, সঞ্চয় এবং আমদানি সংক্রান্ত বিধিসমূহ, ১৯৮৯.
পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী, ২০০৬.

## অনুশীলন :

১৫) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যেকোন একটি কারণ উল্লেখ কর।

১৬) আমরা কিভাবে জীবন এবং সম্পত্তি ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারি ? কিছু পদ্ধতির কথা উল্লেখ কর।

১৭) ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অন্তর্গত জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪ সংক্রান্ত যেকোন দুটি কাজের কথা উল্লেখ কর।

## ৩.৮. সারসংক্ষেপ :

- বায়ূদূষণ বলতে বোঝায় বায়ুমন্ডলে যেকোন বায়ুদূষকের উপস্থিতি।
- বায়ুদূষক প্রাথমিক অথবা গৌণ হতে পারে। প্রাথমিক দূষকগুলি হল কার্বণ-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বণ মনোক্সাইড (জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে উৎপন্ন যেকোন প্রকার) CFC এবং বস্তুকনা। গৌণদূষক গুলিহল অ্যাসিড রেন বা অম্লবৃষ্টি এবং ওজোন ($O_3$)।
- জলের সঙ্গে কোন অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলে যদি জলের ভীত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং তারফলে জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে জলের সেই খারাপ অবস্থাকে জলদূষণ বলে।
- মানুষের ব্যবহৃত জীবানুনাশক পানীয় জল অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার (রোগ) সৃষ্টি করে। জলাশয়ের অত্যাধিক উষ্ণতার বৃদ্ধির কারণে জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব পরিবর্তনের ফলে জলের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হওয়াকে তাপদূষণ বলে।
- সামুদ্রিক দূষণের মূল উৎসগুলি হল : (১) নদীসমূহ, যেগুলি তার অববাহিকার দূষণ সৃষ্টিকারী নোংরাসমূহ বয়ে নিয়ে আসে। (২) বিভিন্ন নালা ও সমুদ্র উপকূল যেখানে মানুষজন বসবাস করে বিভিন্ন হোটেল, কারখানা, কৃষিকাজ করা হয় তার বর্জ্য। (৩) তৈল্য উত্তোলন ও রপ্তানীকৃত কাজ।
- শিল্পজাত বর্জ্য ও নর্দমার নোংরা বর্জ্য যা মাটিকে দূষিত করার মধ্য দিয়ে মানুষের

স্বাস্থ্যকে ও প্রভাবিত করে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক, যেমন - অ্যাসিড়, অ্যালকালি বা খার, জীবানুনাশক এবং অন্যান্য কীটনাশক বস্তু যা শিল্পজাত বর্জ্য হিসাবে নির্গত হয়ে জমির উর্বর ক্ষমতা হ্রাস করে। আবার অনেক সময় মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

- কোন অঞ্চলে গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে । এটি মূলত কোন স্থানের সাধারণ আবহাওয়ার অবস্থা, ঋতু বৈচিত্র এবং আবহাওয়ার সর্বোচ্চ অবস্থাকে বোঝায়।
- ট্রপোস্ফিয়ার, যা বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর । এটি কিছু গ্যাসীয় পদার্থের উপস্থিতিতে উষ্ণতাকে ধরে রাখে। এই ঘটনাকে গ্রীণ হাউস প্রভাব বলা হয়। গ্রীণ হাউস শব্দটির অর্থ হল গাছপালার পরিচর্চার জন্য তৈরী কাঁচের ঘর।
- গ্রীণ হাউস এফেক্টন বৃদ্ধির ফলে যে কেবল বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটে তাই নয় বরং বলা যায় অন্যান্য জলবায়ুগত এবং প্রাকৃতিক বিষয় গুলির উপরেও এর প্রভাব দেখা যায়।
- জল এমনই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাণের দুলর্লভ উৎস, যাকে আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন ।বৃষ্টির জল সংরক্ষণ হল এমন একটি প্রযুক্তিগত কৌশল যা ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের ভারসাম্য রক্ষা করে। বিভিন্ন জলাধার নির্মাণ, গভীর কুঁয়ো তৈরীর মধ্য দিয়ে এই বিশেষ প্রযুকক্তিটি প্রয়োগ করা হয়।
- মূল নদী থেকে উৎপত্তি হওয়া একটি অঞ্চল, যা নদী অববাহিকা বলে পরিচিত। এরকম অনেকগুলি নদীর অববাহিকার দ্বারা তার কেন্দ্রস্থলে কয়েক হাজার কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে সৃষ্টি হয় জল বিভাজিকার। যা পূর্ণ হয় বিভিন্ন নদী থেকে মাধ্যাকর্ষন শক্তির প্রভাবে গড়িয়ে আসা জলের দ্বারা।
- অবৈজ্ঞনিক, অনিয়ন্ত্রিত এবং অপরিকল্পিতভাবে ভূমির ব্যবহার করে কাজ করার ফলে জল বিভাজিকাগুলি বিভিন্ন সময়ে পতনের সম্মুখীন হয়।
- হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে এতকাল অবধি সবথেকে গুরুত্ব এবং সাফল্য পেয়েছে এই জল বিভাজিকা সংক্রান্ত পরিকল্পনাটি। তবে বর্তমানে কিছু মনুষ্যজনিত কাজকর্মের ফলে এই পরিকল্পনাগুলি সঙ্কটের মুখে । তাই এমতাবস্থায় আমাদের উচিত সর্বতভাবে এই পরিকল্পনাগুলিকে সংরক্ষণ করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- কেঁচোসার তৈরী হল এমনই একটি প্রক্রিয়া যা কেঁচোর পাচন ক্রিয়ার ফলে জৈবভাবে উৎপন্ন একধরনের পদার্থ যা মাটির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধির সহায়ক।
- USDA এর নির্দেশানুসারে এই সার তৈরীর প্রক্রিয়া (যা ২০০২ সালে ২১ অক্টোবর থেকে চালু হয়েছে), কেঁচো সার হল এমনই এক জৈব পদার্থ যা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর থেকে পাচন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যেমন - ভূমিকম্প, আগ্নেগিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা এবং ভূমিধ্বস এর মত স্বাভাববিক প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির ফলেই আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে আমরা বসবাস করছি এই প্রকৃতি বেশ কিছু সময় তার সর্বনাশা প্রভাব বিস্তার করে মানব প্রজাতির উপর।
- সাইক্লোন নামক দানবীয় ঝড়কে আটকানো সম্ভব নয়। কিন্তু এর বিভৎসতা কমানোর জন্য বেশকিছু দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। তারমধ্যে উপকূলবর্তী এলাকায় গাছলাগানো, জলাধার নির্মাণ করা, বাঁধ নির্মাণ করা, বায়ুর গতি হ্রাসের জন্য পরিকল্পনা, সঠিক নিকাশী ব্যবস্থা সহ চওড়া রাস্তা বানানো দরকার। যাতে দুর্ঘটনার সময় খুব তাড়াতাড়ি সেই জায়গা ছাড়া সম্ভব হয়।

## ৩.৯. প্রধান শব্দসমূহ :

- বায়ুদূষক : বায়ুদূষক বলতে বোঝায় আবহমন্ডলে দূষিত ধোঁয়া, গ্যাস, গন্ধ, ধোঁয়াশা, বাষ্প ইত্যাদি যে পরিমানে বা যতক্ষণ স্থায়ী হলে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জগতে ক্ষতি হয় বা বায়ুমন্ডলে জমে থাকা যে সমস্ত দূষিত পদার্থ মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দে বাধা দেয় তাকে বায়ুদূষন বলে। অর্থাৎ বায়ুদূষণ বলতে আবহমন্ডলে যেকোন রকম বায়ুদূষকের উপস্থিতিকে বোঝায়।
- অম্লবৃষ্টি : আবহমন্ডলে বৃষ্টির সাথে সালফার - ডাই- অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন - ডাই - অক্সাইড এর মিশ্রণ সূর্যালোকের সাথে বিক্রিয়া করে আম্লিক ফোঁটা সৃষ্টি করে। এই আম্লিক ফোঁটাই বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়াকে বলা হয় অ্যাসিড বৃষ্টি।
- দূষণ : দূষণ বলতে সেই সমস্ত পদার্থগুলিকে (দূষণকারী) বোঝায় যেগুলি নৃতাত্ত্বিক জনিত (মানবীয়) কার্যক্রম হিসাবে ইচ্ছাকৃত বা আপদকালীনভাবে পরিবেশে মুক্ত হয় (যেমেন - ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা অথবা চার্ণবিল পরমাণু কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় নির্গমন ছিল একটি দুর্ঘটনা। দূষণের নির্দেশক বিন্দু হল পরিবেশের এমন এক পরিবেষ্টনকারী গুণ যেটি বোঝায় পরিবেশ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।
- তাপীয় দূষণ : জলাশয়ের অত্যাধিক উষ্ণতার বৃদ্ধির কারণে জলের ভৌত, রাসায়নিক, জৈব পরিবর্তনের ফলে জলের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হওয়াকে তাপীয় দূষণ বলে।
- জলদূষণ : জলের সঙ্গে কোন অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলে যদি জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং তার ব্যবহারের ফলে যদি জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে জলের সেই খারাপ অবস্থাকে জলনদূষণ বলে।
- বিশ্ব উষ্ণায়ন : ট্রপোষ্ফিয়ার হল বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর, যা কিছু গ্যাসীয় পদার্থের

উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক উপায়ে পৃথিবীর উষ্ণতাকে ধরে রাখে। এই ঘটনাকে গ্রীণ হাউস প্রভাব বলা হয়। গ্রীন হাউস শব্দটির অর্থ হল গাছপালার পরিচর্যার জন্য তৈরী কাঁচের ঘর।

- বৃষ্টির সংরক্ষণ : বৃষ্টির জল সংরক্ষণ হল এমনই একটি প্রযুক্তিগত কৌশল যা ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে ভারসাম্য রক্ষা করে। বিভিন্ন জলাধার নির্মাণ, কুঁয়ো তৈরীর মধ্য দিয়ে এই বিশেষ প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করা হয়।

টিপ্পনী

## ৩.১০. অনুশীলনের উত্তরসমূহ :

১) উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরকার হয়, তাকে বলে পরিবেশ। পরিবেশ তৈরী হতে দরকার লাগে জল, বাতাস, মাটি, উদ্ভিদ, প্রানী ও মানুষ।

২) দূষণ বলতে বোঝায় বায়ু, জল ও ভূমিতে সেই সমস্ত পদার্থের উপস্থিতি, যেগুলি মানবীয় বা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং যা জীবজগত, পরিবেশের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

৩) প্রাথমিক দূষকগুলি হল কার্বণ-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজন - ডাই - অক্সাইড, সালফার - ডাই - অক্সাইড, কার্বন - মনো অক্সাইড (জীবাশ্ম জ্বালানী দ্রের ফলে উৎপন্ন যেকোন ধরন)। CFC এবং বস্তুকনা।

৪) বায়ুমন্ডলের বৃষ্টির জলের সাথে সালফার -ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন - ডাই - অক্সাইড এর মিশ্রণ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে আম্লিক ফোঁটা সৃষ্টি করে। এই আম্লিক ফোঁটাই বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়াকে অম্লবৃষ্টি বা অ্যাসিড রেন বলে।

৫) যদি কোন কারনে জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং তার ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে ওঠে, তবে জলের সেই খারাপ অবস্থাকে জলদূষণ বলে।

৬) 1986 সালে 19 শে নভেম্বর 'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' বলবৎ হয়।

৭) জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনের দুটি মূল বৈশিষ্ট্য হল : - (ক) সমস্ত ধরনের ভূপৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভস্থ জলের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। তা ব্যবহারের এবং ভারসাম্য রক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই।

৮) বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর হল ট্রপোস্ফিয়ার, যা কিছু গ্যাসীয় পদার্থের উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক উপায়ে পৃথিবীর উষ্ণতাকে ধরে রাখে। এই ঘটনাকে গ্রীণ হাউস প্রভাব বলা হয়।

৯) প্রধান গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলি হল - কার্বণ - ডাই -অক্সাইড, ওজোন, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প।

১০) জল সংরক্ষণের জন্য গৃহীত দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল নিম্নরূপ :

(ক) বেঞ্চ ট্রেসিং সংরক্ষণ : এক্ষেত্রে গড়ীয়ে যাওয়া জলকে সংরক্ষণের বা ধরে

রাখার জন্য বেঞ্চের একটি সিরিজ গঠন করা হয়।

(খ) পাহাড়ে পাদদেশগুলিতে বিভিন্ন ঝর্ণাগুলি থেকে বাঁধ বা জলাধারের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ করা হত। পরবর্তীকালে সেখান থেকে বাঁশের দ্বারা পাইপ লাইন করে জল সরবরাহ করা হত।

**টিপ্পনী**

১১) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ হল এমন একটি প্রযুক্তিগত কৌশল যা মাটির অভ্যন্তরে জলস্তরে ভারসাম্য রক্ষা করে। ছোট বড় বিভিন্ন জলাধার নির্মান, গভীর কুঁয়ো তৈরী, নলকূপ তৈরীর মধ্য দিয়ে এই বিশেষ প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করা হয়। তবে বৃষ্টির জল মাটিতে সধপর্শ করার আগেই সংরক্ষণ করে তাকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

১২) 1949 সালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) প্রথম সুসংহত জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি গ্রহণ করে।

১৩) কেঁচোসার তৈরী হল এমনই একটি প্রক্রিয়া যা কেঁচোর মধ্যে পাচন ক্রিয়ার দ্বারা জৈবভাবে উৎপন্ন হয় একধরনের পদার্থ যা মাটির উর্বরতে শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক।

১৪) কেঁচোসার তৈরীর কেন্দ্র হিসাবে সেইসমস্ত গ্রামীন, উপনগর, শহর এবং অল্প উন্নত গ্রামগুলিকে উপযুক্ত আদর্শ স্থান হিসাবে ধরা হয়। যেখানে বৃহৎ মাত্রায় কাঁচামালের জোগান এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারিকরণ সহজলভ্য হবে।

১৫) অতিবৃষ্টি অথবা হঠাৎ তুষারপাত অনেকসময় অর্থনৈতিক লোকসান সহ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে।

১৬) ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলিতে ভূমিকম্প প্রতিরোধী ঘরবাড়ী তৈরী করতে হবে যাতে জীবন এবং সম্পত্তির কম ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১৭) 1974 সালে পার্লামেন্টে জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ করানো হয়। এই আইনের অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাজগুলি হল -

(ক) জলদূষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তথ্য সরবরাহ করা।

(খ) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ, নিবারণ এর উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দান করা।

## ৩.১১. প্রশ্নাবলী এবং অনুশীলন :

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

**স্ব-অধ্যায় সামগ্রী**

১. দূষণ কাকে বলে ? কিছু সাধারণ দূষণ সৃষ্টিকারী দূষকের নাম কর।

২. বায়ুদূষণ সম্পর্কে টীকা লেখ। আমরা কিভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ?

৩. শব্দ এবং কোলাহলের মধ্যে পার্থক্য কর।

৪. শব্দদূষণের উৎস, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫. জলদূষণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৬. জল সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭. বৃষ্টি জল সংরক্ষণ কি ? এরদ্বারা কি প্রয়োজন পূরণ হয় ?

৮. জলবিভাজিকা কি ? জল বিভাজিকার ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতিগুলির সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা কর।

## রচনাধর্মী প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

১. জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসহ এর প্রতিকূল প্রভাবগুলি আলোচনা কর।

২. মৃত্তিকা দূষণের উৎসগুলি লেখ। মাটির উর্বরতার ক্ষেত্রে মৃত্তিকাদূষণ কি প্রভাব ফেলে ? এর প্রতিবিধানগুলি লেখ।

৩. তুমি ব্যাক্তিগত উদ্যোগে কিভাবে পরিবেশদূষণকে রোধ করবে ? এই ধরনের পদক্ষেপ কেন অত্যন্ত জরুরী ?

৪. বিপর্যয়ের বিভিন্ন ধরণগুলি কি কি ?সেগুলি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ? বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ?

৫. গ্রীণহাউস গ্যাস কোন্গুলি এবং গ্রীণ হাউস এফেক্ট কি ? বিশ্ব উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে এর অবদান কি ?

৬. বিশ্ব - উষ্ণায়নের কু প্রভাব বৃদ্ধির সম্পর্কে আলোচনা কর।

## ৩.১২. অতিরিক্ত পাঠক্রম


Jacobson, Mark Z. 2002. *Atmospheric Pollution—History, Science and*
*Regulation*. UK: Cambridge University Press.

Khopkar, S. M. 2004. *Environmental Pollution Monitoring and Control*. New
Delhi: New Age International.

Harrison, Roy M. 2001.*Pollution: Causes, Effects and Control*. UK: Royal Society
of Chemistry.

Easton, Thomas. 2008. *Classic Edition Sources: Environmental Studies*, Third
Edition. Ohio: McGraw-Hill/Dushkin.

Cunningham, William and Mary Cunningham, 2009. *Environmental Science: A*
*Global Concern*. Ohio: McGraw-Hill.


টিপ্পনী

Rangarajan, Mahesh. 2010. *Environmental Issues in India: A Reader*. New Delhi:
Pearson.

## Websites

http://www.ndma.gov.in/en/media-public-awareness/disaster/natural-disaster/floods.html
http://www.ndma.gov.in/en/media-public-awareness/disaster/natural-disaster/earthquakes.html
http://agricoop.nic.in/imagedefault1/Vermicompost%20Production%20Unit.pdf

# Annexure I
# Vermi-Composting (200 TPA)

## Capital Cost

| Sr | Particulars of item | Amt (₹) | |
|---|---|---|---|
| | | Year 1 | Year 2 onwards |
| A. | **Land and Building** | | |
| 1. | Land (On lease) | ---- | ---- |
| 2. | Levelling and earth filling for vermicompost sheds | 7500 | ---- |
| 3. | Fencing and gate | 25000 | ---- |
| 4. | Open Shed with brick lined bed bottom & platform with RCC / MS pipe post & truss and thatch /HDPE / locally available roof (@ 1000/$m^2$) for : | | |
| a. | Vermicompost beds (15 m*1.5 m*24 nos = 540 $m^2$ + 20 $m^2$ pathways/utility = 560 $m^2$) | 560000 | |
| b. | For finished products 30 $m^2$ | 30000 | ---- |
| 5. | Godown / Store cum office 50 $m^2$ @ 5000/-per $m^2$ | 250000 | ---- |
| | **Sub total** | **872500** | ---- |
| | | | |
| B. | **Implements and machinery** | | ---- |
| 1 | Shovels, spades, crowbars, iron baskets, dung fork, buckets, bamboo baskets, trowel, | 5000 | ---- |
| 2 | Plumbing and fitting tools | 1500 | ---- |
| 3 | Power operated shredder | 25000 | ---- |
| 4 | Sieving machine with 3 wire mesh sieves- 0.6 m x 0.9 m size - power operated with motor | 45000 | ---- |
| 5 | Weighing scale (100 kg capacity) | 2500 | ---- |
| 6 | Weighing machine (platform type) | 6000 | ---- |
| 7 | Bag sealing machine | 5000 | ---- |
| 8 | Culture trays (plastic) (35 cm x 45 cm) - 4 Nos | 1600 | ---- |
| 9 | Wheel barrows - 2 Nos. | 12000 | ---- |
| | **Sub total** | **103600** | ---- |
| C. | **Water provision - Borewell with hand pump, pipe, dripper** | **75000** | ---- |
| D. | **Electrical installation** | **10000** | ---- |
| E. | **Furniture & fixtures** | **25000** | ---- |
| F. | **Earthworms (@1 Kg per $m^3$ and @` 300/Kg, total utilized bed volume = 324 $m^3$)** | **97200** | ---- |
| | **TOTAL CAPITAL COST** | **1183300** | |

টিপ্পনী

টিপ্পনী

# Annexure II
# Vermi-Composting unit (200 TPA)

**Total operational cost for one year with 7 cycles of 65-75 days**

**Bed volume 324 m3**
**Recovery : 30 %**
**Operational Cost**

| Sr | Particulars of item | Amt (₹) | |
|---|---|---|---|
| | | Year 1 | Year 2 onwards |
| 1. | Agricultural wastes (cost, collection and transportation) @ 320 kg per $m^3$ and Rs.200/MT (15*1.5*0.6*24*5*320*200/1000) [at 50% in 1st year] | 51840 | 103680 |
| 2. | Cow dung (cost, collection and transportation) @ 80 kg/m3 and Rs.250/MT (15*1.5*0.6*24*5*80*250/1000) [at 50% in 1st year] | 16200 | 32400 |
| 3. | Salary wages for 2 permanent skilled labourers @ Rs.6000/month | 12000 | 12000 |
| 4. | Labour wages on day to day basis in formation of vermibed with agro-waste, cow dung and worms, watering, stirring, harvesting, sieving, packing, etc., including cost of bags (250 mds[@ Rs.200/md) [at 50% in 1st year] | 25000 | 50000 |
| 5. | Electrical charges for pump, machinery, lighting etc. [at 50% in 1st year] | 12000 | 24000 |
| 6. | Repair and maintenance [at 50% in 1st year] | 30000 | 60000 |
| 7. | Cost of bags and marketing cost [at 50% in 1st year] | 15000 | 30000 |
| | **Sub Total** | **156040** | **312080** |
| 8. | Lease rent, Miscellaneous etc. | 30000 | 30000 |
| | **Total Operational Cost** | **186040** | **342080** |

# Annexure III
# Vermi-Composting units (200 TPA)

## Costs and Benefits

| Sr | Cost | Amt (₹) | |
|---|---|---|---|
| | | Year 1 | Year 2 onwards |
| 1. | Total Capital cost | 1183300 | --- |
| 2. | Total Operational cost | 186040 | 342080 |
| 3. | Total cost | 1369340 | 342080 |
| 4. | Benefit | | |
| 4a. | Sale of vermicompost (200 MT @ 30% conversion) [@ Rs.4500/MT at 60% in 1st year and 90% in 2nd year onwards] | 405000 | 810000 |
| 4b. | Sale of worms [@ 5 Kg/MT of compost and @ Rs.200/Kg.] | 90000 | 180000 |
| 4c. | Total benefit | 495000 | 990000 |
| 5. | Net benefit | (874340) | 647920 |

टिप्पनी

টিপ্পনী

# Annexure IV
# Vermi-Composting unit (200 TPA)

## Financial Analysis

| Sr | Cost | Amt (₹) | |
|---|---|---|---|
| | | Year 1 | Year 2 onwards |
| 1. | Total Capital cost | 1183300 | --- |
| 2. | Total Operational cost | 186040 | 342080 |
| 3. | Total cost | 1369340 | 342080 |
| 4. | Benefit | | |
| 4a. | Vermicompost | 405000 | 810000 |
| 4b. | Sale of worms | 90000 | 180000 |
| 4c. | Total benefit | 495000 | 990000 |
| 5. | Net benefit | (874340) | 647920 |
| 6. | Discounting rate - 15% | | |
| 7. | PVC - ₹2893538 | | |
| 8. | PVB - ₹3655654 | | |
| 9. | NPV - ₹762116 | | |
| 10. | BCR - ₹1.226 | | |
| 11. | IRR – 34% | | |

# Annexure V
# Vermi-Composting (200 TPA)

**Repayment Schedule**

TFO (₹.) = 1338132 (Say ₹13.50 lakh)

(Capital cost + Operational cost for two cycles + lease rent for 1st year)

Bank Loan (₹.) = 1012500 337500

Rate of Interest = 13%

| Year | Loan O/s | Net Income* | Principal | Interest | Total outgo | Net surplus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012500 | 456584 | 75000 | 131625 | 206625 | 249959 |
| 2 | 937500 | 647920 | 160000 | 121875 | 281875 | 366045 |
| 3 | 777500 | 647920 | 180000 | 101075 | 281075 | 366845 |
| 4 | 597500 | 647920 | 200000 | 77675 | 277675 | 370245 |
| 5 | 397500 | 647920 | 220000 | 51675 | 271675 | 376245 |
| 6 | 177500 | 647920 | 177500 | 23075 | 200575 | 447345 |

** 1st year net income = 1st year total income -operational cost of 1 cycle + insurance and lease [As 2 operational cycle and lease rent are capitalized].*

টিপ্পনী

টিপ্পনী

# চতুর্থ একক

# জনসংখ্যা এবং সামাজিক সমস্যাসমূহ

টিপ্পনী

৪.০. ভূমিকা
৪.১. উদ্দেশ্য
৪.২. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ণ / স্থিতিশীল উন্নয়ন
    ৪.২.১. পরিবেশের মৌল বিষয়সমূহ এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন
৪.৩. পরিবেশগত নীতিবোধ : সমস্যাসমূহ ও সম্ভাব্য সমাধান
    ৪.৩.১. পরিবেশগত সচেতনতা
৪.৪. সামাজিক ফলাফলের মূল্যায়ন
৪.৫. সামগ্রিক প্রভাবের মূল্যায়ন
    ৪.৫.১. সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়নের নয়া ধারণা
    ৪.৫.২.সামগ্রিক প্রভাব এবং পরিবেশবাদ মূল্যায়নের প্রক্রিয়া
৪.৬. জনসংখ্যাগত কাঠামো
    ৪.৬.১. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ
৪.৭. মানুষ, পরিবেশ এবং সামাজিক সমস্যা
    ৪.৭.১. পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্য
    ৪.৭.২. মানবাধিকার, পরিবেশ এবং HIV / AIDS
    ৪.৭.৩. মহিলা ও শিশুকল্যাণ
৪.৮. সারসংক্ষেপ
৪.৯. মূখ্য ব্যবহিত শব্দসমূহ
৪.১০. পাঠকের অগ্রগতি সংক্রান্ত উত্তর
৪.১১. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলন
৪.১২. অতিরিক্ত পাঠক্রম

## ৪.০. ভূমিকা :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী



দীর্ঘস্থায়ি বিকাশের ক্ষেত্রে অণ্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিবেশগত অধিকারবোধ ও সামাজিক অধিকারবোধ। একটি ধারণাগত বিষয় হিসাবে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের প্রশ্নটি উদ্ভুত হয়েছে মূলত বিশ্বজনীন পরিবেশগত সমস্যা ও অর্থনৈতিক

টিপ্পনী

উন্নয়নের প্রক্রিয়াগত কারণে উদ্ভুত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সমস্যা থেকে। এটা মূলতঃ সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবতার বিশ্বজনীন বিকাশের ধারণাকে তুলে ধরে এবং এটা এই পুর্বনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামজিক সমস্যাসমূহকে মোকাবিলা তথা সমাধান করতে হবে নতুন সুসংহত কৌশল অবলম্বণের দ্বারা।

এই পত্রে তোমাদেদর দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, পরিবেশগত নীতিবোধ এবং পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে পাঠ দেওয়া হবে। এছাড়া এই ইউনিটে (Unit) এ Social Impact Assessment (SIA) (সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ) এবং Commutative Effect Assessment (সমাগ্রিক প্রভাব মূল্যায়ন) নিয়েও আলোচনা করা হবে। এই পত্রের শেষে ভারতের জনসংখ্যা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

## ৪.১. পাঠের উদ্দেশ্য :

এই unit সম্পূর্ণ পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠকগণ জানতে পারবে :

- দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা ;
- পরিবেশগত মূল্যবোধ ও পরিবেশ সচেতনতা ;
- Social Impact Asspssment ও Commulative Impact Assessment এর ভূমিকা
- ভারতের জনসংখ্যাগত কাঠামো।

## ৪.২. দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন :

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণা হল সেই বিষয় যা এটার উপর গুরুত্ব দেয় যে প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগ বা ব্যবহার এমন পরিমাণে করা উচিৎ যাতে করে প্রায় সমপরিমাণ সম্পদ একইভাবে প্রকৃতিতে বিকল্প হিসাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এই ধারণা পোষণ করে যে বর্তমান প্রজন্মের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রয়োজন এমনভাবে মেটানো উচিৎ বা ভোগ করা উচিৎ যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ বা প্রবোজন সুরক্ষিত থাকে। উন্নত রাষ্ট্রগুলি ব্যাপক হারে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করে ; কিন্তু এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার দীর্ঘদিন চলতে পারে না। একজন মাতার মতোয় প্রকৃতি মনুষ্য সমাজকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ একদিকে প্রকৃতিক সম্পদ দিয়ে সেবা করছে তেমনি আবার মনুষ্য ব্যবহার বর্জ ও গ্রহণ করছে। কিন্তু আজ বর্তমান মনুষ্য সমাজকে এটা বুঝতেই হবে যে প্রকৃতি

উত্তরোত্তর ভঙ্গুর তথা ধ্বংসপ্রায় হচ্ছে। প্রকৃতি অবশ্যই সীমিত। তাই সম্পদজও অসীম নয়। এবং বিশেষজ্ঞগন এ বিষয়ে বারংবার আশঙ্কার কথা বোলেছেন যে ইতিমধ্যেই প্রকৃতি কঠিন সমস্যাসম্মুখীন হয়েছে এবং বিপদ সীমার পৌঁছে গেছে, যার বাইরে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং এর ফলশ্রুতি স্বরূপ প্রভূত 'ধ্বংস' ছাড়া আর কিছু হবে না।ঔ এই বিশেষজ্ঞগন 'Limits to growth' (বিকাশের সীমারেখা) দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা।

টিপ্পনী

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারনা উত্তর ও দক্ষিণের উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে সাম্য তথা সম্পদের ন্যায় সম্মত বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তাই বলা যায়, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবর্গের এটা গুরুদায়িত্ব যাতে আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সমাধিত হয়। এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে একাধিক প্রজন্ম নির্বিশেষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থনৈতিক সামাজিক ও পরিবেশগত তিনটি ব্যবস্থা কীভাবে উন্নয়ন ঘটাবে এবং সাথে সাথে কীভাবে এই তিনটি উপব্যবস্থা (Subsystem) দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে ক্ষেত্রে পারস্পারিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যতটা সম্ভব সম্পদের অপব্যবহার পরিবেশকে ক্ষতি ও সমাজিক অস্থিরতা দূর করে দারিদ্র দূরীকরণ করা।

তাই বলা যায়, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বাস্তবায়িত হলে -

- পরিবেশ সুরক্ষিত হবে ;
- অ-পুনর্নবীযোগ্য সম্পদের নিষ্কাশন শেষ হবে ;
- বিকল্প সম্পদের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করা তথা বিকল্প সম্পদ অনুসন্ধান করা।
- প্রাকৃতিক সম্পদের সমব্যবহার তথা ভোগের ক্ষেত্রে সমত্যার নীতি নেওয়া;
- সম্পদের ব্যবহার বা ভোগ আন্তঃপ্রজন্ম ভিত্তিক করা।
- সামগ্রিক ব্যবস্থার সুরক্ষা

## সুস্থায়ী বিশ্বজনীন শাসনব্যবস্থা (Sustainable Global Governance) :

বিগত শতকের সত্তরের দশক (1979) পর্যন্ত মনে করা হতো যে বৃদ্ধির একটা সুনির্দিষ্ট সীমা বর্তমান। এটা মনে করা হতো যে বর্তমান হারে যদি লাগামহীন বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি ঘটে তাহলে সীমিত হওয়ার জন্য পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ

টিপ্পনী

একদিন সঙ্কটামূখীন হবেই তথা নিঃশেষিত হবে। যদিও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক বিকাশ 'বৃদ্ধির সীমারেখার' ধারনাকে খারিজ করেছে তথাপি বর্তমানে এই বিষয়টার উপর বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে যে পরিবেশের বহন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এই বৃদ্ধির সীমারেখাকে নির্ধারণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। এই বিষয়ে সকলেই একমত যে আনুপাতিক হারে বিকল্প ব্যবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত না করে আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধি বা উন্নয়ন ঘটালে পরিবশ সুরক্ষার প্রশ্নটি একটা বিশ্বজনীন সঙ্কটের মুখোমুখি হবে।

একারণেরই বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সুরক্ষা এবং দীর্ঘস্থায়ি উন্নয়নের ধারনা আর্ন্তজাতিক স্তরে সর্বাধিক প্রাধান্য পাচ্ছে এবং আশু পরিবেশ সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হচ্ছে । আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিগত শতকে একাধিক আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ণ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক যৌথ ঘোষণা, সম্মমেলনম, চুক্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করা গেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে যৌথ ঘোষণা অধিক দেখা গেছে কারণ তাতে চুক্তির মতো স্বক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে না।

আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নের ইসুতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ পরস্পর সম্মিলিত হয়েছেন। এগুলিতে পরিবেশ সুরক্ষার প্রাথমিক নীতি সমূহ - যেমন, পরিবেশ সচেতনতার মৌল নীতি, পরিবেশ দূষকের প্রতি নীতি, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের নীতি ইত্যাদি গৃহীতও হয়েছে। তাই বলা যায় আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট কাঠামোকৃত করা হয়েছে । এছাড়া ও পরিবেশ সমস্যা অতিক্রম করার জন্য একটি 'বিশ্ব পরিবেশ সংগঠন' (World Environment Organization - WEO) গঠনের কথাও বলা হবেছে, তবে এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচেষ্টা ও উদ্যম আন্তর্জাতিক স্তরে দেখা গেলেও এখনো পর্যন্ত প্রচুর সমস্যা রয়েছে, যেগুলি অতিক্রম করতে না পারলে বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষার ঐকান্তিক প্রয়াস বাস্তবায়িত করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পরিবেশ - সমস্যাকে চিহ্নিত করা গেছে । এগুলির মধ্যে কয়েকটি হল প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুরতন্ত্র সম্পর্কিত বিষয়, যেমন - অরণ্য, বণ্যপ্রানী, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, স্থানান্তরিত বা শরনার্থী জীব (migratory) ইত্যাদি । এছাড়াও বহন ক্ষমতার (Carrying Capacity) সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত সমস্যাও রয়েছে । এই সমস্যাগুলির অধিকাংশেরই মূল নীহিত রয়েছে ওজনস্তরে পরিবর্তন (Ozone depletion) বীশ্ব

উষ্ণায়ন (Global Warming), ক্ষতিকারক বর্জ্য, জৈব দূষক, ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ, পরিবর্তনশীল জৈব যৌগ, আবহাওয়ার দূষণ এবং সমুদ্র দূষণ ইত্যাদির মধ্যে, যে গুলি এই চ্যাললেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে যে পৃথিবী কতটা পর্যন্ত এই দূষণ বহনক্ষম (Carrying Capacity)।

পরিবেশ সমস্যাগুলির চরিত্র হওয়ার দরুণ স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত প্রতিরোধমূলক আইনী ব্যবস্থা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে। বর্তমানে এই কারণেই বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ মোকাবিলা করার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রায় ২০০টিরও বেশী 'বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তি (Multilateral Enviromental Agrements - MEAS) সম্পাদিত হয়েছে।

বিশেষত, 1972 সালে সংঘটিত মানব পরিবেশ সংক্রান্ত স্টকহোম সম্মেলন (Stockholm Conference on Human Environment) এর পর থেকেই যে কোন দেশের শাসন ব্যবস্থায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি অধিক পরিমাণে গুরুত্বপাচ্ছে ও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এরপর থেকেই স্টকহোম সম্মেলনের নানা আলোচ্য বিষয়, যেমন - প্রাকৃতিক জলাধার, পরিবেশগত বিকাশ ও দূষণ ইত্যাদি রাজনৈতিক ও সংবিধানিক ব্যবস্থায় গুরুত্ব পাচ্ছে। এই বিষয়গুলি অনেকো ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকবৃন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আবার, জাতীয় পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র (যেমন ভারত) সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি নাগরিদের মৌল কর্তব্য বললে স্বীকৃতি দিয়েছে। (যেমন ভারতের সংবিধানের ৫১(ক) ধারা)

## স্থিতিশীল (দীর্ঘস্থায়ী) উন্নয়নের জীবনদর্শন ও সম্পদের ন্যায়সম্মত ব্যবহার :

বিশ্বে সম্পদের ভোগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তর - দক্ষিণ; অধিক উন্নত রাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র (Less Developed Countries - CDCs); সমৃদ্ধশালী - দরিদ্র ইত্যাদির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এটা ভীষণ হতাশাজনক যে MDC (More Developed Countries)র রাষ্ট্রগুলিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২২ শতাংশ বাস করে। অথচ এই রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর মোট সম্পদেদর ৮৮ শতাংশ, মোট প্রাকৃতিক শক্তির ৭৩ শতাংশ, ও মোট আয়ের ৮৫ শতাংশ ভোগ করে। কিন্তু এর প্রেক্ষিতে এই রাষ্ট্রগুলিই বিশ্ব-প্রকৃতিকে সর্বাধিক দূষণ করে থাকে। অণ্যদিকে, দরীদ্র ও উন্নয়নশীল LDCs (Less Developed Countries) রাষ্ট্রগুলির শিল্পের বিকাশ স্বল্প হলেও এগুলিতে বিশ্ব

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জনসংখ্যার প্রায় ৭৮ শতাংশ বসবাস করে, এই রাষ্ট্রগুলি মাত্র ১২ শতাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ, ২৭ শতাংশ শক্তি (Energy) এবং বিশ্ব আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ ভোগ করে। এর ফলস্বরূপ ধণীরা আরও ধনী ও দরীদ্ররা আরও দরিদ্রগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। এই ব্যাপক অর্থনৈতিক পার্থক্যই যাবতীয় সমস্যাচর মূল, যা স্থিতীশীল উন্নয়নের বিরুদ্ধে ও সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

এই সমস্যার (উত্তর ও দক্ষিণের ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য) একমাত্র সমাধান হল বিশ্ব সম্পদের ন্যায়সম্মত বন্টন। এবং এই ন্যায় সম্মত ভারসাম্যমূল্য বন্টনের (Balanced distribution) জন্য বিশ্বব্যাপী সর্বসম্মতি (Global Consensus) বা ঐক্যমত একান্তই আবশ্যিক। অস্থিতিশীল উন্নয়নের (Unsustainable development) প্রধান দুটি কারণ বর্তমান। যথা -

(ক) দরীদ্র রাষ্ট্রসমূহে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ;

(খ) ধনী রাষ্ট্রসমূহ কতৃক সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করা।

এই সমস্যার সমাধানহেতু ধনী দেশগলিকে তাদের সম্পদ - ভোগের মাত্রা যেমন হ্রাস করতে হবে, তেমনি আবার দরীদ্র দেশের জনগণ যাতে তাদের ন্যূনতম সম্পদের চাহিদা মেটাতে পারে সেটার যোগানও নিশ্চিত করতে হবে। তাই বলা যায়, বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থেই বর্তমানে ধনী ও দরীদ্রের মধ্যে সম্পদের ন্যায়সম্মত বন্টন ও ভোগই হল একমাত্র পন্থা, যা বাস্তবায়িত করতে পারলে যাবতীয় অসাম্য - বৈষম্য ও সমস্যার সমাধানে তথা সুন্দর ভবিষ্যৎ সম্ভব।

স্থিতিশীল উন্নয়নের (Sustainable Development) ধারনায় শিল্পের বিকাশ ও পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে একটি অণ্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল শিল্প পরিবেশের (Industrial ecology) ধারনা। এটা এমন একটা ধারণা যাতে বলা হয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল ইত্যাদি ব্যবহার করার পর যেন পুনরায় ব্যবহার যোগ্য বা পুনর্নবীকরণ করা সম্ভব হয়। অন্ততঃ এটা যেন নীশ্চিত করা যায় যে পুনর্নবীকরণ না করা গেলেও যেন এগুলির বিকল্প ব্যবহার (Alternative use) করা যায়। এটা কেবল কাঁচামালের সমস্যাই মেটাবে না, সাথে সাথে উৎপাদনের ব্যায় সংকুলানও সম্ভব হবে। আবার উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা কাঁচামাল পুনর্নবীকরণের জন্য মালের অপচয় রোধের সাথে সাথে শক্তির (Energy) অপচয়ও হবে না।

## স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থে সমস্যা মোকাবিলা করা : ক্ষেত্র প্রদর্শন

২০১২ সালের ২০ - ২২ জুন সংঘটিত 'স্থিতিশীল উন্নয়ন বিউষয়ক রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলন যা 'Rio+20' (প্রথম Rio সম্মেলন ১৯৯২ সালে হয়েছিল) নামে পপরিচিত তার দুটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল -

(ক) স্থিতিশীল উন্নয়ন ও দারীদ্র দূরীকরণের জন্য সবুজ অর্থনীতি (Green Economy)।

(খ) স্থিতিশীলল উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ।

পূর্বে গৃহীত বিভিন্ন নীতি, চুক্তি ইত্যাদি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করার সাথে সাথে নবউদ্ভাবিত বিভিন্ন সমস্যার প্রতি এই সম্মেলনে আলোচনা করা হয়।

চীন, ভারত ইত্যাদি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল উন্নয়নের বিরুদ্ধে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি হল - অসম উন্নয়নের ধারা, বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশ দূষণ, পরিবনেশের পরিবর্তন, জণবিস্ফোরন, দারীদ্রের সমস্যা, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদার তুলনায় যোগানের অল্পতা ইত্যাদি।

চীন স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাকে বাস্তবায়িত করার বিষয়টিকে জাতীয় সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। চীনের সনাতনী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মধ্যেই স্থিতিশীল উন্নয়নের বিষয়টি নীহিত রয়েছে। প্রায় ২০০০ বছরেরও আগে চৈনিক দার্শনিক মেনসিয়াস (Mencius) বলেছিলেন যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সুস্পর্ক বজায় রাখার উপায় হল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ঋতু পরিবর্তনের ধারা অণুযায়ী বৃক্ষচ্ছেদন করতে হবে এবং জলে মৎসকূল সঠিক ভাবে রাখতে হলে অতিরিক্ত হারে অবৈজ্ঞানিকভাবে মাছ ধরা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাটিকে বাস্তব প্রয়োগে চীন দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য পেয়েছে। এর প্রধান কারণ হল চীন কৃষিযোগ্য ভূমি ও জলাধার ব্যবহার তথা পরিচালনার ব্যবস্থাটিকে কঠোর নিয়ম কানুনের দ্বারা স্থিতিশীলতার অণুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পেরেছে। ফললে চীন বিশ্বের প্রায় এক - পঞ্চমাংশ জনগণের খাদ্যযোগান দেয় বিশ্বের মোট কৃষিজমির মাত্র ১০ শতাংশ (এক দশমাংশ) দিয়ে। আবার বিশ্বের মাথা পিছু মোট জলসম্পদের মাত্র ২৮ শতাংশ দিবেই চীন বিশ্বজনগণের এক পঞ্চমাংশের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। বিগত দশকে চীন গ্রামীণ দরীদ্র জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৭০ মিলিয়ন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পেরেছে এবং এর ফলস্বরূপ চীন বিশ্বের মধ্যে প্রথম 'Millennium Development Goal' অর্জনে সমর্থ হয়েছে। বিগত দুই দশক ব্যাপি চীন অরণ্যকরণ নীতির সফল বাস্তবায়নের দ্বারা পদ্রায় ৬,২০,০০০ বর্গ কিমি. অরণ্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে আবার শক্তিসংরক্ষণের (Energy Conservation) ক্ষেত্রে ও চীন বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছে, যার ফলে পরিবেশ দূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। ২০০৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক বিকাশধারা বজায় রাখার সাথে সাথে চীন GDP পিছু ২১ শতাংশ শক্তি ব্যবহার যেমন হ্রাস করেছে, তেমনি আবার গুরুতর বায়ুদূষক $SO_2$ এবং COD নির্গমণ যথাক্রমে ১৬ শতাংশ ও ও ১৪ শতাংশ হারে কমাতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও মানুষের জীবন যাত্রার মানুন্নয়ন সাধনকে চীন রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে অনেকটা বাস্তবায়িত করতে পেরেছে।

বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীল উন্নয়ন যেমন চীনকে ব্যাতি রেখে সম্ভব নয়, তেমনি চীনের একার পক্ষেও এই উন্নয়ন বাস্তবায়িত করা দূরহ। একারনেই চীন বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে পারস্পারিক সহযোগিতার বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে। এজন্যই প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ, বিপর্যয় মোকাবিলা ও সমাধান ইত্যাদি ইসুতে চীন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্মিলিত জতিপুঞ্জিসহ (UNO) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

ইতিমধ্যেই চীন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়ণশীল রাষ্ট্রগুলিকে স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থে যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে। বিশেষত পারস্পারিক সাম্য, যৌথ সুবিধা ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য চীন যৌথ উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী চীন বিভিন্ন অনুন্নত দেশগুলিকে ৬০ শতাংশের ও বেশী পণ্য সমাগ্রীর জন্য শুল্ক ছাড় দিয়েছে, উন্নয়নশিল দেশগুলিকে প্রায় ২৮৭ বিলিয়ান ইয়ান (USD ৪৬ বিলিয়ন) আর্থিক সাহায্য এবং প্রায় ৫০ টি অতিদরিদ্র রাষ্ট্রকে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ইয়ান (USD 4.76 বিলিয়ন ৪.৭৬) আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।

নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও চীন তাঁর শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রক্রিয়ার খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রথমত, চীন প্রাকৃতিক সম্পদের নীরিখে দরিদ্র ও সম্পদের মাথাপিছু অংশীদারিত্ব সেখানে কম। আবার পরিবেশগত ভারসাম্যহীন ও আঞ্চলিক উনয়নেও বৈষম্য যেখানে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সেখানে একদিকে দ্রুত

উন্নয়নের যেমন চাপ রয়েছে তেমনি সাথে সাথে অর্থনীতির পুনর্গঠনের চাপও রয়েছে। ব্যাপক জনসংখ্যা, দুর্বল অর্থনীতি ও দুর্বল উৎপাদন কাঠামো সমন্বিত চীন এমন উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। নবগঠিত দারীদ্রসীমার নীরিখে চীনে বর্তমানে প্রাব ১২৮ মিলিয়ন দরিদ্র জনগণ গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করে। এবং প্রতিবছরে গড়ে ১০ মিলিয়নের ও অধিক চীনা জনগণ শ্রমিক শ্রেনীতে পরিণত হচ্ছে। এছাড়াও পণ্যের দূষণের সমস্যাও বর্তমানে ভীষণ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। ফলত, পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রগতির ধারাকে নিরবিচ্ছিন্ন রাখাই চীনের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। তৃতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা চীনে ক্রমশ সুষ্ঠভাবে প্রতিয়মান। শিল্পকাঠামোও খুব একটা শক্তিশালী নয়। আবার আভ্যন্তরিন ও বাহ্যিক চাহিদা, বিনিয়োগ ও ভোগের মধ্যেও ভাবসামভহীনতা প্রবল। ফলত সেখানে বিনিয়োগ ও বপানীর উপরই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নির্ভূরশীল।আবার আভ্যন্তরীন চাহিদাও পর্যাপ্ত নয়।

যেহেতু বীশ্বের মোট জনগণের মধ্যে চীন ও ভারতেই প্রায় এক তৃতীয়াংশ বসবাস করে তাই স্বাভাবিকভাবেই উভয় রাষ্ট্রই চায় দারীদ্র দূরীকরণের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক আধুনিকীকরণ করা। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত প্রবাদ "আমরা ভোগ করতে নয় বরং বাঁচতেই উৎপাদন করি", প্রাচীন চীনের "মানুষ ও ঈশ্বরের ঐক্যতা" এবং "প্রাকৃতিকে অণুসরন করবে নিয়মনীতি" ইত্যাদির মধ্যেই সনাতনী জ্ঞান তথা পরিবেশ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। একারণেই আসন্ন "RiO+20" সম্মেলনে আমরা স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থে ভারত ও চীনের যৌথ উদ্যোগ আশা করছি। আমরা আশাবাদী যে 'RiO +20' সম্মেলন নতুন করে স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে একটা সুদৃঢ়, স্পষ্ট ও ইতিবাচক বার্তা বহন করবে।

**তথ্যসূত্র :** http ://www.indianexpress.com/news/tackling-challenges for-sustainable-development/964069/0, Accessed on 20/6/12

## ৪.২.১. পরিবেশ ও স্থিতিশীল উন্নয়নের মৌলবিষয় :

### জনসংখ্যা এবং তার ফলাফল :

দুটি বিষয় পরিবেশকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। যথা (ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও (খ) অর্থনৈতিক বিকাশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পদের ব্যবহার ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদির আন্তসম্পর্ক নিয়ে বহু বিতর্ক লক্ষভ করা যায়। জনসংখ্যার দ্রুত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ও ব্যাপক বৃদ্ধি পরিবেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বহু চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞগন মনে করেন যে বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নতি, শিল্পের বিকাশ ও অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রগতিই হল সুস্থ পরিবেশের ক্ষেত্রে আশঙ্কার প্রধান কারণ।

বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যাব -

$I = P X A X T$

where, I = Impact of environment (পরিবেশের প্রভাব)

P = Population (জনসংখ্যা)

A = Affluence (Consumption - ভোগ)

T = Technology Coefficient (প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষতা)

অধিক জনসংখ্যা মানেই অধিক শক্তির ভোগ, অধিক সম্পদের ব্যবহার, অধিক বর্জ্যের সৃষ্টি (গ্রীন হাউস সহ) - যেগুলির সবই পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের জনসংখ্যা একশো কোটি ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা কী এই অধিক জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার মতো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পেরেছি ? যদি না করে থাকি তাহলে পরিবেশের ধ্বংসসাধন, অবনমন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশের ক্ষেত্রে এই জনসংখ্যাই প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

স্থিতিশিল উন্নয়ন আসলে সাম্য ও সংহতির বাস্তবায়নের একটা প্রক্রিয়া। কিন্তু ভবিষ্যতে সাম্য নীতিকে বজায় রাখাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে জনসংখ্যা অবৈজ্ঞানিক ও অবাঞ্ছিত হাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে উপেক্ষা করা উচিৎ হবে না। তাই বলা যায়, সাম্য, পরিবেশ সুরক্ষা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদিকে স্থিতিশিল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে।

## বিকাশের সীমা (Limits to Growth) :

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য, তথা পরিবেশ সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন আচরণ মনোভাবের পরিবর্তণ, ভোগ করার নীতি, উৎপাদন ও বাজারীকরণের প্রক্রিয়া ইত্যাদির পরিবর্তণ ও সাথে সাথে এমন এক প্রযুক্তির উন্নত বিশ্ব প্রয়োজন যা এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে। কেবল দক্ষতা বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট হবে না। বিকাশকে সীমারেখাহীন বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। পৃথিবীর বহন ক্ষমতাকে কখনোই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় নি। একারণেই বিশ্বকে সর্বদাই পরিবেশ সম্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো পরিবেশ পরিবর্তনেদর

সমস্যাকে একমাত্র মোকাবিলা করা যায় যদি বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্বণহীন (Non Carbon) শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায়। এবং একমাত্র তখনই পরিবেশের উপর কার্বনমুক্ত অর্থনীতির সমস্যা নিরসন হবে। বর্তমান বিশ্বে এমন এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন যা সমগ্র জাতিরাষ্ট্রকে কেবল তাদের নিজের ভিত্তিতে বাঁচার প্রয়োজনেই সরবরাহ করবে না সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী কার্বনমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিকাশ ঘটবে।

টিপ্পনী

এ প্রসঙ্গে বলা যায় জীবন যাত্রার মান বিনষ্ট না করেও কাঁচামাল, ও শক্তির ব্যবহার হ্রাস করা তথা বন্ধ করা যায়। এটা কেবলমাত্র আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব হবে যার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নতি বা প্রসার প্রয়োজন। এরজন্য প্রয়োজন সন্তুষ্টি সংক্রান্ত রীতির ধারনাগত মনোভাব পরিবর্তন ও সম্পদে (কাঁচামাল) সন্তুষ্টি তার একটা সীমারেখা স্থির করে দেওয়া যা হবে অলঙ্ঘনযোগ্য।

'পর্যাপ্ত' বা 'সন্তুষ্টি' (Suddciency)-র ধারণা বা আদর্শ তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যদি 'বিকাশের একটা সীমারেখা' (limits to growth) স্থির করে দেওয়া যায় আন্তর্জাতিক স্তরে চুক্তির মাধ্যমে। যদিও এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে চুক্তি বা ঐক্যমত্য কল্পনামাত্র বলা যায়।

বিশ্বব্যাপী সাধারণ ব্যবস্থাকে (Global Common System) স্থিতিশীল উন্নয়নের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার করতে হলে কিছু সুনির্দিষ্ট পৃথক নীতি গ্রহণ করতেই হবে। এমন একটা সাধারণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যার দ্বারা সেই সব রাষ্ট্রগুলি যেন সমতার নীতিতে অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে যারা পরিবেশকে স্থিতিশীল উন্নয়নের নীতিতে ব্যবহার করে এসেছে এবং যে সব রাষ্ট্রগুলি তা করেনি তারা যেন এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে চলেছে।

## অর্থনীতি (Economy) :

যেকোন রাষ্ট্রের অথর্যনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সর্বপ্রধান মাপকাঠি হল সেই রাষ্ট্রের বার্ষিক জাতীয় আয় (Gross National Product - GNP)। এই GNP -র বৃদ্ধির মাধ্যমেই বোঝা যায় রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করছে কিনা। যদিও এই বৃদ্ধির বিষয়টি নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ করার মাত্রার উপর যার সাথে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণভাবে জড়িত। তাই বলা যায়, পরিবেশ সুরক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আবদ্ধ।

ভারত উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের হাত ধরে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে ব্রতী

টিপ্পনী

হয়েছে। যদিও এই অর্থনৈতিক সংসকারমূলক নীতিবহু ইতিবাচক দিক রয়েছে তথাপি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। GNP বৃদ্ধি করতে গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করার অধিকার আমাদের নেই।

দ্রুত ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে পুনর্ণবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাটন, পরিবর্তন ও ভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাই এটা নিশ্চিত করতেই হবে যেমন সম্পদের পুনরুজ্জীবন বা পুনর্ণবীকরণ সম্ভব হয়।

স্থিতিশীল প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়টিকে ব্যাতি রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা কাম্য নয়। প্রকৃতি তথা পরিবেশকে সুরক্ষিত রেখেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হবে। মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের স্বার্থে বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে অবশ্যই উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতেই হবে। তাই এই দেশগুলির GNP বৃদ্ধি করতেই হবে। তাই এই উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে সম্পদ পুনর্ণবীকরণ বা পুনর্ব্যবহার, তথা পরিবেশগত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেই হবে।

## দারিদ্র্য (Poverty) :

উন্নয়ন ও পরিবেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে যে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই তাদেদর জীবনধারণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। তাই স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণার মধ্যে দারিদ্র্যকরণ কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে যাতে করে বিশেষত মহিলা ও যুবকের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

## মানব সুরক্ষার বিষয়সমূহ :

শহরাঞ্চল ও ফ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের প্রভাব পরিবেশের উপর কী ধরণের পড়ছে তা অণুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের দরীদ্র জনগণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলি হল :

(ক) প্রত্যেককে আশ্রয়স্থান প্রদান ;

(খ) কঠিন বর্জ্য, আবর্জনা নিষ্কাশন ও জল নির্গমণের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ।

(গ) বিদ্যুৎ, শক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার স্থিতিশীল উন্নয়ন ;

(ঘ) জমির ব্যবস্থার ও ব্যবস্থাপোনার স্থিতিশীল উন্নয়ন।

### ভূমিসম্পদ :

ভূখন্ড কোন রাষ্ট্রের কেবল ভৌগলিক বিবরনই দেয় না, সাথে সাথে তার ভূ-সম্পদ যেমন, মাটি, খনিজসম্পদ, জৈব উপাদন ইত্যাদিকেও বোঝায় । মানব জীবনের সুস্থ বিকাশের ক্ষেত্রে এই সম্পদগুলি বিভিন্ন ধরণের ভূমিকা পালন করে। তাই ভূখন্ডকে যথাযথ মানব-স্বার্থে ব্যবহারের জন্য সুসংহত স্থিতিশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

### অরণ্য :

অরণ্য ও অরণ্যভূমির পরিচালনায় যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। তাই স্থিতিশীল অরণ্য নীতি, উন্নয়, অরণ্যসম্পদের যথাযথ উৎপাদনক ও পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক নীতি রাষ্ট্রীয় স্তরে গ্রহণ করতে হবে।

## অনুশীলন :

১. স্থিতিশীল উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও।

২. অ-স্থিতিশীলতার দুটি প্রধান কারণ লেখ।

## ৪.৩. পরিবেশগত নৈতিকতা : সমস্যা ও সাম্ভাব্য সমাধান

মানুষের সাথে পরিবেশেদর আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা, নীতি ও নির্দেশিকাই হল পরিবেশ নীতি । একথা যথার্থই বলা হয়ে থাকনে যে "The environmental Crisis is an outward manifestation of Crisis of mind and Spirit." অর্থাৎ, আমরা কি ভাবি ও কি আচরণ করি তার উপরই পরিবেশ সমস্যার বিষয়টি নির্ভর করে। আমরা যদিই এরকম চিন্তা করি যে মানুষ হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান এবং সে নিজের ইচ্ছামত পরিবেশকে ব্যবহার করতে পারে তাহলে তা হল মানুষের ব্যাক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা এর পরিবর্তে আমরা যদি এটা ভাবি যে মানুষকে একটা সুন্দর জীবনের জন্য পরিবেশ মায়ের মতোই তার সব সম্পদ ও স্নেহ দিয়েছে। তাই আমাদের উচিৎ তাকে শ্রদ্ধা করা ও সুরক্ষিত করা, তাহলে তা হবে পরিবেশ কেন্দ্রিক ভাবনা।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্ব দেয় ব্যাপক প্রযুক্তিগত বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশের উপর মানুষের গৌরবময় আধিপত্যের উপর। এমনকি, পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্টিকরণ তথা পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে উপেক্ষা করেও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিশ্ব পরিবেশের উপর মানুষের আধিপত্যের উপর গুরুত্ব দেয় এই দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটির মূল কথা হল অন্যান্য জীবকূলে মতোই মানুষের উচিৎ পরিবেশকে ধ্বংস না করে এর অঙ্গ হিসাবে বাস করা অর্থাৎ স্থিতিশীলতা বজায় রেখে পরিবেশকে সুরক্ষিত করে জীবনযাপন করা। তাই আমরা যদি পরিবেশকে রক্ষা করতে চাই তাহলে আমাদের আচরণ ও মানসিকতায় পরিবর্তন আনতেই হবে, যা আমাদের এক সুন্দর ও উন্নতর ভবিষ্যত নিশ্চিত করবে।

পরিবেশ রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীকে আলোচনা করা হল -

মানবকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী (Anthropocentric World view) :

অধিকাংশ শিল্পোন্নত সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা আরোপ করা হয়। এতে মনে করা হয় যে পৃথিবীকে যথাযথ ভাবে পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। এই ভাবনা মূলত মানব-কেন্দ্রীক। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল -

১. মানুষ হল সর্বপ্রধান জীব, যে প্রকৃতির তথা সমগ্র জীবকূলের ধারক।

২. প্রাকৃতিক সম্পদ হল সীমাহীন এবং তা কেবল মানুষেরই জন্যই প্রদত্ত।

৩. মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যই অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন এবং এই উন্নয়ন যতবেশী করা যাবে তার তত বেশী সুফল মানবসভ্যতা ভোগ করতে পারবে। কারণ আর্থিক বিকাশ সীমাহীন ভাবে করা যার এবং সেটীই কাম্য।

৪. একটি সুস্থ পরিবেশ নির্ভর করে সুস্থ ও সসংগঠিত অর্থনীতির উপর।

৫. মানবসভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশ নির্ভর করে মানুষ প্রকৃতির সম্পদকে কতটা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছে তার উপর।

## প্রকৃতিকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী (Ecocentric World view) :

এই দৃষ্টিভঙ্গী মূলত প্রকৃতির সুরক্ষাকেন্দ্রীক। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল : -

১. প্রকৃতি কেবল মানবজাতির জন্য নয়, বরং তা অন্যান্য সকল জীবকূলের জন্য।

২. পৃথিবীর সম্পদ সীমিত এবং তা কেবলমাত্র মানুষের ভোগ করার জন্য নয়।

৩. অর্থনৈতিক বিকাশ কেবল ততটা পর্যন্তই ভালো যতটা পর্যন্ত এটা পৃথিবী স্থিতিশীল উন্নয়নকে নিশ্চিত করে। এবং যখন তা প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তখন তা কখনোই কাম্য নয়।

৪. একটি সুস্থ অর্থনীতি নির্ভর করে একটি সুস্থ ও সুসংগঠিত পরিবেশের উপর।

৫. মানবসভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশ নির্ভর করে মানুষ অন্যান্য জীবজগতের সাথে কতটা সহযোগিতা মূলক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ করতে পারছে তার উপর।

আমাদের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে পরিবেশ নীতি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল :-

- প্রকৃতি যেহেতু আশীর্বাদ ও স্নেহ করে বাঁচিয়ে রেখেছে তেমনি আমাদেরও পৃথিবীকে ভালোবাসতে হবে ও শ্রদ্ধা করতে হবে।
- ঋতুবৈচিত্র্য অনুযায়ী প্রকৃতিকে প্রত্যহ সুরক্ষিত করতে হবে ও সেই অনুযায়ী একে ভোগ করতে হবে।
- অন্য জিয়জগতের তুলনায় নিজেকে মহান ভেবে অণ্যপ্রানীর অস্তিত্বকে সংকটের মুখে ফেলা ঠিক নয়।
- যে উদ্ভিদ ও প্রানীজগৎ আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, ও বাসস্থান দেয় তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ করা দরকার কারণ অধিক জনসংখ্যা পৃথিবীর প্রকৃতির উপর নেতীবাচক প্রভাব ফেলবে।
- ধ্বংসমূলক মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করা উচিৎ নয়।
- প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করে নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি কায়েম করার লালসা ত্যাগ করা উচিৎ। বরং সম্পদের পুনর্ব্যবহার ও বিকল্প ব্যবহারকে নিশ্চিত করা উচিৎ।
- পৃথিবীতে একজনের অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈজ্ঞানিক জীবন যাপনের জন্য যে ক্ষতি হচ্ছে তা বোঝা অণ্যকে বহন যাতে না করতে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থ ও সুরক্ষিত পরিবেশে বাঁচার অধিকারকে দূষণ ও দারিদ্রকরণের মাধ্যমে খর্ব করা যাবে না।
- বিশ্ব প্রকৃতির আশির্বাদ স্বরূপ সম্পদকে এমনভাবে ভোগ করতে হবে যাতে করে সকল জীবকূলই তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। কারণ প্রকৃতি কারো একার নয়।

আমরা যদি এই দশ ধরনের পরিবেশনীতিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে প্রায় সকল ধর্মই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের এই পরিবেশ

টিপ্পনী

নীতিরই কথা শিখিয়েছে।

পরিবেশনিতি এই বিষয়গুলি আমাদের বেদও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে শুধু তাই নয়, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে (জল, মাটি, বায়ু, মেঘ) বিভিন্ন দেব-দেবীর সাথে তুলনা করে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ককনে আত্মিক ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে । আমাদেদর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও রীতিনীতি ও আমাদের পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন উৎসব মানুষ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে পালন করে (যেমন - নীসর্গ পূজা, সত্যনারায়ন পূজা, বৈশাখী পূজা, গণেশ পূজা, দশেরা ইত্যাদি)

টিপ্পনী

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মে যে অহিংসারনীতি আছে তাতেও পরিবেশ ও জীবকূলের সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, মূলত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দ্বারা আবার অল্পতে সন্তুষ্টি'র যে ধারণা বিভিন্ন ধর্ম প্রচার করে থাকে তারও মূল উদ্দেশ্য হল 'Limits to growth' নীনতি, যা পরিবেশকেন্দ্রীক জীবনন যাপনের উপর গুরুত্ব দেয়।

## 8.৩.১. পরিবেশ সচেতনতা (Envirommental Awareness) :

পরিবেশের বিষয়ে জনসচেতনতার বিষয়টি এখনো পুরোপুরি প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। যদিও দেরী করে হলেও বর্তমানে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনো পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি ভীষণভাবেই অসম্পূর্ণ। তাই মাঝে মাঝেই এই সংক্রান্ত বিষয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণ লক্ষ্য করা যায়।

ব্যাপক উন্নয়ন যদিও আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছে ; তথাপি এটা মনে রাখতে হবে যে এর ফলস্বরূপ পরিবেশের ব্যাপক অবনমন বা বিপর্যয় হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও তৎসংক্রান্ত পরিবেশ আন্দোলনকে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়ন বিরোধী (Anti-development) তকমা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টি এমনভাবে হওয়া উচিৎ যাতে করে আমাদের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যও বজায় থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট না হয়।

মানবসমাজে পরিবেশ সচেতনতার ব্যাপক অভাবের মূল কারণগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় :-

১. বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশে যে পাঠক্রম আছে তা সাফল্যের সাথে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত

করতে ব্যার্থ হয়েছে।

২. আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত - প্রণয়নকারীগন, রাজনীতিবিদগণ ও প্রশাসকরা যথেষ্ট প্রশিক্ষিত না হওয়ায় পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনেকক্ষেত্রেই অন্তর্ভূক্ত হয় নি।

৩. উন্নয়নের উচ্চাকাঙ্খার দরুণ অনেক ক্ষেত্রেই কোনো প্রকল্পকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিবেশ সমস্যার প্রশ্নকে ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে রাখা হয় বা উপেক্ষা করা হয়।

৪. দারীদ্র দূরীকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করেছে।

## পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশলসমূহ (Methods to Propagate Environmental Awareness) :

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতার ব্যাপোক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করে এই সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সকলকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে কারণ পরিবেশ সকলেরই জকন্য অপরিহার্য্য।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই পরিবেশ সচেতনতার বিভিন্ন পর্যায় ও কৌশল নিম্নে আলোচনা করা হল : -

**১. ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে :** শিশু অবস্থা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা প্রদন করতে হবে। যদিও বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের উপর ভিত্তি করে সমস্ত বিদ্যালাভ ও মহাবিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এই পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছ।

**২. জনগণের মধ্যে গণমাধ্যমের মাধ্যমে :** বিভিন্ন অণুচ্ছেদ, শিরোনাম, ঘটনা, অভিযান, মিছিলল, পথনাটিকা, দূরদশনের গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

**৩. পরিকল্পনা রূপকার, সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ও নেতানেত্রীদের মধ্যে :** বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম (বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণীত করার প্রকল্প ) ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এই শ্রেনীর মানুষের মধ্যে পরিবেশের বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা যায়।

টিপ্পনী

## অ-রাষ্ট্রীয় বেসরকারী কারকের ভূমিকা (Non Governing organization -NGO's) :

স্থানীয় তৃনমূল স্তরের বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী সংগঠন পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ স্থানীয় পরিবেশ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে এই সংগঠনগুলি যোগসূত্র স্থাপন করতে পপারে। এগুলি একদিকে কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী ও অন্যদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করতে পারে । পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নানা গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগুলি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ গোপেশ্বরের চিপকো আন্দোলনের সময় 'দার্সোলি গ্রাম স্বরাজ্য মন্ডল' ও 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের কল্পবারিক্ষা (Kalpvariksha) -এর কথা বলা যায়, যেগুলি অরাষ্ট্রীয় কারক বা বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGOs) হিসাবে পরিবেশ আন্দোলনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এছাড়াও The Bombay Natural History Society (BNHS), the Worldwide Fund for Nature India (WWF-India), কেরলে শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, Central for Science and Environment (CSE) এবং আরো কিছু সংগঠন রয়েছে যেগুলি গবেষণাসহ বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । যেমন অতি সম্প্রতিকালে কোকাকোলা পানীয়তে অতিমাত্রায় কীটনাশক (Pesticides) মেশানোর বিষয়টি CSE যেভাবে জনসমক্ষে এনেছিল তাতে মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও সচেতনতা গড়ে উঠেছিল।

তাই বলা যায়, পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা অপরিহার্য্য । অন্যভাবে বলা যায়, "সবুজায়নের স্বপ্নপূরণ করতে হলে সবুজের কথা ভাবতে হবে।"

## অনুশীলনী :

৩. পরিবেশ-নীতি বলতে কী বোঝ ?

৪. পরিবেশ নীতির যেকোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি লেখ ?

৫. গণমাধ্যমের দ্বারা কীভাবে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা যায় তার উদাহরণ

দাও।

## সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (Social Impact Assessment - SIA)

এই পর্বে আমরা Social Impact Assessment (SIA) সম্পর্কে আলোচনা করব -

১. উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রভাব বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সমাজে এর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু সুফল পাওয়া গেলেও অনেকসময় দেখা যায় প্রকল্প অঞ্চলের অধিবাসীগণের উপর তার প্রত্যক্ষ নেতীবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই প্রকল্পের ফলস্বরূপ যখন তাদের বলপূর্বক জীবনযাত্রার পরিবর্তনে বাধ্য করা হয়। এই সব গণগোষ্ঠীর সমস্যা বর্তমানে পরিবেশ সমস্যার অণ্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে বর্তমানে এই প্রয়োজনীয়তা বেশি করে প্রতিয়মান হচ্ছে যে উন্নয়ন প্রকল্পের কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তা নির্ধারণ করা, যাতে করে প্রাক প্রকল্প পর্বেই সমস্যা নিরসনের পরিকল্পনা করে নেওয়া যায়।

(২) 2009 সালের 'The National R & R. Policy' যেকোন প্রকল্প রূপায়নের পূর্বে 'সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন' (Social Impact Assessment - SIA) এর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছে। এপ্রসঙ্গে, চতুর্থ অথ্যায়ের ৪.১ পর্বে SIA র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে -

"যখন কোথাও নতুন কোন প্রকল্প গৃহীত হবে বা পুরাতন কোন প্রকল্পকে বৃদ্ধি করার বিষয়টি বাস্তবায়ন কর হবে, যা কমপক্ষে ৪০০ (চারশো) বা ততোধিক পরিবারকে বাসস্থানচ্যুত করবে, অথবা ২০০ (দুইশো) বা ততোধিক উপজাতি অধ্যুষিত পরিবারকে উৎখাত করবে তাহলে সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপসিলে উল্লিখিত DDP ব্লক অনুযায়ি সরকারকে অবশ্যই Social Impact Assessment (সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন) করতে হবে যাতে করে প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করা যায়।

(৩) যদিও নতুন 'National R & R Policy অনুযায়ি নতুন প্রকল্প রূপায়ন বা পুরাতন প্রকল্প সম্প্রসারণের পূর্বে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA) করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তথাপি এখনো পর্যন্ত এর কোন স্পষ্ট নির্দেশাবলী (Guidelinhe) করা যায়নি। SIA এ এই উদ্যোগ মূলক এই ফাঁকাটাকেই পূরণ করতে চায়। এক্ষেত্রে একটি ছোট বই (Handbook) তৈরি করা হয়েছে, যার দ্বারা Social Impact Assessment কে যথাযথ ভাবে অণুধাবন করা যাবে, কীভাবে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রতিটি ধাপে SIA বাস্তবায়ন করা হবে তা নির্ধারণ করা যাবে ও কোন কৌশল অবলম্বণে SIA করা যাবে তা বোঝা সম্ভব হবে। এক কথায় বলা যায় 2009 সালের National R & R Policy অনুইযায়ী SIA কীভাবে, কোন কৌশল হবে তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে এই বই এর মাধ্যমে।

(8) SIA এর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য, বিশেষত সরকারে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পকে রূপদানের জন্য SIA সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর চাহিদা দেখা যাচ্ছে।

## সামাজিক প্রভাব ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন :

(১) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের নীতি, পরিকল্পনা, কার্যধারা ও প্রকল্প (Policies, Plans, Progframes and Project PPPPs) ইত্যাদির সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বর্তমানে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কর্তৃপক্ষের মধ্যে অধিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা যায় SIA এই সব প্রকল্পের কী ধরণের সামাজিক প্রভাব পড়তে পারে তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারবে।

(২) যেকোন প্রকল্পের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এই SIA এর মাধ্যমে সরকার জানতে পারে। ফলে কোন প্রকল্পের নেতীবাচক প্রভাব সম্পর্কে SIA এর দ্বারা তথ্য পেয়ে সরকার সহজেই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি গ্রহণ করা, কাজ চালিয়ে যাওয়া অথবা কাজ বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ কিনা। SIA এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল এই যে এর দ্বারা রাষ্ট্র তথা সরকার আগে থেকেই কোন প্রকল্পের ফলে যে নেতীবাচক প্রভাব পরিবেশের উপর পড়তে পারে তা মোকাবিলা করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারে।

(৩) বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত উপদেষ্টা সম্প্রদাব বা গোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারে SIA। কোন প্রকল্পের অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় বিকল্প প্রতিবিধান সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে SIA সহায়তা করতে পারে।

## একটি ঐতিহাসিক সন্ধান :

(১) সমাজবিজ্ঞানের উষালগ্ন থেকেই বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে সামজিক প্রভাব মূল্যায়নের (SIA) কাজ করে আসছেন। উনবিংশ শতকে Condorcet কর্তৃক সম্পাদিত একটি ক্যানেল স্টাডি (Canel Study) কেই প্রথম 'সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন' (Sociall Impact Assesment) বলে গণ্য করা হয় (Prendergast, 1989)। যদিও বর্তমানে SIA বলতে যা বোঝা হয় তার প্রচলণ বহু পরে হয়েছে।

(২) সাম্প্রতিককালে SIA এর প্রথম ধারণাগত সূত্রপাত ১৯৭০ এর দশকে। মূলত এই সময় থেকেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ণের পূর্বে প্রকল্পটির পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অনুধাবণের কাজ শুরু হয়, যাতে করে প্রকল্পটি সম্পাদন করা, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা অথবা বাতিল করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

(৩) ১৯৮০ -র দশক থেকে প্রভাব মূল্যায়নের বহু নতুন পদ্ধতি ও কৌশল রাষ্ট্রীয় স্তরে গ্রহণ করা হয়। যেমন - Rapid Rural Appriasal (RRA), Participatory Action Research (PAR), Participatory Rural Apprisal (PRA) ইত্যাদি (Chambers 1997 ; Oommch 2007)। এগুলির মাধ্যমে এই কাজে জনগণকে প্রত্যাশা ভাবে মূল্যায়নের বিষয়ে অংশগ্রহণের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৪) ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীরা SIA -র বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী প্রণয়ন করেন ৯IOCPGSIA : 1994 এবং 2003, এবং IAIA : 2003)। এই সময় থেকেই যেকোন প্রকল্প রূপায়নের পূর্বে SIA -র মাধ্যমে তার সাম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়টি আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে যে কোন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে SIA-র বিষয়টি আনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে : এমনকি, কিছু দেশে তা আইনগত মর্যাদাও পেয়েছে।

(৫) বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে SIA-এর বিষয়টি বাধ্যতামূলক ভাবেই করা হচ্ছে। যেমন পানীয়জল, স্বাস্থ্য ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা খনিজ সম্পদ, শহরেদর যোগাযোগ ব্যবস্থা, মেষপালন সংক্রান্ত প্রকল্প ইত্যাদি (Cerrnea and Kudat 1997 ; Roche 1999)। বিশেষত, পুনর্বাসন সংক্রন্ত প্রকল্পগুলিতে SIA-র উপযোগিতা বেশী দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে Modak এর Biswas (1999 :209) উল্লেখ করেছেন -

> "SIA মূলত যেকোন প্রকল্পের দ্বারা করা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা চিহ্নিত করা থাকে। এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির নেতীবাচক প্রভাবকে কীভাবে নিরসন করা যায় তা দেখার সাথে সাথে কীভাবে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় তার ব্যবস্থা করে থাকে।"

(৬) সাম্প্রতিককালে SIA-র প্রায়োগিক দিক ও পদ্ধতির বিষয়ে বহু গবেষণা হচ্ছে। বিশেষত বিভিন্ন পেশাদারী ও শিক্ষাগত পাঠক্রমের মাধ্যমে SIA -র

টিপ্পনী

বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। কোন প্রকল্পের প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও মূল্যায়নের জন্য বহুসংখ্যক পরামর্শদাতা সংগঠন গড়ে উঠেছে। কোন নতুন প্রকল্প গ্রহনের পূর্বে এইসব প্রতিষ্ঠান গুলির কাছে বিশেষও পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে যাতে করে প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পর্কে SIA রিপোর্ট তৈরি করে সব দিক বিবেচনা করে এগোনো যায়।

(৭) প্রথমের দিকে 'পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন' (Environmental Impact Assessment) -এর অংশ হিসাবে SIA (Social Impact Assessment) কাজ শুরু করলেও বর্তমানে SIA সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে ; কারণ এই দুটি ভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের পদ্ধতি হিসাবে কাজ করে।

## ভারতবর্ষে বর্তমান চিত্র (Current Scene in India) :

(১) ভারতে মূলত Environment Impact Assessment (EIA) এর অংশ হিসাবেই SIA সম্পাদিত হয়ে থাকে। ফলত EIA এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এখনো পর্যন্ত ভারতে SIA সেভাবে প্রাপ্য গুরুত্ব পায় নি বললেই চলে।

(২) সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রস্তুতিতে SIA ভীষণ গুরুত্ব সহকারে করা হচ্ছে। বিশেষত, বিভিন্ন Resettlement Action Plane (RAPs) এর প্রস্তুতিতে (পূনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প) SIA গুরুত্ব পাচ্ছে। কোনো গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মানুষ তথা সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর তার কী সামজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ছে তা অনুধাবণ করার আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়াটি এই SIA-র মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এমন কি প্রকল্পের জন্য স্থানচ্যুত (Displaced) উৎবাস্তু জনগোষ্ঠীর উপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব ও এই SIA -র দ্বারা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তার উপরই ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট ক্ষয়ক্ষতির নিরসণ ও তৎসংক্রান্ত কার্যপ্রক্রিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে থাকে SIA-র দ্বারা।

(৩) পুনর্বাসন প্রকল্প সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার SIA বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে 2006 সালের 'Orissa R & R Policy তে SIA কে প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার 2007 সালের The National R & R Policy-র মাধ্যমে কোন নতুন প্রকল্প গ্রহণ অথবা কোন পুরাতণ প্রকল্পের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে SIA কে গ্রহণ করার সংস্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয় (Anmex IV দেখুন)। তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ভাবে 400 বা তার বেশী সমতলভূমির অন্তর্ভুক্ত পরিবারকে উৎখাত করবে অথবা পার্বত্য উপজাতি অঞ্চলই বা সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলে উল্লিখিত উল্লিখিত DDP ব্লকের বসবাসকারী 200 বা তার

বেশী পরিবারকে উৎখাত করবে কেবল সেই সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এই SIA-র বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এগুলি খুব ভালো পদক্ষেপ হলেও এখনো পর্যন্ত এই সংক্রান্ত কোন সরকারী নির্দেশাবলী (Guideline ) হয় নি।

(৪) এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, যে সমস্ত প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক, ADB, IFC, UNDP এমনকি বানিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে সেগুলির ক্ষেত্রে পূর্বে SIA -র রিপোর্ট তৈরি করা উচিৎ।

(৫) SIA -র প্রয়োজন আছে কিনা, এটা কার্যকর করা উচিৎ কিনা, ইত্যাদির থেকেও এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল SIA কি পদ্ধতিতে করা উচিৎ অর্থাৎ SIA এমনভাবে করতে হবে যাতে করে প্রকল্পের প্রত্যক্ষা সুফল লাভ করতে পারে।

## সামাজিক প্রভাব কী ? (What are social Impacts?) :

(১) বাহ্যিকভাবে সৃষ্টিহওয়া কোন পরিবর্তনজনিত কারণে কোন ব্যাক্তি ও সম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব পড়ে তাকে সামাজিক প্রভাব বলা হয়, IOCPGSIA (2003 : 231) এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী সামাজিক প্রভাব হল, "কোন সরকারী বা বেসরকারী কর্মকান্ডের প্রভাবে ব্যাক্তি মানুষের জীবন যাত্রায়, যথা তাদের কাজে, ভূমিকায়, পারস্পারিক সম্পর্কে, ইত্যাদিতে যে পরিবর্তন আসে তাকে সামাজিক প্রভাব (Social Impact) বলা যায়।" আবার সমাজের নানা সাংস্কৃতিক দিক, অর্থাৎ মানুষের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, নীতিবোধ ইত্যাদির উপর কোন সরকারী বা বেসরকারি (Public or Private) কর্মপ্রকল্পের যে প্রভাব পড়ে তাকেও সামাজিক প্রভাব বলা হয়। এই সামাজিক প্রভাব ইতিবাচক ও নেতীবাচক উভয় ধরণেরই হতে পারে।

(২) সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী, আয়, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদন, জীবন যাত্রার ধরণ, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, ব্যাক্তিগত অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, আশা-আকাঙ্খা, ভয়-আশঙ্কা ইত্যাদি সবকিছুরই উপর সামাজিক প্রভাব ও তৎসংক্রান্ত পরিবর্তন পড়তে পারে যা ইতিবাচক বা নেতীবাচক উভয়ই হতে পারে। এককথা বলা যায়, ব্যাক্তি জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক বা নেতীবাচক পরিবর্তনই হল সামাজিক প্রভাব।

(৩) যেসব প্রকল্পের সুস্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল - সেতু ও জলাধার (বিনষ্টিকরণ বা পুনর্গঠন), বৈদ্যুতিক ও শিল্পস্থাপনের প্রকল্প (নতুন, পুনর্গঠন ইত্যাদি), রাস্তা নির্মাণ, ভূমিসংস্কার বর্জ্য নিষ্কাশন সংক্রান্ত প্রকল্প (যা সরাসরি জনস্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত) ইত্যাদি।

টিপ্পনী

## বিভিন্নধরনের প্রভাব (Differential Impacts) :

যেকোন প্রকল্পের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ে থাকে। এর দ্বারা কারো জীবনে ইতিবাচক সুবিধা লাভ ঘটলেও কারও আবার ক্ষতিও হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের ফলে সমাজের সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্থা মানুষের জীবন বেশী প্রভাবিত হব - যেমন উপজাতি আদিবাসী মানুষ (Tribal), মহিলাচালিত পরিবার, বয়স্ক মানুষ, ওভূমিহীন কৃষক ও সর্বোপরি দরীদ্র জনগোষ্ঠী।

প্রভাবের ধরণ (Types of Impacts) :

সকল প্রকল্পের একই ধরণের প্রভাব দেখা যায় না। যেমন জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিরপ্রভাবের তুলনায় শহরাঞ্চলের প্রকল্পের প্রভাব ভিন্ন ধরণের হবে থাকে। সাধারণ জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রভাব গুলি হল : -

- গ্রামীন উপজাতি কৃষিনির্ভর পার্বত্য অঞ্চল ভুক্ত বিরল জনবসতি সম্পন্ন জলমগ্ন এলাকায় প্রকল্পের প্রভাব ;
- বলপূর্বক উৎখাত (Displacement), যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপক দারিদ্র্য সৃষ্টি করে ;
- অতিরিক্ত জনবসতি সম্পন্ন ঘিঞ্জি এলাকা, যেখানে পরিকাঠামো সংক্রান্ত শ্রমিক এবং দুর্ণীতি ও অপরাধমূলক কাজের দুস্কৃতির ব্যাপক সমাগম ঘটে এমন এলাকার প্রভাব ;
- কৃষিজাত পণ্যের উৎওপাদনে পরিবর্তনের ফলে বিকৃত সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি।

অন্যদিকে, বিভিন্ন শহুরে প্রকল্পগুলির ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলমগ্নতার প্রভাব ও পরিবর্তন দেখা যায় না। এখানে জনগণ কৃষিজমির হারাণোর (জলমগ্নতার জন্য ) সমস্যায় নয় বরং কাজ হারানোর সমস্যায় পড়ে।

নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাম্ভাব্য প্রভাবের একটি তালিকা দেওয়া হল -

## সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব :

- সম্প্রদায়গত সংহতি বিনষ্টিকরণ।
- সামজিক ঐক্যবদ্ধতা তথা সংহতির বিনষ্টিকরন,
- মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নেতীবাচক প্রভাব বা বিপর্যয়,
- ধর্মীয় পূণ্যস্থান (ঐতিহ্যমন্ডিত) এর ক্ষতি
- ঐতিহ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানের বিনষ্টিকরন ইত্যাদি।

## অর্থনৈতিক প্রভাব :

- কৃষিজমি, উদ্ভিদ ও জলাধারের ক্ষতি।
- বাসস্থান ও কামারের ক্ষতি বা ধ্বংসসাধন ;
- সাধারণ সম্পদের ক্ষতি।
- বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকানপাঠ ইত্যাদির ক্ষতি।
- ব্যবসা বানীজ্য এর ক্ষতি।
- উপরিউক্ত ক্ষয়ক্ষতির দরুণ ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি ও আয়ের হ্রাস।

## সরকারী পরিকাঠামো ও পরিষেবা :

- সরকারী দপ্তর নির্মাণ।
- বিদ্যালয় নির্মাণ।
- হাসপাতাল নির্মাণ।
- রাস্তাঘাট নির্মাণ
- রাস্তাঘাট আলোকসজ্জায় সজ্জিতকরন।

## দারিদ্র্যকরণের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ :

(১) বিভিন্ন ধরনের ভরসাম্যহীন প্রতিকূল প্রকল্পের প্রভাবে যে দারিদ্র্যকরণ ঘটে তা চিহ্নিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে দারিদ্র্যকরণের ঝুঁকি বিশ্লেষণকারী মডেল বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে এই চিহ্নিতকরনের কাজ করে থাকে, যেমন - ঝুঁকি বিশহলেষন, অনুমান, সমাধানসূত্র সন্ধান ও পরিকল্পনা ইত্যাদি (WCD : 297)। Cernea কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্প এলাকার মানুষের দারিদ্র্যকরণের আটটি ঝুঁকি নিম্নে উল্লেখ করা হল : -

**ভূমিহীনতা (Landlessness) : -** যে ভুমির উপর কোন জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ব্যবস্থা, বাণিজ্য তথা জীবিকা নির্ভর করে, বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে তা থেকে সেই জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করা বা বঞ্চিত করা।

**বেকারত্ব সৃষ্টি বা কাজ হারানো (Joblessness) :** সাধারণত শহরাঞ্চলেই এই কর্মহীন ও পারিশ্রমিকহীন হবে বেকারত্ব সৃষ্টির সমস্যা থাকলেও এর বিকৃত নেতীবাচক প্রভাব গ্রামঞ্চলের ভূমিহিন মানুষের উপরও পড়ে। বিশেষ করে দরীদ্র গ্রাম্য মানুষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কর্মচারী ইত্যাদির উপর।

**আশ্রয়হীনতা (Homelessness) :** প্রকল্পপ রূপায়নের ফলস্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে যে ও আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার প্রভাব সর্বাধিক পড়ে দুর্দশাগ্রস্থ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গণগোষ্ঠীর উপর বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় এই আশ্রয়হীনতা শুধু কিছু মানুষকে গৃহহীনই করে না, সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জণগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচিতিও সঙ্কটাপন্ন হয়।

**প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা (Marginalization) :** অর্থনৈতিক দুর্দশা নেমে এলে এই সমস্যা দেখা দেয়। উৎখাত তথা আশ্রয়হীনতার বহু পূর্বেই কোন এলাকায়ক যখন নতুন বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকটে ভোগে তখন এই প্রান্তিকীকরণ (maginalization) এর সমস্যা বেশী দেখা যায়। ফলত, মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় নিম্ন মধ্যবৃত্তে এবং ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী ও কারিগর সম্প্রদায় এর প্রভাবে দারীদ্র সীমার নীচে নেমে যায়। এই অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণের প্রভাবেই সামাজিক ও মনঃস্তাত্ত্বিক প্রান্তিকীকরণ তথা দুর্দশাগ্রস্থ দেখা যায়, যার প্রভাবে প্রান্তিক দরীদ্র জনগোষ্ঠীর কষ্ঠ সর্বাধিক প্রতিভা হয়।

**খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা : (Food Insecurity) :** খাদ্যের নিরাপত্তাহীনতা বলতে বোঝায় সেই পরিস্থিতিকে যখন ব্যাক্তির নূনতম সাধারণ বৃদ্ধি ও কাজের জন্য যে পরিমাণ ক্যালোরী ও প্রোটিন প্রয়োজন হয় তার যথাযথ যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। সাধারণত, যেসব ক্ষেত্রে বলপূর্বক উচ্ছেদসাধন করে আশ্রয়হীনতা লক্ষ্য করা যায় সেই সব ক্ষেত্রে তার ফলস্বরূপ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ্য করা যায়। আবার খাদ্যোৎপাদনের হার অকস্মাৎ নিম্নমূখীন হলেও অনেক সময় এই খাদ্য নিরাপত্তার অভাব ঘটতে পারে।

**রুগ্নতা ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি (Insreased morbidity and mortality) :** মূলত অপুষ্টি, খাদ্যাভাব, শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীন চাপ ইত্যাদি জণিত কারণে রুগ্নতা তথা মরণশীলতার হার বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অনেক সময় অসুরক্ষিত জলের যোগান ও জমে থাকা আবর্জনা, বর্জ্যের দরুণ নানা ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি ও তার ফলস্বরূপ মৃত্যু ঘটে থাকে।

**সাধারণ সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চনা (Loss of Access to Common Property) :** অনেক সময় সম্পত্তিহীন মানুষজন তথা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, যা দারিদ্র্যের অণ্যতম কারণ হিসাবে প্রতিভাত হয়। যেমন অরণ্য ও অরণ্যজাত সম্পদ, জলাধার, চারণভূমি ইত্যাদি ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চনা।

**সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব (Sociall Disarticulating) :** সামজিক সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্নতা হল সামজিক সংহতিহীনতা ও মানসিক গ্রন্থিবদ্ধতার অভাব।

যদিও এই ধরণের সামাজিক সম্পদের পরিসংখ্যান নির্ধারণ করা কঠিন তথাপি দারিদ্র্যকরণে এর ভূমিকা বিশাল।

SIA -র মাধ্যমে উপরিউক্ত এই সকল বিষয়গুলির নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে WCD (2000 : 241) মনে করে যে SIA -র মাধ্যমে এই সকল বিপর্যয়ের কারণগুলিকে নির্ধারণ করার সাথে সাথে অবশ্যই দেখতে হবে কীভাবে প্রকৃতিকে সুরক্ষা করে মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত করা যায়। এর দ্বারা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষেও ইতিবাচক পরিবেশনীতি নেওয়া সম্ভবপর হবে।

টিপ্পনী

## প্রাথমিক সমাজিক প্রভাব মূল্যায়ন কী ? (What is Initial Social Impact Assessment, [ISIA]) :

(১) 'প্রাথমিক সামজিক প্রভাব মূল্যায়ন' (ISIA) হলে সেই ব্যবস্থা যা সাধারণত সেই সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে গৃহীত হয় যেগুলির প্রভাব সামান্য ও সীমিত এবং যেগুলির প্রভাবকে খুব সহজেই চিহ্নিত করে সহজের তার সমাধান সূত্রও নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত প্রকোল্পের প্রস্তাবিত ও নির্ধারিত এলাকার মানুষের সাথে (যাদের উপর সাম্ভাব্য প্রকল্পের ইতিবাচক ও নেতীবাচক প্রভাব পড়তে পারে) আলোচনা করে এই ISIA -র কাজ সম্পাদন করা যায়। ISIA করার অণ্যতম কারণ হল এটা দেখা যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পূর্ণাঙ্গ SIA প্রয়োজন কী না। মূলত বৃহত্তর প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেগুলিতে অনেক সময় ও সম্পদের ব্যবহরের সম্ভাবনা থাকে সেই প্রকল্পপগুলিতেই এই পূর্ণাঙ্গ SIA করা হয়ে থাকে।

## সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন কী ? (What is Social Impact Assessment?) :

SIA -র কোন সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। সাধারণত, SIA হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প যেমন জলাধার, খনি, শিল্পস্থাপন জাতীয় সড়ক, বন্দর, বিমান বন্দর, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, নগরোন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি রূপায়নের পূর্বে তার সাম্ভাব্য প্রভাব বা সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন বা নির্ধারণ করা যায়। অণ্যভাবে বলা যায় এর দ্বারা কোন প্রকল্পের সাম্ভাব্য নেতীবাচক প্রভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সম্যক ধারণালাভ করতে পারে ও প্রয়োজনীয় প্রতিরোধক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(২) Goldman ও Baum (2000 : 7) এর মতে সামাজিক পরিবেশের

টিপ্পনী

উপর কোন প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ করাই হল SIA। এটা পরিবেশের বর্তমান অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে এবং কোন প্রকল্প রূপায়নের ফলে বা কোন বিকল্প ব্যবস্থা সূচীত হলে তার কি প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করাই হল SIA-র মূল উদ্দেশ্য। আবার ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার যথাযথ বিশ্লেষণ করা যায় এর দ্বারা।

(৩) IOCPGIA (2003 : 231) এর প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী কোন প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবকে মূল্যায়ন তথা অনুধাবন করার কার্যপ্রক্রিয়াই হল SIA। যেমন বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী প্রকল্প, বহুতল নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রকল্পো, বৃহৎ পরিবহণ প্রকল্প ইত্যাদি।

(৪) SIA এর বিষয়টিকে Finsterbush ও Freudenburg (2002 : 409) তিনটি দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। যথা - আর্থ সামাজিক (Socio-Economic), প্রভাব (Impact) ও মূল্যায়ন (Assessment) :

**আর্থ-সামাজিক :** আর্থ-সামাজিক শব্দটির মধ্যে সামাজিক বলতে বোঝানো হয়েছে মূলত উন্নয়নের সামাজিক ও সাংস্থৃতিক প্রভাবকে, যা বিভিন্ন সাবেকী শাস্ত্র যেমন সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনোঃস্তত্ত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে চর্চিত হয়ে থাকে। অণ্যদিকে অর্থনৈতিক বিষয়ের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা বিষয়ক পাঠকে।

**প্রভাব :** কোন প্রকল্পের (যেমন জলাধার নির্মাণ, রাস্তা-নির্মাণ, খনি বা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফলকে প্রভাব বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন প্রকল্পের দরুণ যেকোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনই হল প্রভাব।

**মূল্যায়ন (Assessment) :** SIA -র পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন শব্দটি কিঞ্চিত অপ্রচলিত অর্থে ব্যবহিত হয়। কোন প্রভাবের মূল্যায়ন নির্ধারণ করা হয় প্রভাব - কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই। অর্থাৎ SIA যতটা না অভিজ্ঞতাবাদী তার থেকে বেশী পুর্বানুমানভিত্তিক। সাধারণত পুর্বে ঘটে যাওয়া প্রায় সমরূপ প্রকল্পের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেই বর্তমান প্রকল্প সম্পর্কে একটা প্রভাবের পুর্বনুমান করা হয়ে থাকে।

## সমাজিক প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধা (Advantages of SIA) :

### ১. সুনির্দিষ্ট ও নিয়মিত SIA -এর প্রধান সুবিধাগুলি হল :-

ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা : কোন প্রকল্পের দ্বারা যে জনগোষ্ঠী প্রভাবিত হয় বা প্রকল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে চিহ্নিত করা।

ভয় দূরীভূত করে বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি : SIA-র মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকল্প সংক্রান্ত ভীতি দূরীভূত করা যায় ও সাথে সাথে বিশ্বাস ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, যা যেকোন প্রকল্পের সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যকও বটে।

প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব এড়ানো যায় : SIA -র মাধ্যমে যেকোন প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব কমানো যায় তথা এড়ানোও যায়।

প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করা : SIA-র যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কোন প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব বা ফলাফল বৃদ্ধি করা যায়।

ব্যায় সংকোচ করা যায় : যথা সময়ে SIA করা গেলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্প সংক্রান্ত ভূল এড়ানো যায় ও তথ্যসংক্রান্ত অতিরিক্ত ব্যায় সংকোচ করা যায়।

দ্রুত প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া যায় : একটি সুপরিকল্পিত সুষ্ঠ SIA অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া যায়।

২. SIA বাস্তবে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে কোন প্রকল্প সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা প্রকল্পের সাম্ভাব্য প্রভাব যে জনগোষ্ঠীর উপর পড়বে তাদেরও সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে যাতে করে সেই জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করানো যায় তার ব্যবস্থা করা যায়।

## অনুশীলনী :

৬. SIA -র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার কী ?

৭. সামাজিক প্রভাব বলতে কী বোঝ ?

## ৪.৫. সামগ্রিক প্রভাবের মূল্যায়ন (Comulative Effects Assessment) :

পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের উপর ব্যাক্তি-মানুষের অথবা কোন প্রকল্পের ক্রিয়া কলাপের প্রভাব মূল্যায়ন যদি পৃথক ভাবে করা হয় তাহলে তা গুরুত্বহীন হয়ে যায় ; বরং যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল্যায়ন বিষয়টির অতিত, বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের ফলাফল একসাথে মূল্যায়ন বিষয়টির অতীত, বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের ফলাফল একসাথে মূল্যায়ন করা যায় ও তার সংঘবদ্ধ প্রভাব পরিবেশের সম্পদের উপর কীভাবে পড়বে তা দেখা যায় তাহলে তা অণেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। US National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA) অনুযায়ী গঠিত The Council of Environmental Quality মনে করে যে পরিবেশ সংক্রান্ত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সাবেকী প্রকল্পবিন্যাস দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষত, যখন তা কোন প্রকল্পের সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন করতে চায়।

**সর্বিক প্রভাবের সংজ্ঞা (Definition of Comulative Impact) (CIA) :**

US Council of Environmental Quality কর্তৃক প্রদত্ত সার্বিক প্রভাবের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল, "the impacts on the environment that result from the incremental impact of the action when added to other past, present and reasonably foreseeable future action (REFA) regardless of what agency undertakes such other action." এইভাবেই, কোন এলাকার সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন (Comulative effects Assessment [CEA]) শুরু হয়। এর বিভিন্ন দিক গুলি হল -

CIA (Comulative Impact Assessencat) গ্রহণের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমান, - এগুলি হল : -

**(১) ধারনাগত কারণ :** একগুচ্ছ প্রকল্পের সার্বিক প্রভাব পরিবেশে কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা CIA -র মাধ্যমে জানা উচিৎ কারণ পৃথক পৃথক ভাবে তা করলে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে না।

**(২) বাস্তবিক কারণ :** 1990 এর দশকের বিভিন্ন EIA আইন গুলিকে CEA অনুযায়ী মূল্যায়ন করা প্রয়োজন যাতে করে কোন প্রকল্পের সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন ও নির্ধারণ করা যায়।

**(৩) নিয়মানুবর্তিতার কারণ :** এর দ্বারা ভবিষ্যতের উন্নয়নের পথ তৈরি করা যায়।

**(৪) আদর্শবাদী কারণ :** প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার নিশ্চিত করে।

ভারতে এখনো পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়নের পূর্বে কোনো CIA-র ব্যবস্থা নেই।

1980 ও 90 এর দশকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়নের পূর্বে CIA এর বিষয়টি গৃহীত হয়। ফলত CEA প্রক্রিয়া ও কার্যকর হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের রায় ও CEA প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। 2000 সালের পর থেকে এই CEA ব্যবস্থা আরও উন্নতর ও ব্যাপকতর ভাবে প্রযুক্ত

হয়েছে।

## ৪.৫.১. সার্বিক ফলাফল মূল্যায়নের নতুন ধারানা (New Concepts in Comulative Effects Assessment) :

টিপ্পনী

সার্বিক ফলাফল মূল্যায়নের ধারণার যত উন্নতি হয়েছে তত নতুন নতুন ধারণা এতে যুক্ত হয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হল।

**(১) বাস্তুতন্ত্রের মূল্যযুক্ত উপাদান (Valued Ecosystem Component- VEC) :**

কর্তৃপক্ষ, জনগণ, বিজ্ঞাণীগন বা সরকার কর্তৃক যদি পরিবেশ বা তৎসংক্রান্ত কোন উপাদান মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় ও তার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয় তাহলে তাকে 'বাস্তুতন্ত্রের মূল্যযুক্ত উপাদান (VEC) বলে উল্লেখ করা যায়। নিম্নলিখিত নির্ধারক সমূহের দ্বারা কোন বস্তুর VEC মূল্যায়ন করা যায়।

**নির্দেশক (Indicator) :** পরিবেশের গুণমান সম্পন্ন উপাদানকে বিশ্লেষণ, পরিমাপন, পরিচালন, ও তৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদান করার পদ্ধতিকে নির্দেশক বলা হয়ে থাকে।

**গুণমান নির্শেষনায় সূচনা (Thresholds values of Indictor) :** যখন গুনগতমান পরিবেশের উপাদানের অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে যায়।

**সচেতন গুণগত নির্দেশনার সূচনা (Cautionary Threshold Values of Indicators) :** যখন পরিবেশের সম্পদের গুনগত মান বজায় রাখার বিষয়টি সচেতনভাবে গৃহীত হয়।

**লক্ষ্য সন্বিত গুণগতমান সূচনার ইঙ্গিত (Target threshold values of Indicators) :** অর্থাৎ যখন গুণমান সুরক্ষার বিষয়টজিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

**কঠিন গুণমান সূচনার ইঙ্গিত ( Critical Threshold Values of Indicators) :** যখন অতিরিক্ত বা বাড়তি সুরক্ষার প্রশ্নটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, তখন তাকে 'কঠিন গুণমান সূচনার ইঙ্গিত' বলা হয়।

এপ্রসঙ্গে Irwing ও অন্যান্যরা (1986) পরিবেশের উপর উন্নয়নের প্রভাবকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন -

টিপ্পনী

সমগোত্রীয় (Homotypic) - অর্থাৎ যখন একাধিক উন্নয়নের প্রভাব একই ধরনের হয়ে থাকে।

বিচিত্র ধরনের (Heterotypic) - যখন দুই বা ততোধিক উন্নয়ন মূলক কাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পরিবেশের উপর লক্ষ্য করা যায়।

Stakhiv (1988) -র মতে সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়টি মূলত তিনটি দিককে ব্যাখ্যা করে।

(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব।

(২) পরিবেশের উপর সংঘবদ্ধ বা একাধিক প্রভাবের সমষ্টি।

(৩) পারস্পারিক সম্পর্কিত একাধিক ফলাফলের সমষ্টি।

সুস্পষ্টভাবে তিনটি পদ্ধতিতে সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন সম্ভব হয়ে থাকে।

প্রথমটি হল যুক্ত ও ক্রমবর্ধমান (Additive and incremental) প্রভাব যা মূলত একাধিক ব্যাক্তির উপর প্রযুক্ত প্রভাবের সমষ্টি।

দ্বিতীয়টি অতিরিক্ত বা অতিমাত্রায় যুক্ত সংঘবদ্ধ (Supra additive) যা কোন প্রজাতি বা সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয়টি হল নিম্নস্তরীয় (Infra-additive) প্রভাব যা কোন সম্পদ তা প্রজাতির উপর ধারাবাহিকভবে দেখা যেতে পারে, তবে তা ব্যাক্তির উপর প্রযুক্ত প্রভাবের তুলনায় কম হয়।

## পরিবেশের কৌশললগত বিশ্লেষণ (Strategic Environmental Analysis) :

পরিবেশের আলোচনায় কৌশলগত বিশ্লেষনের ক্ষেত্রেও CIA অনেকক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে, বিশেষত : পরিবেশের স্থিতিশীলতা বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশ আইন, পরিবেশ নীতি, পরিকল্পনা-প্রকল্প ইত্যাদির প্রভাব জানতে সাহায্য করে।

বর্তমানে পরিবেশের মূল্যায়ন সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনায় CIA -র বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। পরিবেশের কৌশলগত বিশ্লেষণ পরিবেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় কোন বিকল্প মূল্যায়নের বা বিকল্প উপাদানে বিষয়টিকেও সমালোচনা করে। কারণ Strategic Environmental Analysis মনে করে যে কেবল CIA (সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নে) -এর দ্বারাই উন্নয়নের দরুণ পরিবেশের উপর যে নেতীবাচক প্রভাব পড়ে তা বন্ধ করা বা হ্রাস করা সম্ভব হবে।

## ৪.৫.২. সার্বিক প্রভাব ও পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (Comulative Effect and the Environmental Assessment Process) :

টিপ্পনী

এই অংশে আমরা সর্বিক প্রভাব ও পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব -

(ক) বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিবেশের মূল্যায়নের সময় একটি পূর্ণাঙ্গ CIA (Comulative Impact Assessment) গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যদিও এই বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবেশের-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্ততঃ সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নের (CIA) প্রাথমিক বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়গুলি CIA থেকে নেওয়া হয় সেগুলি হল -

(১) স্থান ও কাল অনুসারে যথাযথ বিশ্লেষণাত্মক সীমারেখাকে (উন্নয়নমূলক প্রকল্পের) চিহ্নিত করণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ করা।

(২) ভবিষ্যতের সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উৎস চিহ্নিত করণ ও তার প্রভাব অনুমান করা।

(৩) প্রস্তাবিত বা অনুমতি প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক ফলাফল এর তাৎপর্য মুল্যায়ন করা।

কোন প্রকল্পের প্রভাবের সীমানা নির্ধারণ করা খুবই দূরহ। তাই সম্ভব্য প্রভাবের সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি স্থিতিস্থাপক হওয়া জরুরী, কারণ এর দ্বারা প্রয়োজন মতো সংশোধনী ও তৎ-অনুসারে মূল্যায়ন সম্ভব হবে। যে সময়কালের জন্য প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে তাও নির্দিষ্ট করা উচিৎ। যদিও এই বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যের যোগান ও পুর্বানুমানের (prediction) দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য মূল্যায়ন ব্যবস্থার মতোই সার্বিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার শর্তাবলী বা প্রক্রিয়া সবই একই ধরণের, যদিও কোন প্রকল্পের সূচনার সময়ের প্রভাব ও অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের বিষয়টিকে এখানে অধিক গুরুত্ব দিতে হয়।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে CEA (Comul;ative Efect Assessment) সম্পাদনের একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র নিম্নে দেওয়া হল -

টিপ্পনী

| Country /Agency | Year | Remarks |
|---|---|---|
| USA | 1997 | The process involves 11 steps |
| Canada | 1999 | The process involves 12 steps |
| Brazil | 2007 | Deals with hydropower |
| USAFHWA | 2005 | |
| USArmy | 2007 | |
| Canada | | - tool kit related to fish habitat and productivity |
| USACorps of Engineers | | - Water Resources Projects |
| SouthAfrica &Australia - | | |

**Source:* L. W. Canter, Professor Emeritus, University of Oklahoma

**(খ) সার্বিক ফলাফল বিশ্লেষণ (Analysing Cumulative Effect) :**

সার্বিক ফলাফল মূল্যায়নের প্রক্রিয়া হল সাবেকী পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ারই বর্ধিত রহপ, যা গঠিত হয় -

(১) সীমানা বা ক্ষেত্র নির্ধারণ (Scoping) ;

(২) ক্ষতিগ্রস্থ পরিবেশকে বর্ণনা করা ; এবং

(৩) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিবেশগত ফলাফল নির্ধারণ করা।

**(গ) উপাদান সমুহকে পর্যায়ে ভাগ করা (Braking Down Components in two Steps) :**

উপরিউক্ত উপাদানকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় -

(১) সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের, বিশেষত পরিবেশের মূল্যযুক্ত উপাদান (VEC) ইত্যাদিকে সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে চিহ্নিতকরণ হল প্রথম পর্যায়। এর দ্বারা পরিবেশের সম্পদ বা উপাদানসমূহ, বাস্তুতন্ত্র এবং মানবসম্প্রদায় ইত্যাদি যেগুলির উপর উন্নয়নমূলক কাজের প্রভাব পড়বে সেগুলিকে নির্ধারণ করা সহজ হবে।

(২) সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নের বিভিন্ন সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা যাবে।

(৩) যেকোন VEC (Valued Environmental Components) -র Resource Study Area (RSA) ; CIA -র সীমানা ও প্রভাবিত স্থান যেগুলির উপর প্রত্যক্ষভাবে ফলাফল লক্ষ্য করা যাবে তা চিহ্নিত করণ। এর দ্বারা প্রতিটি VEC-র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যথাযথ সময় ও ভৌগলিক সীমানা নির্ধারণ করা যাবে।

(৪) কোন প্রকল্পের অতীত, বর্তমান ও আশু-ভবিষ্যৎ এর প্রভাব চিহ্নিত

করা যাবে, যেগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্প্রদায় তথা বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। এই স্তরের মূল উদ্দেশ্য হল চাপ সৃষ্টিকারীকে চিহ্নিত করণ, যার দ্বারা প্রকল্প গ্রহণ ও রূপায়নের পর্যায়ে আশু ক্ষতির প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায়। কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত মূল্যায়নও এই স্তরে হয়ে থাকে।

(৫) কোন সুস্পষ্ট সম্পর্কের উপর কোন প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নির্ধারণ করা।

(৬) কোন প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতামূলক এজেন্সি চিহ্নিতকরণ, যাদের প্রভাব প্রস্তাবিত কার্যাবলী রূপায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

(৭) কোন প্রকল্পের ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে VEC-র বিষয়ে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যকে চিহ্নিতকরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সাথে সাথে সম্পদের স্বাস্থ্য (health of Resource) নির্ধারন করাও প্রয়োজন। সম্পদের স্বাস্থ্য বলতে বোঝানো হয় বৃহত্তর দৃষ্টিকোন থেকে সংশ্লিষ্ট সম্পদের অবস্থা, স্থায়িত্ব, উপযোগিতা ইত্যাদিকে আবার কোন জীবের ক্ষেত্রে তার স্থিতিশীলতাকেই তার সাস্থ্য (Health) বলা হয়।

(৮) VECs গুলির প্রয়োজনীয় সর্বিক ফলাফল মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রকল্পের উৎস - বিকাশ সমন্বিত জীবনধারা বিশ্লেষণের পূর্বে পরিবেশের উপর তার প্রভাবের যথাযথ মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ বেশি প্রয়োজন।

**(ঘ) অন্যান্য যে বিষয়গুলি উল্লেখ্য (Other terms that meed to be addressed) :**

সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণে যেগুলিকে উল্লেখ কর প্রয়োজন :

(১) অন্যান্য স্থানীয় উদ্যোগ যেগুলির উপর ভিত্তি করে CIA করা যায়;

(২) স্থানীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষতি ; তাদের মূল্য ও কার্যাবলীর বিশ্লেষণ।

(৩) সাফল্যের সাথে যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা ;

(৪) ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ;

(৫) বাস্তুতন্ত্র বিনষ্টিকরণের সম্ভাবনা ও সামর্থ বিশ্লেষণ ;

(৬) প্রতিষ্ঠিত বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষাহেতু কোন বিপজ্জনক ধারাকে প্রতিহত করা ;

(৭) কোন জললাভূমি নির্ভর উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদির সুরক্ষার জন্য কোন অঞ্চলের জীববেচিত্র্য সংরক্ষণ ;

(৮) VEC গুলির উৎস, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ ;

টিপ্পনী

(৯) অন্যান্য স্থানীয় উদ্যোগ যেগুলির উপর সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন সম্ভব তার অণুসন্ধান করা।

**(ঙ) পদ্ধতি (Methods) :**

CIA -র মোট এগারো ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। এগুলি নিম্ন উল্লেখ করা হল : -

টিপ্পনী

(১) প্রশ্নাবলী, সাক্ষাতকার ও প্যানেল : সার্বিক প্রভাব নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন তার জন্য প্রয়জনীয় প্রশ্নাবলী, প্রণয়ন, সাক্ষাতকার গ্রহণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্থানে সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও সচেতন ব্যাক্তির সাক্ষাতকার গ্রহণ, সেই সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী প্রণয়ন, প্যানেল তৈরি করে তাদের কাছ থেকে মূল্যবান অর্থাৎ সংগ্রহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

(২) তালিকা প্রণয়ন (Checklist) : সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষনার্থে প্রায় সমরূপ প্রভাবক, বহুকার্যমূখী প্রভাবক, VEC ইত্যাদিকে পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করা।

(৩) ম্যাট্রিক্স (Matrices) : মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও সম্পদের সাথে তার আন্তসম্পর্ক অনুধাবনের একটি কাঠামোকৃত ছক (Tabular) তৈরি করাকে ম্যাট্রিক্স বলে । সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ম্যাট্রিকসের দ্বারা মানুষের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ, বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ, বাস্তুতন্ত্র ও মানবিক সম্প্রদাবের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যায়।

(৪) নেটওয়ার্ক ও ডায়াগ্রাম বা অনুচিত্র : এর দ্বারা সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করা যায় পরিবেশের উপর প্রভাব বিশ্লেষনার্থে । Valued Ecosystem Component -এর তথা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের উপপর যে বহুবিচিত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাও এই Networks গো System Diagram পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

(৫) প্রতিরূপ নির্মাণ (Modelling) : প্রতিরূপ নির্মাণ হল পরিবেশের উপর সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের, তথা বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের কারণ - ফলাফল বিশ্লেষণের একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি। এর দ্বারা গাণিতিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ের কারণ - ফলাফল বিশ্লেষণ করা যায় ; যেমন মৃত্তিকাক্ষয় ইত্যাদি।

(৬) ধারা (Trends) বিশ্লেষণ : অতীত ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে VECs এর অবস্থা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধারাবিশ্লেষণ (Trend Analysis) পদ্ধতি অবলম্বণ করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা কোন প্রচলিত ব্যবস্থায় বা ধারায় পরিবর্তন এলে

অথবা পরিবেশের উপর চাপ সৃষ্টিকারী প্রভাবকের কোন পরিবর্তন হলে (বাড়লে বা কমলে) তার ধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

(৭) ক্ষেত্র পরিমাপণ ও GIS : এই পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বিক প্রভব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অবস্থানগত তথ্য সংগ্রহ করা যায় । কোন প্রভাবকের অবস্থান, প্রভাবের সীমানা, তীব্রতা, সর্বাধিক প্রভাবিত এলাকা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা যায়। কোন সুনির্দিষ্ট স্থানে যাবতীয় চাপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই Overlay Mapping (ক্ষেত্র পরিমাপন) ভীষণ কার্যকরী একটি পদ্ধতি।

(৮) বহনক্ষমতা বশ্লেষণ ( একটি বিশেষ পদ্ধতি) : বহন ক্ষমতা বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে কোন উন্নয়নের কাজে প্রধান বাধা চিহ্নিত করণ সম্ভব হয়। এর দ্বারা অব্যহিত ক্ষমতাকে কিভাবে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যায় তা অনুধাবন করার সম্ভাবনা থাকে। পরিবেশের তথা বাস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বহনক্ষমতা বলতে চাপের প্রবেশপথ (Threshlod of Streess) বিশ্লেষণকে বোঝায়, যার মধ্যে জনগন ওন সমগ্র বাস্তুতন্ত্র অবস্থান করে। অণ্যদিকে সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে 'বহনক্ষমতা' বলতে কোন অঞ্চলের জনগণের চাহিদা মতো পরিষেবা প্রদানের ক্ষমতাকে বোঝায় ।

(৯) বাস্তুতন্ত্র বিশ্লেষণ (একটি বিশেষ পদ্ধতি) : বাস্তুতন্ত্র বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের বিশ্লেষণকে বোঝায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকৃতিক পরিবেশের সীমানা বিশ্লেষণের সাথে সাথে (যেমন জলাভূমি, প্রাকৃতিক অঞ্চল) বিভিন্ন পরিবেশগত নির্ধারক (যেমন ভূমির ধারা, জীব ঐক্য) বিশ্লেষণ করা হয় । সাফল্যের সাথে সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

(১০) আর্থিক প্রভাব বিশ্লেষণ (বিশেষ পদ্ধতি) : সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি বা পদ্ধতি খুব কার্যকরী কারণ কোন অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুবৈচিত্র্য কাজের উপর নির্ভর করে। আর্থিক প্রভাব বিশ্লেষণের তিনটি প্রধান পর্যায় হল : (অ) প্রভাবিত এলাকা নির্ধারণ ; (আ) আর্থিক প্রভাব বিশ্লেষণের প্রতিরূপ নির্মাণ ও (ই) কোন প্রভাবের তাৎপর্য নির্ধারণ করা।

(১১) সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ (একটি বিশেষ পদ্ধতি) : মানবজাতীর তথা স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের অণ্যতম পদ্ধতি হল সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ। মূলত দুটি দিক থেকে এটা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে ; যথা - (অ) বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবর্ত (Variable) বা 'চল' গুলিকে বিশ্লেষণ করে ; যেমন জনসংখ্যার চরিত্র, জনসম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, সামজিক ও রাজনৈতিক

টিপ্পনী

সম্পদসমূহ, ব্যাক্তি ও পরিবার, সম্প্রদায়গত পরিবর্তন ইত্যাদি এবং (আ) সামাজিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি ব্যবআর করা যেমন - Linear-trend proiections (LTP), Population multiplier Methods (PMM) বিশেষ বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

**(চ) একটি পদ্ধতি বা বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Choosing a method or Analytical Tool) :**

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। কোন প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধরন বা আকার, প্রাপ্ত পর্যাপ্ত তথ্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনমতো একটি পদ্ধতি নির্বাচন করা যায়।

Lary W. Canter ও Kamath বেশ কিছু প্রকল্পের উপর আলোচনা ও গবেষণা করে দেখেছেন যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় 'Chek list' পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের মতে যথাযথ পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নজর রাখা কাম্য :

(১) বহুধাভিক্ত উন্নয়নমূলক কাজ ও ভূমির ব্যবহার ইত্যাদি যেন সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়।

(২) সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটা যেন উপযুক্ত হয়।

(৩) সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর এলাকায় সম্পদের প্রভাব বিশ্লেষণক্ষম হওয়া প্রয়োজন।

(৪) স্থায়ী ও অস্থায়ী সীমানার স্থিতিস্থাপকতা বিশ্লেষণে যেন এই পদ্ধতি সক্ষম হয় ;

(৫) সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিটি যেন অবশ্যই ক্রমবর্ধমান ও পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত প্রভাবগুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করে বিশ্লেষণে সক্ষম হয়।

(৬) সকল প্রাসঙ্গিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের সকল তথ্যকে বিশ্লেষণে যেন উপযুক্ত হয়।

(৭) এ প্রসঙ্গে Lary Canter ও Kamath মনে করেন সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হল সেটাই যা একদিকে সরল ও অণ্যদিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণক্ষম, যার মাধ্যমে সার্বিক প্রভাব মূল্যায়ন যথাযথ সম্পন্ন করা যাবে। তাদের মতে CIA চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা (Questionnaire) পদ্ধতি সর্বাধিক কার্যকরী। EIAম পাঠের ক্ষেত্রে দুই দশকের বেশী সময় থেকে এটা জনপ্রিয় পদ্ধতি।

(ছ) সাধারণ অপ্রাচুর্যতা মোকাবিলা করার জন্য সাবধনতা অবলম্বন (Taking Precaution to Avoid Common Deficiencies) :

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন :

(১) পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওবা প্রয়োজন হলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলিকে আরও অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিৎ।

(২) প্রয়োজন অণুসারে যথাযথ সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

(৩) VEC - বিশ্লেষণের পূর্বে পর্যাপ্ত শলা-পরামর্শ প্রয়োজন ;

(৪) রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব সহকারে নজর দিতে হবে।

(৫) পরিচালন ব্যবস্থার তুলনায় সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নের (CIA) উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

(৬) উদ্যোপতি ও সরকারের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার সুস্পষ্ট ভাগ থাকা প্রযোজ্য ।

(৭) যেসব প্রকল্পে একাধিক অংশীদারিত্ব রয়েছে তাদের সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের ভূমিকা, স্বার্থ, দায়িত্ব ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে পৃথকীকরণ করা দরকার ও তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বনদ্ব থাকলে সেগুলিকেও বোঝাপড়া করা দরকার।

(৮) সংশ্লিষ্ট এলাকায় অন্যান্য যেসকল প্রকল্প রয়েছে সেগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ ও স্থান-কালকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

(৯) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে CEA পাঠের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে তালিকাবদ্ধ করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নতুবা CEA নিরন্তর চলতেই থাকতে। The USEPA -র রিপোর্ট অণুযায়ী সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের উচিৎ বাস্তবতা অনুযায়ী 'যা ঘটেছে বা ঘটেছে' (Count What Counts নীতি) তার ব্যাখ্যা করা। কখনোই যেন অতিবাস্তব বা কাল্পনিক বিষয় অথবা অতি অল্প প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করে CIA -র মূল উদ্দেশ্য নষ্ট না হয়ে যায় তা দেখা উচিৎ।

### (জ) CEA বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া :

পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিতে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়ে পেশাদারী নৈব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় । এর সাথে

টিপ্পনী

প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ ও তৎসক্রান্ত সমন্বয় করা হয়।

সর্বাগ্রে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন যে " সার্বিক ফলাফল বলে কি কিছু হয় ?" যদি এমন দেখা যায় যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অন্যান্য নানাধরনের ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ে পরিবেশের সম্পর্কের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক অথবা নেতীবাচক প্রভাব বিস্তার করছে তাহলে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির সার্বিক প্রভাব রয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই এটা বোঝা যায় যে সার্বিক প্রভাবের তীব্রতা বা বিচ্ছিন্নতার চরিত্র কীরূপ । এর উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রকল্পটির চরিত্র কেমন। প্রতিটি সম্পদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়।

(১) অতীত, বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সম্পদের চরিত্র, অবস্থা ও স্বাস্থ্য কেমন।

(২) সম্পদের উপর সার্বিক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবদান কী তা নির্ধারণ করা।

(৩) সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব অতিক্রম করা বা কমিয়ে দেওয়া।

(৪) প্রস্তাবিত প্রকল্পের কোন উপযুক্ত বিকল্প নির্ধারণ । সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের পর একটা বাস্তবতা অণুসন্ধান (Reality Check) প্রয়োজন। অর্থাৎ CIA -এর বিশ্লেষণের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের তুলনা করা বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এর দ্বারা প্রতিটি সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বোঝা যায়।

**(ঝ) পরিবর্তনকারী পরিচালণ (Adaptive Management) :**

নিম্নোক্ত বিষয়টি Lary canter ও Sam Atkinson এর প্রবন্ধ "Adaptive Management and Integrated Decision Making - An Emerging Tool for Cumulative Effects Management' থেকে উদ্ধৃত।

Adaptive Management (AM) হল EIA (Environmental Impact Assessment ও CEA (Cumulative Effects Assessment) এরই একটা কার্যকরী পদ্ধতি।

AM প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল : -

(১) পরিচালনের উদ্দেশ্য,

(২) ধারণগত ও পরিমাণগত প্রতিরূপ,

(৩) পরিচালনের পচ্ছন্দ ও নিয়ন্ত্রণমূলক তত্ত্বাবধান,

(৪) নিয়মানুবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ , এবং

(৫) বিভিন্ন অংশীদারদের সমন্বয়সাধন।

এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সার্বিক ফলাফলের অনিশ্চয়তা দূর করা যায়। আবার কোন প্রস্তাবিত কাজে ক্ষেত্রে যে ক্রমবর্ধমান প্রভাব থাকে তাকেও হ্রাস করে সিদ্ধান্তগ্রহণ কাঠামোকে সহায়তা করা যায়। এক্ষেত্রে কোনো বিশ্লেষণের মৌল ধারণা, প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্র সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলি চিহ্নিত করা যায় ; (অ) C E A পদ্ধতির অসংখ্য সীমাবদ্ধতা ও অনিশ্চয়তার দরূন A d a p t i v e Management (AM) অত্যন্ত উপযোগী প্রক্রিয়া স্বরূপ ভূমিকা পালন করার সাথে সাথে স্থানীয় পরিচালন সংক্রান্ত অণু সমস্যা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। (আ) AM প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধ Decision Flowchart ও Matrices কে অবশ্যই দর্শকদের পক্ষে সহজেই বোধগম্য হতে হবে এবং যাতে করে পরিবেশ সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে উন্নয়নকে নিশ্চিত করা যায় তাও দেখতে হবে।

যাইহোক, তবে AM প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'ব্যায়বরাদ্দ' ও 'সমবায়বরাদ্দ' এই দুটি বিষয় সমস্যার কারণ হতে পারে। কারণ এর জন্য সরকার কর্তৃক বাজেটে অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দ ও সময়প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হয়। আবার এই জন্যই একগুচ্ছ ধারাবাহিক ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে অত্যন্ত সচেতনভাবে এটা দেখা হয় যে AM রক্রিয়ার প্রকৃত লাভ বা সুফল গুলি কী কী ?

## অনুশীলনী :

৮. সার্বিক প্রভাব (Comulative Impact)এর সংজ্ঞা দাও।

৯. Adaptive Management বলতে কী বোঝ ?

## ৪.৬. জনসংখ্যাগত কাঠামো ( Demographics Structure) :

যেকোন রাষ্ট্রের প্রধানতম সম্পদ হল জনসংখ্যা। যেকোন রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়াদি সেই রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা ভীষনভাবে প্রভাবিত হয়। জনসংখ্যয় বা জনঘণত্বের বিষয়টি প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০ সাল আগে থেকেই উৎপত্তি হয়েছে, যার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যা খুবই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিল। বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটা দেখা গেছে যে প্রায়

টিপ্পনী

খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ বছর থেকে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ০.০৬ হারে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন হয়েছে এবং ১৩০০ সাল থেকে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বের জনগন মাত্র ১ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। যদিও পরবর্তী ৫০ বছরে বিশ্ব জনসংখ্যা আরও ১ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। আর ১৭০০ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে আরও ১মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তবে পরের পঞ্চাশ বছরে বিশ্বে জনসংখ্যা প্রায় ২ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছর অন্তরে এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩ মিলিয়ন ও ৪ মিলিয়ন বৃদ্ধিতে দাঁড়ায়। তাই বলা যায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অতি নগণ্য হলেও পরবর্তীকালে তা দ্রুত হারে বেড়েছে।

বিংশ শতকে ১৯৪০ ও ১৯৫০ এর দশক ছাড়া বাকি সময়ে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত গড়ে প্রায় বার্ষিক ০.৮% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২০ সালে সম্মিলিত আতিপুঞ্জ (UNO) বিশ্বের প্রধান স্থানগুলির জনসংখ্যা পরিমাপনের জন্য একটি জনসংখ্যা রিপোর্ট (Estimated Population Report) প্রণয়ন করে। Water F. Wilcox এবং A.M. Carr Saunders কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যান হল ১৬৫০ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়কালের জনসংখ্যা পরিসংখ্যানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিশ্বজনসংখ্যার বৃদ্ধি বার্ষিক প্রায় ১.৯ শতাংশে পরিণত হয় (যা পূর্বে ০.৮% ছিল)। পরবর্তি কুড়ি বছরে এই বৃদ্ধির হার প্রায় ২.২২% হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Census Bureau' অনুযায়ী সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামান্য কমেছে (Downturn in population Growth)। International Development Agency কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তায় এই US Census Bureau যে রিপোর্ট পেশ করেছে তা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের পর থেকে বার্ষিক প্রায় ১.৯ শতাংশ হারে বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Internation all Demographics Statistics এর মূখ্য আধিকারিক Samuel Baum এর মতে, "১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমরা এটা কল্পনাও করতে পারিনি যে ১৯৮০ -র দশকের শুরু পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার একটুও হ্রাস হতে পারে। কিন্তু প্রায় ১ দশক পুর্বেই এটা ঘটে যাওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও এ-দশমাংশ (১/১০) পার্থক্য খুব একটা বেশী নয়। কিন্তু সংখ্যাটা এতোই বেশী যে এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও বলেন, "এই বিষয়টি খুব ভালো আফ্রিকায় বেশ কিছু

দেশ বাদে প্রায় সর্বত্রই সমহারে এই বৃদ্ধি হয়েছে। আবার আফ্রিকার কিছু দেশ যেমন তিউনেশিয়া, সাউথ আফ্রিকা, মরিসাশ, রিউনিয়ন ইত্যাদিকে এই হার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে হ্রাস পেয়েছে।" তিনি (Baum) আরও বলেছেন যে এই বৃদ্ধি উত্তোরোতর বৃদ্ধি পাবে এবং ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের পূর্বে তা কখনোই শূণ্য শতাংশে পৌছাতে পারবে না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় ক্ষেত্রে দুটি কারণের কথা বলেছেন; যথা - (অ) জন্মানোর হারে দ্রুত পতন ও (আ) মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়া। তাঁর মতে জন্মানোর হার যদি কমে যায় ও জীবনদায়ী ঔষধ ও উন্নত প্রযুক্তির সুবাদে মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় এটা হতে পারে। ১৯৬৬ সালের বিশ্ব জনগণনা সুমারী অণুযায়ী উন্নত ও স্বল্পোন্নত উভয় ধরণের দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যায়। যেমন শ্রীলঙ্কায় ১৯৬৬ সালে বৃদ্ধির হার ২.৩ শতাংশ হলেও ১৯৭৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আবার এই সময় কালে থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে হ্রাসের হার ছিল ০.৭ শতাংশ করে ; আবার কম্বোডিয়ায় ০.৬ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ০.৪ শতাশ এবং তুর্কি ও চীনে ছিল ০.৩ শতংশ হারে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছিল।

১৯৭৬ - ৭৭ সালে চীনের জনসংখ্যা ছিল ৯৮২.৫ মিলিয়ন, যা বিশ্ব-জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ। আবার এই সময়কালে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.২ শতাংশ।

১৯৭৭ সালে কেবল এশিয়াতেই বিশ্বজনসংখ্যার প্রায় ৫৮ শতাংশ (অর্থাৎ ২.৫ বিলিয়ন) ছিল। জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এই মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বিশ্বের বৃদ্ধির হারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। আবার ১৯৬৬ -৬৭ সালের ১.১ শতাংশের তুলনায় ১৯৭৬ - ৭৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জনবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ০.৮ শতাংশ। আবার স১৯৭৫ - ৭৭ সালে আফ্রিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৮ শতাংশ।

US Census Bureau -র রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের জনসংখ্যা ৮৮ মিলিয়ন থেকে ২০০৩ সালে কমে ৭৩.৯ মিলিয়ন হয়। তারপর ২০০৬ সালে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫.২ মিলিয়ন হয়। তারপর থেকে বার্ষিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। ২০০৯ সালের জনসংখ্যা হল ৭৪.৬ মিলিয়ন যা ২০৫০ সালের মধ্যে হ্রাস পেয়ে ৪১ মিলিয়নে পরিণত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলেই সাম্প্রতিক বিগত দশকগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে ; যদিও মধ্য-প্রাচ্য, আফ্রিকা,

টিপ্পনী

দক্ষিণ-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হ্রাস সর্বদায় ২ শতাংশের উর্দ্ধেই লক্ষ্য করা গেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের কিছু কিছু দেশে, বিশেষত পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে অভিবাসনে চলে যাওয়া ও স্বল্প জন্মহারের দরুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় HIV-AIDS এর প্রকোপের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। জাপানের জনসংখ্যা ২০০৫ সালের পর থেকে হ্রাস পাচ্ছে।

বিশ্বজনসংখ্যা বৃদ্ধির দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, ক্রমাগত ইতিবাচক বৃদ্ধির হার, যা জনসংখ্যাকে বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর হার কমে যাওয়া। ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে, অর্থাৎ বিগত তিন শতকে প্রতিবছরই বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হয়েছে। যদিও ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে এই আর হ্রাস পেতে শুরু করে।

তাই বলা যায়, বিশ্ব জনগণ সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যার হারে কিছু অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা হল ৬.৭ বিলিয়ন যা ১৯৬০ সালের তুলনায় ৩ বিলিয়ন বেশী। ২০৫০ সালের মধ্যে আরও ৩ বিলিয়ন জনসংখ্যা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যাখ্যানুযায়ী, যদিও গর্ভধারণের হার হ্রাস পেয়েছে তবুও এটা মনে করা যায় যে ২০২৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৭.৯ বিলিয়ন ও ২০৫০ সালের মধ্যে তা হবে ৯.৩ বিলিয়ন, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি মূলত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতেই হবে যেখানে মোট বিশ্বজনগণের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ (৪/৫) জনগণ বসবাস করে।

## ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth in India):

চীনের ভারতই হল বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক জনসংখ্যাপূর্ণ রাষ্ট্র। বিশ্বের মোট ভূখন্ডে বিশ্বের মোট জনগণের প্রায় ১৭ শতাংশ অবস্থান করে। এই বৃদ্ধির হার দ্রুত গতিতে চলছে এবং এটা মনে করা হচ্ছে যে ২০৪০ সালের মধ্যে ভারতই জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান বা সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করবে।

জনসংখ্যা বিবর্তনের তত্ত্ব অণুযায়ী পৃথিবীর সব দেশেই জনসংখ্যা বিবর্তনের তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে জন্ম ও মৃত্যু দুটির হারই থাকে উচ্চমাত্রায়। ফলে এই স্তরে জনসংখ্যার ভারসাম্য থাকে স্থিতিশীল। এমনকি এই পর্যায়হার সামান্য বাড়তে পারে কারণ মৃত্যুর হারের তুলনায় জন্মের হার বেশী হয়। এটা মূলত

কৃষিভিত্তিক দুর্বল অর্থনীতি সম্পন্ন দেশে বেশী দেখা যায় যেখানে শিল্পের বিকাশ সেভাবে হয়নি ও মাথাপিছু আয়ও অল্প। এখানে জীবনযাত্রার মান নিম্নমানের হয় এবং জনগণ স্বাভাবিক ভাবেই মৌল প্রয়োজনীয়তা থেকে বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয় দ্রুততর। এই স্তরে জন্মের হারের তুলনায় ব্যাপক ভাবে কমে যাওয়ায় জনবিস্ফোরন ঘটতে থাকে। এটা মূলত সেইসব দেশে দেখা যায় যেখানে জনচাহিদার তুলনায় অর্থনীতির ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং ফলস্বরূপ জনগণের একটা বৃহত্তর অংশ সর্বদাই দারীদ্র সীমার নীচে অবস্থান করে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই সমস্যা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিগত ছয় দশকব্যাপি ভারত একটা দ্রুততর জনসংখ্যার বিস্ফোরন দেখা যাচ্ছে। এটা দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক।

| population | year | population | year | population | year | population | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 271306,0 | 1900 | 277175,0 | 1930 | 431463,0 | 1960 | 833929,0 | 1990 |
| 270183,0 | 1901 | 279115,0 | 1931 | 438800,0 | c1961 | 843931,0 | 1991c |
| 269064,0 | 1902 | 284102,0 | 1932 | 452378,0 | 1962 | 883473,0 | 1992 |
| 267950,0 | 1903 | 287902,0 | 1933 | 462196,0 | 1963 | 900453,0 | 1993 |
| 266840,0 | 1904 | 291753,0 | 1934 | 472305,0 | 1964 | 918570,0 | 1994 |
| 265735,0 | 1905 | 295666,0 | 1935 | 482706,0 | 1965 | 934228,0 | e1995 |
| 264635,0 | 1906 | 299614,0 | 1936 | 493389,0 | 1966 | 945121,0 | 1996 |
| 263539,0 | 1907 | 303626,0 | 1937 | 504345,0 | 1967 | 962378,0 | 1997 |
| 262447,0 | 1908 | 307694,0 | 1938 | 515601,0 | 1968 | 979673,0 | 1998 |
| 261361,0 | 1909 | 311820,0 | 1939 | 527177,0 | 1969 | 997515,0 | 1999 |
| 260278,0 | 1910 | 316004,0 | 1940 | 539075,0 | 1970 | 1014003,8 | e2000m |
| 259201,0 | 1911 | 318826,0 | 1941 | 547900,0 | c1971 | 1027015,2 | c2001 |
| 258127,0 | 1912 | 324180,0 | 1942 | 563530,0 | 1972 | | *2002* |
| 257058,0 | 1913 | 328255,0 | 1943 | 575887,0 | 1973 | | *2003* |
| 255994,0 | 1914 | 332332,0 | 1944 | 588299,0 | 1974 | | *2004* |
| 254934,0 | 1915 | 336562,0 | 1945 | 600763,0 | 1975 | *1094985,0* | *2005e* |
| 253878,0 | 1916 | 340796,0 | 1946 | 613273,0 | 1976 | | *2006* |
| 252827,0 | 1917 | 345085,0 | 1947 | 630200,0 | 1977m | | *2007* |
| 251780,0 | 1918 | 349430,0 | 1948 | 644330,0 | 1978m | | *2008* |
| 250737,0 | 1919 | 353832,0 | 1949 | 658730,0 | 1979m | | *2009* |
| 249699,0 | 1920 | 350445,0 | 1950 | 688956,0 | 1980 | *1170014,0* | *2010e* |
| 251441,0 | 1921 | 363211,0 | 1951 | 685200,0 | c1981 | | *2011* |
| 254963,0 | 1922 | 369231,0 | 1952 | 703570,0 | 1982m | | *2012* |
| 257637,0 | 1923 | 375633,0 | 1953 | 719090,0 | 1983m | | *2013* |
| 260339,0 | 1924 | 382438,0 | 1954 | 734870,0 | 1984m | | *2014* |
| 263071,0 | 1925 | 395096,0 | 1955 | 749184,0 | 1985 | *1237985,0* | *2015e* |
| 265831,0 | 1926 | 397334,0 | 1956 | 767200,0 | 1986m | *1304263,0* | *2020ep* |
| 268621,0 | 1927 | 405450,0 | 1957 | 783730,0 | 1987m | *1370028,0* | *2025ep* |
| 271442,0 | 1928 | 414021,0 | 1958 | 797526,0 | 1988 | *1432181,0* | *2030ep* |
| 274293,0 | 1929 | 423053,0 | 1959 | 817490,0 | 1989m | *1706951,0* | *2050ep* |

***Table :*** *Growth Rate of India's Population*

টিপ্পনী

এই সারণী থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে ভরতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কীরূপ। ১৯০১ থেকেই এই পরিসংখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবছর এই জনসংখ্যা কী হারে বেড়েছে তা দেখা যাচ্ছে । বিংশ শতকের প্রথমের দিকের বছর গুলিতে এই জনসংখ্যা অল্প হ্রাস পেলেও পরবর্তী কালে মূলত ১৯২৮ সাল থেকে প্রতিবছর জনসংখ্যার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৫১ সালের পর থেকে এই বৃদ্ধির হার হয়েছে সর্বাধিক।

১৯০১ সালের প্রতি বর্গকিমিতে জনঘনত্ব ৭৭ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে তা হয়েছে ২২১ জন। আবার লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যার অনুপাতে দেখা যাচ্ছে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা প্রতিবছরই হ্রাস পাচ্ছে, আবার শহরের জনসংখ্যাও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০১ সালে এটা ১১ শতাংশ হলেও ১৯৮১ সালে এটা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

জন্ম-মৃত্যু হারের পরিপ্রেক্ষিতে একথা দেখা যাচ্ছে যে বিগত পাঁচ দশকে মৃত্যুহার ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫১ সালে মৃত্যুহার যেখানে ২৫.১% ছিল সেখানে ১৯৯১ সালে তা কমে ৯.৮% এ পরিণত হয়েছে। তবে জন্মহারেও এই পতনের হার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১স৯৫১ সালের এই হার ৪০.৮% থেকে ১৯৯১ সালে তা ২৯.৫% এ পর্যবশিত হয়েছে । ১৯৯০ এর দশকে বার্ষিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২% হারে কমেছে। বয়স ও লিঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশই হল যুব জনসমাজ যার মধ্যে সিংহভাগই হল পুরুষ।

আঞ্চলিক ভূখন্ডগত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বতন্ত্র ধরনের। আবার ভারতের অভ্যন্তরে কেরালার জন্ম-মৃত্যুর হার উন্নত বিশ্বের দেশগুলির মতোই অণ্যদিকে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে সদ্যজাতের মৃত্যুর হার যেমন অত্যাধিক, তেমনি আবার জন্মহারও ব্যাপক । ফলে এইসব অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অনেক।

বর্তমান ভারতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক - ষষ্ঠাংশ (১/৬ অংশ ) বাস করে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেড়ে চীনকেও অতিক্রম করে থাকে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।

## ৪.৬.১. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ (Factors Influencing Population Growth in India) :

১৯৪৭ সালের পর থেকে বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ হয়েছে। ১৮৭১ সালের প্রথম আদমসুমারী অনুযায়ি ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২১১ মিলিয়ন, যা ১৯২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫১ মিলিয়ন। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ছিল খুব অল্প। এরপর থেকে প্রতি দশকে তা ব্যপক হারে বেড়েছে। ১৯২১ - ৩১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২৮ মিলিয়ন থেকে ১৯৯১ - ২০০১ সালে বৃদ্ধি ১৮০ মিলিয়নে পৌঁছয়। জনসংখ্যার এই দ্রুতগামী বিকাশ বা জন বিস্ফোরণের ফলে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা, যেমন - দারিদ্র, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক দুর্দশা, নিম্নস্তরীয় মাথা পিছু আয় ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

### ১. মৃত্যুর হার কমে যাওয়া (Decreased Mortality rate) :

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ হল মৃত্যুহার কমে যাওয়া। ১৯৯৫ সালের প্রতিবেদন অণুযায়ী ভারতে পুরুষদের গড় মৃত্যুর বয়স হল ৫৮.৫ বছর এবং মহিলাদের ৫৯.৫ বছর, যা পুরুষদের তুলনায় সামন্য বেশী। বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মহিলাদের তুলনায় পুরুষেরা সামন্য বেশীদিন বাঁচতো। কিন্তু ১৯৯০ এর দশকের পর থেকে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক দিন বেঁচে থাকছে।

আবার ১৯১০ - ২০ সালের পরিসংখ্যান অণুযায়ী প্রতি ১০০০ জন পিছু মৃত্যুর হার ৪৮.৬% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৭০ - এর দশকে মাত্র ১৫% -এ পৌঁচেছে। আবার ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রতি ১০০০ জন শিশুর মধ্যে ৭৬ জন সদ্যজাত শিশুর মৃত্যুর হারে পৌঁছাবে বলে মনে করা হয়। আবার ৩০% শিশু অতি অল্প ওজনের হয়ে থাকে এবং ১ থেকে ৪ বছর বয়সের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ১০ জন করে।

১৯৮৯ সালের Nationall Nutrition Monitoring Bureau-র রিপোর্ট অণুযায়ী, ভারতে ১৫ শতাংশেরও কম মানুষ পর্যাপ্ত হারে লালিত-পালিত হয়। যদিও ৯৬ শতাংশ মানুষ প্রত্যহ পর্যাপ্ত ক্যালোরী পেয়ে থাকে। ১৯৮৬ সালের প্রতিবেদন অণুযায়ী চীন যেখানে প্রত্যহ গড়ে ২৬৩০ ক্যালোরী মানুষ গ্রহণ করে যেখানে ভারতে তার পরিমাণ ২২৩৮ ক্যলোরী।

সম্মীলিত জাতিপুঞ্জের রিপোর্ট অণুযায়ী ভারতে ১৯৮৯ সালে প্রতিদিন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ক্যালোরী গ্রহণের মাত্রা কমে ২২২৯ ক্যালোরী হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে বার্ষিক পুষ্টির মাত্রা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় না, যে কারণে দারিদ্র আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে।

**২. মারণব্যাধির চিকিৎসায় সাফল্য ও জয়লাভ (Conquest on Disease) :**

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অণ্যতম প্রধান কারণ হল চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাপক অগ্রগতি ও মারণরোগের উপর জয়লাভ। এটাই বিগত একশো বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। এক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে সর্বাধিক প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ভূমিকা পালণ করেছে টীকাকরণ, পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদিকে উন্নততর প্রযুক্তি, জ্ঞান ও উন্নততর চিকিৎসা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যেখানে চিকিৎসা, পুষ্টি, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদির বিষয়ে উন্নততর জ্ঞান ব্যবহার করছে, তমেনি আবার কোন কোন প্রান্তে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে শিশুমৃত্যু, তথা সার্বিক মৃত্যুর হার অনেক বেশী।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অণ্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল টীকাকরনের যথাযথ ব্যবহার, যা পোলিও, Small pox, জরাব্যাধি, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং রুবেল্লার (Rubella) মতো মারণব্যাধিকে পরাস্ত করেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল উন্নততর 'জনস্বাস্থ্য প্রক্রিয়া লুই পাস্তুর জীবানুতত্ত্ব' অনুযায়ী একজন ব্যাক্তির স্বাস্থ্য সমগ্র জনসম্প্রদায়ের জন্যও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর জনস্বাস্থ্যের সার্বিক বিকাশের জন্য এই ধারনাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

বর্তমান ভারতে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প, যেমন আবর্জনা নিষ্কাশন, জল পরিশোধ পুষ্টি শিক্ষা ও সঠিক টীকাকরণ ইত্যাদি গৃহীত হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে।

**৩. ছোঁয়াছে ও দূরারোগ্য ব্যাধি দূরীকরণ (Treating Communicable and Non-Communicable Discase) :**

ভারতের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে বহুসংখ্যক ও মারণব্যাধি খুবই দূরারোগ্য স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে মূলত সকল বয়সের মানুষের কাছেই। এর থেকে মুক্তির জন্য ভারতসরকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এগুলি মূলত বিভিন্ন দূরারোগ্য ও ছোঁয়াছে মারণ ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত করার চেষ্টা করেছে, যেমন কলেরা, ট্রাকোম, ডাইরিয়া, শ্বাসকষ্ট, যৌনরোগ ইত্যাদি।

যদিও সামান্য হ্রাস পেয়েছে তথাপি এখানোও পর্যন্ত ভারতে ম্যালেরিয়া

একটি দূরহ সমস্যা। তবে ১৯৭৫ সালে ভারতকে বসন্তরোগ মুক্ত দেশ বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৯৫ সালে ভারতে ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আবার ১৯৫৫ সালে 'National Leprosy Cocntrol Programme' গঠিত হয় কুষ্ঠ প্রতিহিত করার উদ্দেশ্য। প্রথমে ধীরে গতিতে এগোলেও ১৯৮০ -র দশক থেকে এই পরিকল্পনা ব্যাপক গুরুত্ব ও গতি পায়। ১৯৮২ সালে এটাকে পুনর্নির্মাণ করে National Leprosy Eradication Programme" নামকরণ করা হয়।

এছাড়া ও ভারত সরকার টিউরারফিউলোসিস, Goiter, ডাইরিয়া ইত্যাদি প্রতিহত করার জন্য বহু পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলত জন্মহার পাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যুর হার কমে গেছে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে।

**৪. অভিবাসন বা শরনার্থীর সমস্যা (Migration) :**

যেকোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অণ্যতম কারণ হল শরনার্থী সমস্যা। অর্থাৎ দেশের ভৌগলিক এলাকার মধ্যে প্রবেশ করা ও স্থায়ীভাবে বসবাস করা। ২০০০ সালের প্রতিবেদন অণুযায়ী ভারতে প্রায় ৬,২,৭১,০০০ জন শরণার্থী বাস করে, যার মধ্যে প্রায় ১,৭০,৯০০ জন হল রিফুইজি (Rufugee)। প্রায় প্রত্যহ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের বেশীর ভাগই শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ থেকে আসে।

**৫.দারিদ্র্য (Poverty) :**

দারিদ্র্য হল আরেকটি অণ্যতম কারণ, যা ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক (Workld Bank) প্রদত্ত পরিসংখ্যান অণুযায়ী ভারতে প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার (১.২৫ U.S প্রতিদিন) নীচে অবস্থান করে।

**ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ও গৃহীত ব্যবস্থা (Need and Measure of Population Control in India) :**

২০০১ সালের আদমসুমারী অণুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা হল ১,০২৭,০১৫, ২৪৭ জন, যা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে এটা মনে করা হচ্ছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত চীনের জনসংখ্যাকেও অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে জনসংখ্যায় প্রথম স্থান দখল করবে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব দেখা

টিপ্পনী

যাবে। ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে শক্তিশালী হলেও যে হারে জনবিস্ফোরন ও দারিদ্র্য এখানে দেখা যাচ্ছে তাতে সার্বিকভাবে দেশের ও দশের জনগণের উন্নয়ন শুধু বাধাই পাচ্ছে না সাথে সাথে তা তীব্র সঙ্কটের মুখে পড়তে চলেছে। ফলে বর্তমান ভারতে যে বিষয়টা সর্বাধিক প্রয়োজন তা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ। অণ্যথায় ণূন্যতম অর্থনৈতিক বিকাশ ও মানুষের জীবন ধারণের মান রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

ভারত সরকার ধারাবাহিকভাবে একগুচ্ছ পরিকল্পনার দ্বারা জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন দুটি দৃষ্টিকোন থেকে দুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে -

(১) স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে পরিবার কল্যাণ বিভাগ গঠন করা হয়েছে, যা কেন্দ্রে তথা রাজ্যগুলিতে ও পরিবার কল্যান পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভরতীয়দের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্পর্কে জ্ঞান বা শিক্ষা দেবে। জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র গুলিকেও আর্থিক প্রদান করা হয় পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে যথাযথ গবেষনা কেন্দ্রগুলিকেও আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে যথাযথ গবেষণার উদ্দেশ্যে।

(২) পরিকল্পনা কমিশনের "Working Group on vital and Jheal th Stbatics" তার ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম বৈঠক ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাধারণ প্রাকৃতিক হার পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সুপারিশ করে যে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা করবে "National sample survey of India"।

১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ভরতের জনগণকে পরিবার পরিকল্পনার যে পাঠ দেয় তাতে তারা বৃহত্তর গ্রামীণ জনসমাজে পৌঁছাতে পারেনি, বিশেষত যারা অশিক্ষিত ও বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসামূলক প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারে নি। এই সমস্যা অতিক্রম করার জন্য ভারত সরকার 'London School of Economic and Political Science' এর D.V. Glass এর পরামর্শ নিলে তিনি গৃহস্থ সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের সুপারিশ করেন, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করেন।

আবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেও ভারতসরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ কলরে। এর অঙ্গ হিসাবে ভারতসরকার বহু এজেন্সিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন - Family Planning Association of India এবং New Population plan ইত্যাদি।

**পরিবার পরিকল্পনামূলক সংঘ (Family Planning Association) :**

পরিবার পরিকল্পনা সভার প্রধান লক্ষ্য হল পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহ দান। এই সভা মূলত দুইজন সন্তান নীতিতে বিশ্বাস করে। কারণ এটা মনে করা হয় যে দুই সন্তাননীতি জনসংখ্যা ও সম্পদের যোগান - এই দুই এর মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে।

Family planning Association এর প্রধান ভূমিকা হল মানুষকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান দেওয়া ও সাথে সাথে যুব সম্প্রদায়কে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব সচেতন করা। এই Association পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যে সকল পদ্ধতি নিয়ে থাকে সেগুলো মূলত সাবেকী যেমন - Condom, Diaphragmes, Jelly/Cream Tubes, Foam Tablets, IUD, Oral Pills ইত্যাদি বিতরন। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে 'গর্ভপাত হল অণ্যতম পদ্ধতি, যা এই Association গ্রহণ করে থাকে। সরকার মূলত বিনা পয়সায় এই পদ্ধতি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নিয়ে থাকে।

**নয়া জনসংখ্যা নীতি (New Population Plan - NPP) :**

নয়া জনসংখ্যা নীতি (NPP) -র মূল লক্ষ্য হল মানুষের বংশবিস্তার নীতিকে উন্নততর করা ও পুনর্বিন্যাস করা। এই উদ্দেশ্যেই NPP মানুষের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি জন্মনিয়ন্ত্রনের জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে। আবার নিরাপদ ভাবে প্রসূতিরা যাতে সন্তান জন্ম দিতে পারে তার জন্যও NPP একাধিক প্রশিক্ষন কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব দেয়। বিষয়টিকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে NPP বিবাহ ও সন্তান প্রসবের বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিক রেজিষ্ট্রি করাকে বাধ্যতা মূলক করেছে। একারনেই মেয়েদের বিবাহের নূন্যতম ববস ১৮ হতে হবে বলে ধার্য্য করা হয়েছে। যেহেতু পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে মহিলাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাই বর্তমানে NPP মহিলাদের শিক্ষার বিষয়ে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এক্ষেত্রে পরিবারের সংকীর্ণ গন্ডীর বাইরে বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে মহিলাদের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা ছোট পরিবার, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। পর্যাপ্ত হারে শিক্ষিতা হলে গ্রামীন বা শহুরের মহিলারা গর্ভধারণ থেকে শুরু করে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও অধিকারী হবে। আবার মহিলাদের মধ্যে যদি চাকুরী সুযোগ আসে, বা যেদিন তারা অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পায়

টিপ্পনী

তাহলেও তারা বৃহত্তর সামাজিক পরিমন্ডলে অনেক বেশী ক্ষমতামন্ডিত হয়ে এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হবে। গর্ভপাতের বিষয়ে ভারত সরকার ১৯৭১ সালে Medical Termination of Pregnancy Act পাশ করেছে, যা গর্ভপাতকে আইনের আওতায়

টিপ্পনী

## অনুশীলনী :

১০. বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুটি মূল কারন লেখ।

১১. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুটি কারণ লেখ।

১২. ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কেন প্রয়োজন আলোচনা কর।

১৩. পরিবার পরিকল্পনা সংঘের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লেখ।

## ৪.৭. মানুষ, পরিবেশ এবং সামাজিক বিষয়সমূহ (Human, Enviroment and Social Issues) :

এই পর্যায়ে তোমরা জনসংখ্যা সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় সম্পর্কে জানবে । আমরা এখানে পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্য, মানবাধিকার এবং HIV/AIDS এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করব।

## ৪.৭.১. পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য (Environment and Human Health) :

পরিবেশ স্বাস্থ্য হল মানবস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেইসব বিষয় যা পরিবেশের সাথে ব্যাক্তির জীবনের নানাদিক, যেমন জীবনযাত্রার মান, শারিরিক, জৈবিক, সামাজিক, মনোস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্কের কথা বলে। মানব স্বাস্থের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক খুব জটিল। পরিবেশের প্রতিটি বিষয়ই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। আসলে উন্নয়ন - পরিবেশ-স্বাস্থ্য ইত্যাদির আন্তসম্পর্ক বিশ্লেষণের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই । উন্নয়নের সাথে জড়িত নানাধরণের মানব স্বাস্থ্য প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। যেমন - নানা ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার, কীটনাশক, বায়ুদূষণ, প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দূষক ইত্যাদির প্রভাবে মানুষের নানাধরনের শারীরিক সমস্যা, যেমন - চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট, অন্ত্র সমস্যা ইত্যাদি হচ্ছে ও সর্বপরি এর ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা ইত্যাদি প্রভাবিত হচ্ছে। ফলত মানবশরীর ব্যাপক দূরারোগ্য রোগের কবলে পড়ে যাচ্ছে। ফলত স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ (Enviromental

Helth Impact Assessment) এবং এই সংক্রান্ত পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণ রোধের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বোপরি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা দূর করার জন্য বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা ও প্রযুক্তিগত সংস্থার যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করা প্রয়োজন।

## ৪.৭.২. মানবাধিকার, পরিবেশ এবং HIV / AIDS :

টিপ্পনী

মানবাধিকারের ইতিহাসে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র হল একটি বড়ো মাইলফলক। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারিসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারন সভায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিগন কর্তৃক প্রণীত UDHR গৃহীত হয়। মানবাধিকারকে সার্বজনীন স্তরে সংরক্ষণ করা এটাই হলল প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা যা মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়। এটা সমগ্র বিশ্বে ৫০০ টিরও বেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল।

### মানবাধিকার ও পরিবেশ (Human Rights and Environment) :

বিশ্বে মোট ২ মিলিয়ন মৃত্যু ও কয়েক বিলিয়নের ও বেশী রোগ পরিবেশ দূষণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে হয়েছে। পরিবেশের দূষণ, অবনমণ বাস্তুতন্ত্রের পতন, জলাভাব, মৎসচাষের সমস্যা, অরণ্যনিধনের দরুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিপজ্জনক আবর্জনা ও দূষক, টক্সিনক্ষরণ, অসুরক্ষিত পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিবেশ সমস্যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বে জনগণ আজ বিপজ্জন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। বীশেষত প্রান্তিক মানবসম্প্রদায় যারা পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষভবে নির্ভর করে জীবনধারণ করে তাদের তারা সর্বাধিক ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে। মানবস্বাস্থ্যের উপর সর্বাধিক নেতীবাচক প্রভাব বিস্তার করে পরিবেশের মৌল পরিবর্তন (Climate Change)। এই সকল ঘটনাবলী পরিবেশের সাথে মানব অধিকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরে এবং একটি পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা সংহতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার কথা বলে।

স্টকহোম ঘোষনা ও রিও ঘোষণা মানব - অধিকার, মর্যাদার সাথে জীবনধারণ ও পরিবেশের সম্পর্কের বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সুস্পষ্ট অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছে। উন্নয়ন নীতি ও আইনগত ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে কিছুটা হলেও এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানব সম্প্রদায় কিছুটা হলেও সরে এসেছে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে সুস্পষ্ট কিছু সমস্যা মোকাবিলা করার প্রশ্নে।

আবার U N O (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ) -র সংস্কার কর্মসূচী যেকোন প্রতিষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্রে মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়ার উপর জোর দিচ্ছে।

টিপ্পনী

অভূতপূর্ব United Nations Commission on Human Rights এবং The United Nation Human Rights Council সুস্পষ্টভাবে সুরক্ষিত ও সুস্থ পরিবেশ এবং মানবাধিকারের সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে একগুচ্ছ ধারাবাহিক প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে। অতি সাম্প্রতিককালে ২০০৮ সালের মার্চ মাসে Human Rights Council তার ৭/২৩ রেসোলিউসনে এবং ২০০৯ সালের মার্চ মাসে ১০/৪ রেসোলিউসনে (সিদ্ধান্তে) সুস্পষ্টভাবে মানবাধিকার ও পরিবেশ পরিবর্তনের সম্পর্ক উল্লেখ করে মানবাধিকারের উপর পরিবেশ পরিবর্তনের (Climate Change) প্রভাব আলোচনা করেছে। এই রেসোলিউসনের (Resolution) মাধ্যমে এটা দেখানো হয়েছে যে পরিবেশ ও মানবাধিকারের সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন।

**মানবাধিকার এবং BHIV / AIDS (Human Rights and HIV / AIDS) :**

ম্যালেরিয়া, টিউবারকিউলোসিস, ক্যানসার ও হৃদরোগের মতোই HIV / AIDS হল একটি মারণব্যাধি। এক্ষেত্রে HIV/AIDS যে কারণে এগুলির থেকে পৃথক সেটা হল এর দ্বারা একজন ব্যাক্তির কেবল শারিরীক রোগই নয় সাথে সাথে সামগ্রিক সামাজিক পরিচিতি ও অবস্থান ও প্রভাবিত হয়। এই রোগ নিয়ে সমাজে যে অবমূল্যায়ন, অসাম্য ও গুজব ছড়িয়ে আছে তা রোগটির ভয়াবহতার মতোই সমান ভয়াবহ। মানবাধিকারের ধারণাকে যথাযথভাবে স্বীকৃত না দিতে পারলে ব্যাক্তির সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রভাব পড়ে। বীশেষত HIV/AIDS এর মতো ব্যাধির কবলে পড়া মানুষ নূণতম সামাজিক মর্যাদা থেকে ও বঞ্চিত হয়। আবার যথাযথ চিকিৎসা, মানসিক শান্তি, মনোস্তাত্ত্বিক সমসর্থন বা উৎসাহ ইত্যাদিও মর্যাদার সাথে পায়না। এটাও দেখা গেছে যে সেইসব জনগোষ্ঠীতর মানবসম্প্রদায়ের মধ্যেই HIV/ AIDS এর মতো ব্যাধি অধিকভাবে সংক্রিমিত হয়েছে যারা মানবাধিকারের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ও যারা সমাজিওক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

200

## 8.7.3. মহিলা ও শিশু কল্যাণ (Women and Child Welfare) :

কোন রাষ্ট্রের বাস্তব চরিত্র বোঝা যায় সেই সমাজে মহিলা ও শিশু আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা ও অবস্থানের উপর। এটা সাধারণত দেখা যায় যে সব

সমাজব্যবস্থায় মহিলা ও শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেগুলি সাধারণত অধিক উন্নত। মহিলারাই যেহেতু পরিবারের শিক্ষা ও উন্নতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে তাই মহিলাদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র পরিবারের উন্নতি সাধিত হয়। অর্থাৎ মহিলাদের শিক্ষিত করতে পারলে সমগ্র পরিবার তথা সামগ্রিক সমাজ উন্নত হবে।

**মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষিত করার তাৎপর্য :**

(১) ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গার্হস্থ্য জীবনবিন্যাস মূলত মহিলা নির্ভর যারা ঘন্টার পর ঘন্টা বিনা পারিশ্রমিকেই সমগ্র সংসারের চালিকা শক্তি হিসাবে মূল কান্ডারীর ভূমিকা নেয়।

(২) রান্না থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল কঠোর সাংসারিক দায়িত্ব পালন করার এটা বলা যায় যে মহিলারা সবচেয়ে বেশী সময় ক্ষতিকর জৈব গ্যাসের সম্মুখীনে কাজ করে (Bio-mass Fuel)।

(৩) পুরুষের তুলনায় মহিলারাই পরিবেশের অবনমনের (Environmental Degradation) শিকার হয়।

(৪) জননিষ্কাশন, পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতার বিষয়গুলি মহিলাদের বেশী প্রয়োজন কারণ এগুলি অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকেও প্রভাবিত করে।

(৫) আমাদের দেশের অণ্যতম সমস্যা হল শিশুশ্রমের সমস্যা। তারা অর্থের জন্য বিপজ্জনক ও কঠোর শ্রমের সাথে যুক্ত থাকে।

**মহিলা ও শিশু কল্যানের উদ্দেশ্যসমূহ :**

(১) শিশু ও মহিলাদের সার্বিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন।

(২) শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক যত্ন নেওয়া।

(৩) মহিলা ও শিশুদের যথাযথ অধিকার ও সাংবিধানিক অবস্থান সুরক্ষিত করা।

(৪) গ্রামীন জনমানসে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষাহেতু গৃহীত বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

## মহিলা ও শিশুদের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ (Important Developmental Programs for Women and Child Welfare) :

সমাজে মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের স্বার্থে সরকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন

টিপ্পনী

ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেমন বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, মহিলা উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, Self help Group সৃষ্টি ও সহযোগিতা, লিঙ্গ সংক্রান্ত সচেতনতা, বৃদ্ধি প্রকল্প, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা সুযোগ সুবিধা সুরক্ষা করা (যেমন মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন), আবার National Commission for Women' এর মাধ্যমে মেয়েদের আইনী সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত করা ও সর্বোপরি মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক নানা সাধু ও ইতিবাচক ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

## অনুশীলনী :

১৪. পরিবেশের স্বাস্থ্য (Enviromental helth) কী ?

১৫. কবে ও কোথায় মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র গৃহীত হয় ?

১৬. এমন দুটি সরকারী আইনের নাম লেখ যা মহিলাদের সুবিধা প্রদান করেছে।

## ৪.৮. সারসংক্ষেপ (Summary) :

- স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) হল এমন ধারণা যা মনে করে যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বা ভোগের মাত্রা প্রায় ততটাই হওয়া উচিৎ যতটা পরিমাণে এর বিকল্প যোগানের ব্যবস্থা করা যায়।
- স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনায় Industrial Ecology -র ধারনা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাতে করে শিল্পভিত্তিক বিকাশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।
- পরিবেশ নীতি বলতে বোঝায় মানুষ ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইস্যু, নিয়মনীতি, নির্দেশাবলী ইত্যাদি।
- পরিবেশগত নীতি হল সেই নীতি যার দ্বারা আমরা আমাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে পারি এবং কঠিন সঙ্কটময় পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারি।
- পরিবেশ সম্পর্কে জনচেতনা এখনো পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে রয়েছে।
- উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রভাব ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়তে পারে। বৃহত্তর সমাজের উপর প্রকল্পের উন্নয়ন ও ইতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় মানুষের উপর, বিশেষত যারা প্রত্যক্ষভাবে ঐ এলকার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল

(অরণ্য, জলাধার ইত্যাদির উপর) তাদের উপর বিকৃত ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

- সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের (Social Impact Assessment) দ্বারা কোন প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ইতিবাচক বা নেতীবাচক প্রভাব সম্পর্কে প্রকল্প গ্রহণ বা রূপায়নকারীরা সচেতন হতে পারেন।
- SIA-র প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কোনো প্রস্তাবিত প্রকল্পের রূঢ় বাস্তব প্রভাব সম্পর্কে যেমন কম-বেশী সঠিক তথ্য পাওয়া যায়, তেমনি আবার এই অভিযানের দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে কী বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যায়, বা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের পুণনর্বীকরণযোগ্য ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য পাওয়া যায়।
- পরিবেশের বহুবৈচিত্র্য ক্ষেত্র - যেমন জল, পরিচ্ছন্নতা, নিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, খনি, শহরের পরিবহন, নগরায়ন, কৃষি উন্নয়ন, গ্রামীন জনজীবন ইত্যাদি সকল বিষয়েই কোন প্রস্তাবিত প্রকল্প রূপায়নের পূর্বে SIA (সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন - Social Impact Assesment) করা যায়।
- ভারতে মূলত Environmental Impact Assessment (পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন) এর একটি অঙ্গ হিসাবেই Social Impact Assessment (SIA) (সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন) করা হয়ে থাকে।
- পরিবেশের কোন বাহ্যিকভাবে সূচীত প্রতিবর্তনের দরুণ ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব পড়ে তাকেই সামাজিক প্রভাব (Social Impact) বলা হয়।
- SIA -র সংজ্ঞার বিষয়ে পন্ডিত মহলে কোন ঐক্যমত নেই। সাধারণত SIA বলতে বোঝায় কোন প্রস্তাবিত প্রকল্প রূপায়নের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটীর সাম্ভাব্য ইতিবাচক বা নেতীবাচক প্রভাব, যা প্রকল্পটির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর পড়ে তা বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের প্রক্রিয়া। যেমন - জলাধার, খনি, জল, সড়ক, বন্দর, বিমানবন্দর, নগরোন্নয়ন, বিদ্যুৎকেন্দ্র ইত্যাদি প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন।
- US Council on Environmental Quality কর্তৃক সার্বিক প্রভাবের (Comulative Impact) যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল "The impact on the environment that result from the incremental impact of the action when added other past, present and reasonably foreseeable future (RFPA) regardless of what agency

টিপ্পনী

টিপ্পনী

undertakes such other actions."

- যে কোন দেশের প্রধানতম সম্পদ হল জনসংখ্যা। কোন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
- ১৯৭৬ - ৭৭ সালে চীনের জনসংখ্যা ছিল ৯৮২.৫ মিলিয়ন, যা সমগ্র বিশ্ব জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ। এই সময়কালে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.২ শতাংশ।
- US Census Bureau -র রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৯ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা বার্ষিক বৃদ্ধি ৮৮.০ মিলিয়ন থেকে ২০০৩ সালে হ্রাস পেয়ে ৭৩.৯ মিলিয়ন পৌঁছেছিল, যা পরবর্তীকালে ২০০৬ সালে পুনরায় সামান্য বৃদ্ধি পচেয়ে ৭৫.২ মিলিয়ন হয়।
- ২০০৯ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪.৬ মিলিয়ন হয় এবং এটা অনুমান করা হচ্ছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯.২ বিলিয়ন হবে।
- বিশ্বের উজনসংখ্যা বৃদ্ধির দুটি প্রধান কারণ বর্তমান। প্রথমটি হল ক্রমাগত হারে ইতিবাচক বৃদ্ধি, যা মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সূচীত করেছে। দ্বিতীয় কারণটি হল মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়ার দরুণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি সূচীত হয়েছে।
- চীনের পর ভারতই হল বিশ্বের সর্বাধিক জনবসতি পূর্ণরাষ্ট্র। বিশ্বের মোট ভূখন্ডের মাত্র ২.৪ শতাংশ ভারত ভূখন্ড হলেও বিশ্বের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ শতাংশ ভারতে বসবাস করে।
- ভারতে জনবিষ্ফোরনের সাথে ব্যাপক ও গভীর ভাবে আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ জড়িত রয়েছে। এগুলির কয়েকটি হল - দারীদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, নিম্নমূখীন মাথা পিছু আয়, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি।
- ভারতে জনসংখ্যা বিষ্ফোরনের অণ্যতম প্রধান কারণ হল মৃত্যু হার কমে যাওয়া।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও দূরারোগ্য রোগের উপর জয়লাভ হল ভারতে জনসংখ্যা বিষ্ফোরনের অণ্যতম প্রধান কারণ।
- ভারতে প্রায় সকল বয়সের মানুষের জীবনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন সংক্রামক বাধির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
- ভারতে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দারিদ্র্যর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।
- Family Planning Association -এর প্রধানতম ও প্রাথমিক দায়িত্ব হল

যৌণতা ও বংশবিস্তারের বিষয়ে মানুষকে সচেতনতামূলক শিক্ষা প্রদান করা। এছাড়াও যুব সম্প্রদায়কে নানা ভাবে পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা।

- পরিবেশের স্বাস্থ্য বলতে সামগ্রিক পরিবেশের যাবতীয় বিষয় যেমন মানব জীবনযাত্রার মান, দৈহিক, জৈবিক, সামাজিক, মনোস্তাত্বিক স্বাস্থ্যকে বোঝায়। পরিবেশের ও মানব স্বাস্থ্যের পারস্পরিক প্রভাব অত্যন্ত জটিল বিষয় ।প্রতিটি বিষয়ই আর্থসামাজিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।
- মানব স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশ দূষণের যথাযথ কারণ অনুসন্ধান করতে হলে নির্ভূল Exposure Assessment technique (প্রভাবক মূল্যায়নের কৌশল) অবলম্বন করতে হবে। তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ "Environmental Health Impact Assessment"। এই উদ্দেশ্যে দূষক সম্পর্কে গভীর ও যথাযথ গবেষণা প্রয়োজন।
- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারন সভা কর্তৃক প্যারিসে ১৯৪৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) গৃহীত হয় সাল জাতি ও সকল মানুষের জন্য মানবাধিকারের একটা সার্বজনীন মান নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। এটাই বিশ্বের প্রথম মৌল মানবাধিকার রক্ষার দলিল। এটা প্রায় ৫০০ টির ও বেশী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।
- মানব স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশের অবনমনের অণ্যতম ক্ষতিকর প্রভাব হল পরিবেশের পরিবর্তন (Cliamate Change) যার সাথে ম্যালেরিয়া, সহ অন্যান্য দূরারোগ্য ও বিপজ্জনক ব্যাধি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। এই বিষয়গুলি পরিবেশ দূষণ, পরিবেশের অবনমন, আবহাওয়া পরিবর্তন ইত্যাদির সাথে মানব স্বাস্থ্যের ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট যোগাযোগ এর কথা বলে। এবং এক্ষেত্রে যে একটা পরিবেশ ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সংহতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন তার সওয়াল করে।
- ম্যালেরিয়া, ক্যান্সার, হৃৎরোগের মতোই একটা বিপজ্জনক মারণরোগ হল HIV / AIDS। তবে HIV / AIDS এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা নতুন তা হল এই রোগটির সাথে রোগীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়। এই রোগটিকে কেন্দ্র করে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা রোগটির মতোই বিপজ্জনক। HIV / AIDS আক্রান্ত রোগীর যাবতীয় সমাজিক সমস্যা, অবমানকর পরিস্থিতি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ইত্যাদির মূলকারন হল সমাজে মানবাধিকারের যথাযথ স্বীকৃতির অভাব।

- যেকোন জাতিরাষ্ট্রের সার্বিক অবস্থা সেই রাষ্ট্রে মহিলা ও শিশুদের সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে এবং এদের প্রতি রাষ্ট্রের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। সাধারণত এটা দেখা যায় যে সব দেশে মহিলা ও শিশুরা অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার পায় সেই সব দেশেই বেশী উন্নত।
- মহিলা ও শিশুদের কল্যাণ সাধনের মূল উদ্দেশ্য হল তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন। সাথে সাথে মহিলা ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যেসব রাষ্ট্রীয় প্রকল্প গৃহীত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

## ৪.৯. প্রধান শব্দসমূহ (Key Terms) :

- স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) : প্রাকৃতিক সম্পদকে বিপর্যস্ত না করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন কারণেই স্থিতিশীল উন্নয়ন বলা হয়।
- মৃত্যর হার (Mortality Rate) : কোন সুনির্দিষ্ট স্থানে সুনির্দিষ্ট সময়ে (এমনকি কখনো কখনো সুনির্দিষ্ট কারণে) মৃত্যুর সংখ্যকে মৃত্যুর হার বলে।
- মানব শরণার্থী বা স্থান পরিবর্তন (Human Migration) : একস্থান থেকে অণ্যস্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে মানুষের প্রস্থান ও বসবাস করাকে মানব স্থান পরিবর্তন বলে।

## ৪.১০. অনুশীলনের উত্তর সমূহ (Answers to 'Check your Progress) :

১. স্থিতিশীল উন্নয়ন হল সেই ধারণা যা মনে করে যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বা ভোগের মাত্রা ততটাই হওয়া উচিৎ যতটা পরিমানে এর বিকল্প যোগানের ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ পরিবেশ ধ্বংস করে আকস্মিক দ্রুত উন্নয়ন না করে পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে স্থিতিশীল হারে উন্নয়ন করা।

২. অস্থিতিশীলতার মূল দুটি কারণ হল :

(ক) দরিদ্র দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা ;

(খ) ধনী দেশ সমূহ কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদেদর অতিরিক্ত ভোগ।

৩. পরিবেশগত নৈতিকতা বলতে মানবসম্প্রদায়ের সাথে পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি ও নির্দেশাবলী।

৪. দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত আদর্শ হল :

(ক) প্রত্যেকের উচিৎ পৃথিবী তথা প্রকৃতিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাকরা।

(খ) পৃথিবীর প্রতিটি দিনকে পবীত্র অতিবাহিত করা উচিৎ ও প্রতিটি ঋতুকে সমাদার করা উচিৎ।

৫. বিভিন্ন গণমাধ্যম, গ্রন্থ, অণুচ্ছেদ, মিছিল, অভিযান, আলোচনা চক্র, পথনাটিকা, টিভি ধারাবাহিক ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিৎ।

৬. SIA -র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারিতা হল এই যে এর দ্বারা প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য নেতীবাচক প্রভাব জানা যায় এবং তা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

৭. পরিবেশে বাহ্যিকভাবে সূচীত কোন প্রকল্পের দরুণ যে পরিবর্তন ঘটে, যার দ্বারা ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী প্রভাবিত হয় তাকে সামাজিক প্রভাব (SI) বলে।

৮. US Counsil on Environmental Quality কর্তৃক প্রদত্ত CIA -র সংজ্ঞাটি হল CIA হল অতীত, বর্তমান ও আশু ভবিষ্যতের কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প দরুণ যে ক্রমবর্ধমান হারে (Incremental) পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে তা হল CIA (Commutative Impact Assessment)।

৯. SIA ও CIA -র একটা যান্ত্রিক হাতিয়ার বা কৌশল হিসাবে Adaptive Management (AM) ব্যবহিত হয়।

১০. বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুটি প্রধান কারণ বর্তমান :

প্রথমত : ক্রমাগত হারে ইতিবাচক বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে।

দ্বিতীয়ত : মৃত্যুর হার (চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য) হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১১. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী দুটি ঘটনা হল -

(ক) চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য মৃত্যুর হার কমে যাওয়া।

(খ) শরনার্থী সবাবেশের সমস্যা।

১২. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করললে ভারতের জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অধিকারহীনতা, অপুষ্টি ইত্যাদি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

১৩. পরিবার পরিকল্পনা সংঘের মূল লক্ষ্য হল পরিকল্পনাকে মানবাধিকার হিসাবে গণ্য করে মানুষকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করা।

১৪. পরিবেশ স্বাস্থ্য বলতে সামগ্রিক পরিবেশের যাবতীয় বিষয় যেমন মানবজীবন যাত্রার মান, দৈহিক, জৈবিক, সামাজিক, মনোস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যকে বোঝায়। পরিবেশ ও

মানবস্বাস্থ্যের পারস্পরিক প্রভাব অত্যন্ত জটিল।

১৫. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা কর্তৃক প্যারিসে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (UDHR) গৃহীত ও ঘোষিত হয়। (সাধারণ সভার রেজোলুশন ২১৭ (এ) ধারা)।

১৬. মহিলাদের অধিকার তথা সুবিধা প্রদান ও সুরক্ষা হেতু দুটি রাষ্ট্রীয় আইন হল -

(ক) মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন (Maternioty Benefit Act)

(খ)পনপ্রথা নিষিদ্ধকরন আইন (Downy Prohibition Act)

টিপ্পনী

## ৪.১১. প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী :

### ছোটপ্রশ্ন :

১. স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে কী বোঝ ? স্থিতিশীলতা লাভের প্রধান কৌশলগুলি কী কী ?

২. বিভিন্ন ধরনের প্রভাবগুলি আলোচনা কর ?

৩. প্রাথমিক সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন কী ?

৪. সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ গুলি আলোচনা কর।

৬. পরিবার পরিকল্পনা সংঘ এবং নয়া জননীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

### রচনাধর্মী উত্তর লেখ :

১. পরিবেশ সুরক্ষায় দুটি প্রধান বিশ্ব - দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা কর।

২. সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA) বলতে কী বোঝ ?

৩. সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের বিভিন্ন সুবিধা গুলি আলোচনা কর।

৪. জনসংখ্যার বিবর্তণের তিনটি পর্যায় / ধাপ আলোচনা কর।র

৫. সার্বিক প্রভাব বিশ্লেষণের প্রধান প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

## ৪.১২. অতিরিক্ত পাঠক্রম

Jacobson, Mark Z. 2002. *Atmospheric Pollution—History, Science and Regulation*. UK: Cambridge University Press.

Khopkar, S. M. 2004. *Environmental Pollution Monitoring and Control*. New Delhi: New Age International.

Harrison, Roy M. 2001.*Pollution: Causes, Effects and Control*. UK: Royal Society
of Chemistry.

Easton, Thomas. 2008. *Classic Edition Sources: Environmental Studies*, Third

Edition. Ohio: McGraw-Hill/Dushkin.
Cunningham, William and Mary Cunningham, 2009. *Environmental Science: A Global Concern*. Ohio: McGraw-Hill.
Rangarajan, Mahesh. 2010. *Environmental Issues in India: A Reader*. New Delhi: Pearson.

## Websites

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001264/126403e.pdf#xml=http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database= ged&set = 3EF08E 85_0_64 &hits_rec=1&hits_lng=eng
http://www.unep.org/delc/HumanRightsandTheEnvironment/tabid/54409/ Default.aspx
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.moef.nic.in/sites/default/files/visenvhealth.pdf